বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক

লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা : ৯

বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক

আলোচনা এবং সংগ্রহ

শ্রীসনৎকুমার মিত্র
সম্পাদিত

পরিবেষক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ · ডিসেম্বর ২০০০

কম্পুটারাইজড্ প্রচ্ছদ নির্মাণ . পিনাকী দত্ত



প্রকাশক ·
যুগ্ম-সম্পাদক
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
৬০ জেমস লঙ সরণি, বেহালা
কলিকাতা ৭০০ ০৩৪

মুদ্রাকর :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

আমার সদ্যপ্রয়াতা স্ত্রী

চিত্রা মিত্র-র

স্মৃতির উদ্দেশে

□ **বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় এক অভিনব উদ্যম**

লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা :

লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি : ড. দুলাল চৌধুরী [২য় সংস্করণ]

সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত [২য় সংস্করণ]

ড. সনৎকুমার মিত্র *সম্পাদিত*

লোকভাষার পটভূমি

বাউল-লালন-রবীন্দ্রনাথ

মেয়েলি ব্রত বিষয়ে

ঝুমুর : সংগ্রহ, আলোচনা ও স্বরলিপি

কাক ও সংস্কৃতি

বাঙলার লোকক্রীড়া : ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

লোককথার অন্তর্লোক : ড. পল্লব সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ : ড. সনৎকুমার মিত্র

: প্রসঙ্গ কথা :

'লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা' বাঙলা লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা আনতে পেরেছে বলে আমরা মনে করি। এতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। একটি বিষয় নিয়ে একটি বই। কোন কোন সময়ে এমনও হবে যে একটি বড় বিষয়কে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনামে একাধিক বই তৈরি হতে পারে। ফোকলোর তত্ত্বের দিক, বিভিন্ন উপাদান, ফোক পারফর্মিং আর্টের বিচিত্র প্রজাতি, লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ, শীলিত সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে ফোকলোরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সমস্যা অবলম্বন করে আমাদের এই গ্রন্থমালা। বইগুলি সংক্ষিপ্ত, তবে প্রসঙ্গটিকে পূর্ণ ও সংহতভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদিকে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি সেই পরিচয় সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বিষয়টির পরিচয় দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করা এবং তার জন্য আমরা সর্বদা এমন লেখকের সন্ধানে থাকব যাঁর বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে। এই তিনটি সূত্রে আমাদের পুস্তকগুলিকে মৌলিক রচনা করে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য যে-সব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি, সে-সব ক্ষেত্রে পথিকৃত হওয়া। যে-সব বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে সেখানে আমরা আধুনিক ভাবনা আনবার চেষ্টা করছি। যে-সব বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে আগে বিবেচিত হয়নি, তাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হওয়ার উদ্দেশ্যই আমাদের।

তাই আমরা কখনও একজন লেখকের বই প্রকাশ করব। কখনও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একাধিক লেখকের প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করব। আমরা দামি পুরনো লেখা সংকলনে সর্বদা আগ্রহী, সুযোগ পেলে এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণও করব।

আমাদের পরিষদ অনেকদিন ধরে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় নিবিষ্ট এবং বারো বছরের বেশি সময় ধরে আমরা একটি গবেষণা ত্রৈমাসিক বের করছি নিয়মিত, একটি সংখ্যা একবারও না থেমে।

লোকসংস্কৃতির প্রতি যাঁদের প্রীতি, তাঁরা যদি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, যাঁরা লোকসংস্কৃতি-বিষয়ের ছাত্র তাঁরা যদি এই গ্রন্থমালা দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হন, তাহলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং পত্রিকার সম্পাদক ড. সনৎকুমার মিত্র সাধারণভাবে এই গ্রন্থমালা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন; বিশেষক্ষেত্রে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকি। কখনও কোন বিশেষ প্রকল্পে অতিথি সম্পাদকও আমন্ত্রিত হতে পারেন।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

সভাপতি

৩০ নভেম্বর ২০০০ — লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদকের কথা

□ চার বছর আগে আমাদের 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা'-র একটি বিশেষ সংখ্যা হয়েছিল। 'গ্রামীণ নাটক : আলোচনা ও সংগ্রহ' শীর্ষনামে। অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও খুব দ্রুত পত্রিকাটি বিক্রি হয়ে যায়। তখন থেকেই পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী চেষ্টা করেছে যাতে ঐ সংখ্যার অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে 'বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক : আলোচনা ও সংগ্রহ' নামকরণ করে কাজটি আরম্ভ হয়—তাও প্রায় বছর খানেক আগে। কিন্তু নানা কারণে সঙ্কলনটি প্রকাশ করতে অসম্ভব দেরি হয়ে গেল। এর জন্য আগ্রহী পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

□ আমাদের পূজ্য এক শিক্ষক একদা লিখেছিলেন : 'বাঙালি জন্ম দার্শনিক।' এর সঙ্গে বোধ হয় যোগ করতে পারি 'বাঙালি আদ্যন্ত নাটুকে।' এমনিতে বাঙালির জীবনধারা সমতল—ঢেউ প্রায় নেই বললেই হয়। সে জন্ম কর্ম-বিবাহ-মৃত্যুর মসৃণ পথ বেয়ে যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক উপপ্লবে গ্রামে গাঁথা বাঙলার জীবন-দর্পণে কদাচ দাগ পড়েছে। ঢেউ যা উঠেছে বা আছড়ে পড়েছে তা রাষ্ট্রক্ষমতার তটভূমিতে। এই সমতলত্ব সত্ত্বেও বাঙালি নাটক করতে-দেখতে-শুনতে ভালোবাসে। ভালোবেসে এসেছে। কেন?

□ 'নাটক' শব্দটি উচ্চারণ মাত্রই আমাদের সামনে যে দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে তার বয়স বড় জোর শ-দুই বছরের এবং বিদেশীয়ানাতেই তার উদ্ভব-বিকাশ ও পরিণতি। অন্যদিকে সংস্কৃত নাটক অনেক—অনেক কাল আগে থেকে ভারত মাত করলেও বাঙালি ঐ সব অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-নান্দী-সূত্রধার যে আদৌ সমাদর করতো তেমন খবর আমাদের কাছে নেই। তবে বাঙালিকে নাটুকে বলার কারণ কি! আসলে বাঙলার সরস মাটিতে কাব্য-কবিতা-গানের ফসল চিরকালই প্রচুর পরিমাণে ফলেছে— আজও ফলছে। আর এই ফসলকেই নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার ভিয়েনে পাক করে নিয়ে

স্বাদু ব্যঞ্জনে পরিণত করেছে বাঙালি। তাই 'বৌদ্ধনাটক' 'বিষম হোক' বা রাধা কৃষ্ণ-বড়াই-এর গান দিয়ে তৈরি পালা হোক, কিংবা চৈতন্যদেবের যাত্রাপালার অভিনয়ই হোক সব কিছুই গানের রসে ভেজানো। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন যে 'সাপ খেলানোর সুরে' রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য [প্রধানত 'মনসা'] পাঠ অথবা কথক ঠাকুরের কথকতা—যাই হোক না কেন সর্বত্রই স্বর ও সুরের পার্থক্য সৃষ্টি, ছোট-ছোট কাটা কাটা করে সংলাপে গাঁথা নাটকের প্যাটার্ন তৈরির চেষ্টা বাঙালির কাব্য রসোপভোগের অতি পুরনো একটি বৈশিষ্ট্য। পাঠক একই, কিন্তু এমনই স্বর প্রক্ষেপণের শিক্ষা যে আড়াল থেকে শুনলে মনে হবে যেন বিভিন্ন কুশীলব তাদের নিজ নিজ পার্ট বলে যাচ্ছেন। গানকে নাটকের আঙিনায় নিয়ে আসার এই সহজাত কুশলতার জন্যই আমরা বাঙালিকে নাটুকে বলেছি।

□ আমাদের আলোচিত ও সংগৃহীত এই গ্রামীণ নাটকগুলির প্রতি মনোযোগ দিলে দেখা যাবে যে খুব বড় ভাব, গম্ভীর দার্শনিকতা বা গভীর তত্ত্বকথা এদের বিদগ্ধ করে তোলেনি। রামায়ণ-মহাভারত, বুড়ো কৃষক শিব, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী বা ঘরের মেয়ে উমার কাহিনী নিয়ে এদের পালাগুলি তৈরি। সঙ্গে আছে গ্রামীণ জীবনের হাসি-ঠাট্টা-দুঃখ-বেদনা, বৈধ-অবৈধ প্রেমের কেচ্ছা, কিছু মোটা দাগের রসিকতা [অত্যাধুনিকরা বলবেন 'অশ্লীলতা'] ইত্যাদি। এদের মধ্যে দিয়েই তারা আনন্দ উপভোগ করে—সঙ্গে কিছু সাধারণ নীতিশিক্ষা উপরি পাওনা হিসাবে পেয়ে যায়। সব মিলিয়ে তপ্ত জীবনাবেগে সজীব এইসব পালাগুলি।

□ আজকের বিনোদ-মাধ্যমগুলি তাদের সুলভ ও রঙিন উপাদানের সাহায্যে আমাদের ঐতিহ্য-ধারণার মূলে পোকা ধরিয়েছে/ধরাচ্ছে। তাই দেশজ উপকরণের মধ্যে যে সতেজ-শক্তি এবং সুসম-সুষমা আছে তাকে চিনতে ভুলে যাচ্ছি। সেটা যাতে একেবারে বিস্মৃত না হই সেজন্য এই সঙ্কলনটির নির্মাণ। আশা, আমাদের এই শিকড় অনুসন্ধান আরো কাউকে অনেকখানি উদ্যোগী ও সাহসী করে তুলবে।

□ শিথিলভাবে ধরলে আমরা বাঙলার ঐতিহ্যবাহী 'পুতুল নাটক', 'ছৌ', 'তর্জা-পাঁচালি', 'কথকতা' ইত্যাদি আরো কয়েকটি প্রকরণের আলোচনা ও সংগ্রহকে এই সঙ্কলনে স্থান দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিইনি

কারণ তাহলে গ্রামীণ লোকনাটকের টানে-বাঁধা সংজ্ঞাটির ভাবটি নষ্ট হত, অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটতো।

☐ আরো একটি বিষয় দেখা যাবে যে, গঙ্গার উত্তর পাড়ের [অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ] প্রচলিত কিছু গ্রামীণ লোকনাটকের [যেমন, হালুয়া-হালুয়ানী, মান-পাঁচালি, খাস-পাঁচালি ইত্যাদি ইত্যাদি] আলোচনা ও উদাহরণ এখানে অনুপস্থিত। এটা আমরা অজ্ঞানতা বা অক্ষমতা বশত করিনি তা নয়। আমরা ঐ অঞ্চলের যতগুলি গ্রামীণ লোকনাটকের স উদাহরণ আলোচনা এখানে করেছি—আর যাদের করিনি, এই দুয়ের মধ্যে কাহিনীগত কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রকরণ-উপস্থাপনা এমনকি কোথাও কোথাও রসগত বিভিন্নতা খুবই সামান্য। তাই প্রায় একই ধরনের পালা আরো অনেক অনেক উদ্ধৃত করে পুনরুক্তি দোষ এড়াতে চেয়েছি বলেই এমনটি ঘটেছে।

☐ এই সঙ্কলন-প্রস্তুতে যাঁরা আলোচনা—সঙ্গে তাঁদের সংগ্রহ দিয়েছেন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের গবেষণা পরিষদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। 'চোরচুন্নী' এবং 'মৈষাল বন্ধু'র পালার প্রসঙ্গে কোচবিহারের হাজরাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এই সঙ্কলন প্রকাশ-মুহূর্তে জলপাইগুড়ির পাণ্ডাপাড়া নিবাসী প্রয়াত নির্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর গৃহে বহুবার আশ্রয় দিয়ে, অনেকগুলি গ্রামীণ নাটক দেখার ব্যবস্থা করে, তিনি সেদিন যে বন্ধুকৃত্য করেছিলেন আজ তার স্মৃতি মনকে ভারি করে তুলছে। আমার সঙ্গী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দূর দূর গ্রামে গিয়ে অনেকগুলি পালার দর্শক হয়েছিলেন এবং এই সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে দেখলে যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, আমার সদ্যপ্রয়াতা স্ত্রী চিত্রা মিত্রকে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে, এই সঙ্কলনটি নিবেদন করলাম। ইতি— ০১.১২.২০০০

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

সম্পাদকের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কিছু বই :

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য
পশ্চিমবঙ্গেব লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা
কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস [সম্পাদিত] . দুই খণ্ড
লালন ফকির . কবি ও কাব্য
বাঘ ও সংস্কৃতি [সম্পাদিত]
Folk Life and Lore of West Bengal
পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য
পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ
বাউল-লালন-রবীন্দ্রনাথ [সম্পাদিত]
মেয়েলি ব্রত বিষয়ে [ঐ]
ঝুমুর . আলোচনা ও সংগ্রহ [ঐ]
কাক ও সংস্কৃতি [ঐ]
লোকভাষার পটভূমি [ঐ]

বিষয়সূচী

চিত্রবিবরণ

১. 'বনবিবিব পালা'—বনবিবি ও তাঁর ভাই সা-জঙ্গলীর মূর্তির সামনে পালাব অভিনয়। বাঁ-দিকে সা-জঙ্গলী দক্ষিণ বায়কে শাসিত করছে, ডান দিকে বনবিবিব কোলে দুখে। ফটো · বি.বি.সি ১৯৯৬

২. দক্ষিণ রায় ও সা-জঙ্গলীর যুদ্ধ। দূবে বাঁ হাতে আসাবাড়ি নিয়ে বনবিবি। এটি এবং এব পববর্তী সমস্ত ফটো শ্রীসনৎকুমার মিত্র কর্তৃক গৃহীত। ১৯৮৪

৩ গম্ভীরা পালাব মূল অভিনেতা—নিরুবাবু [নির্মল দাস]। ১৯৭২

৪. গম্ভীরা পালার 'নানা' [শিব]। ১৯৭২

৫. 'মইযাল বন্ধু' পালার পাণ্ডুলিপিব আখ্যাপত্র। নৃপেন্দ্রনাথ পালের সৌজন্যে। ১৯৭৬

৬. কুশান পালায লব-কুশ-সীতা। ১৯৭৫

৭. 'বিযহ্বা পালা'র নৃত্যাংশ। ২৯.৫.১৯৭৬

৮. ঐ। চামর হাতে মূল। ঐ

৯. পালাবন্দী বোলান [কেতুগ্রাম]। ১০.৪.৭২

১০. পড়ি বোলান—হাতে মড়ার খুলি। ১৯৭১

১১–১৩. আলকাপ [ফুল্লরার মেলা] লাভপুর, বীবভূম। ১৯৭২

১৪. আলকাপেব মহড়া [গুড়া-কুশমোড়] মুর্শিদাবাদ। ১৯৭১

১৫. চোব-চুবনী পালার শিল্পীবৃন্দ। চেয়াবে উপবিষ্ট প্রয়াত নির্মলচন্দ্র চৌধুরী [ময়নাগুড়ি]। ৭.১১.৮১

১৬. ঐ — মহড়া। ৭.১১.৮১

১৭–১৮. খন [পশ্চিম দিনাজপুর]। ১.৬.৭৬

১৯–২০. উত্তরবঙ্গের যে-কোন গান-নাটক ইত্যাদিতে অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র—মুখা বাঁশি-মৃদঙ্গ ও দোতরা।

গ্রামীণ লোকনাটক

সনৎকুমার মিত্র

১. ড গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখিত 'বাঙলা লোকনাট্য সমীক্ষা' [২য় সংস্করণ ২০০০] নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ বাঙলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রার—যাত্রাপাড়ার—যাত্রাপালা রচয়িতা-অভিনেতাদের সুবিস্তৃত ইতিহাস। তাঁর গবেষণায় বাঙলা যাত্রাই লোকনাট্য [Folk-Drama] হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু যাত্রা যতই 'লোকপ্রিয়' ও 'লোকমনোরঞ্জনকারী [Popular and fascinating] হোক না কেন, যেদিন থেকে তাকে বিলিতি নাটক ও মঞ্চের [drama and theatre] সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে সেদিন থেকেই সে 'ফোক' চরিত্র হারিয়েছে। অধিকন্তু যদি যাত্রাকে 'লোকনাট্য' বা 'ফোকড্রামা' বলি-ই তবে আজও গ্রামবাঙলায় অসংখ্য সে নাট্যরীতির আসর বসে—যেমন : 'আলকাপ', 'গম্ভীরা' 'বনবিবির পালা', 'খন', 'লেটো', 'চোরচুবনী', 'বোলান' ইত্যাদি, তাদের তবে কি নাম হবে? কারণ, অনেকদিক থেকে এদের সঙ্গে 'যাত্রা'-র প্রচণ্ড অমিল।

২. অতএব একটা জট পাকিয়েই রয়েছে এবং তা অনেক দিন থেকেই। মনে করি যে এই জট থেকে সহজে বেরিয়ে আসার পথ হল বাঙলার গ্রামে আজও প্রবল শক্তিতে প্রবহমান পূর্বকথিত 'গ্রামীণ লোকনাটক'-এর ['যাত্রা' বা লোকনাট্য শব্দ থেকে এদের সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করার জন্যই এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে] স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যটিকে সুচিহ্নিত করা এবং তা করতে পারলে 'যাত্রা' এবং 'গ্রামীণ লোকনাটক' তাদের নিজস্ব চেহারায় নিজের জায়গাতে যথাযথভাবে ঠাঁই পাবে।

৩. বর্তমান সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ প্রয়াত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা 'উত্তর বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্য'। সেখানে তিনি বাঙলার 'গ্রামীণ লোকনাটক' [তাঁর কথায় 'লোকনাট্য'] হওয়ার সপক্ষে কতকগুলি শর্তের [এদের লোকনাটকের সংজ্ঞা হিসেবে ধরা যেতে পারে] উল্লেখ করেছেন যেমন :

৩.১ 'নায়ক-নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম্য নর-নারীরই প্রতিনিধি।'

৩.২. 'গ্রামেই সংঘটিত কোন নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা তাদের বিষয়বস্তু।'

৩.৩ 'প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার মধ্যেও কৃত্রিমতা নেই।'

৩.৪ 'কোন সাজসজ্জা নেই, কেবল যেখানে ছেলেরা মেয়ের অংশে অভিনয় করে সেখানে নিতান্ত সাধারণ ভাবে ছেলেরা মেয়ে সাজে, আর যখন যার যা পোষাক, তাই অভিনয়েরও পোষাক হয়ে থাকে।'

৩.৫ 'তাতে সাজঘর বলে কিছু নেই।'

৩.৬. 'সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসে, যখন যার অভিনয় করার প্রয়োজন তখন সে সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার গিয়ে সেখানেই বসে।'

৩.৭. 'নাটকের বিষয়বস্তু গ্রামজীবনভিত্তিক, সেই বৎসর, সেই গ্রামে যে-সব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয় নাট্য-কাহিনীতে, সঙ্গীতে, সংলাপে ও নৃত্যে তারই রূপায়ণ দেখা যায়। সত্য মূলক ঘটনাই তাদের ভিত্তি হয়ে থাকে।'

৩.৮. এগুলি 'সত্যমূলক ঘটনাকে লক্ষ্য রেখে আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক [extempore] সংলাপ রচিত হয়।'

৩.৯ এদের 'কাহিনীর সূচনা আছে, ক্রমোন্নয়ন আছে এবং তার একটি স্পষ্ট পরিণতি আছে।'

৩.১০. সব চাইতে বেশি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এক বছরের গান কিংবা কাহিনী পরের বছর আর শুনতে পাওয়া যায় না। সেই বছরের জন্য গ্রাম্য কবিরা সমসাময়িক কিংবা বাৎসরিক নূতন কাহিনীর সন্ধান করে এবং গ্রাম্য-জীবনে তার সন্ধান ব্যর্থ হয় না।'

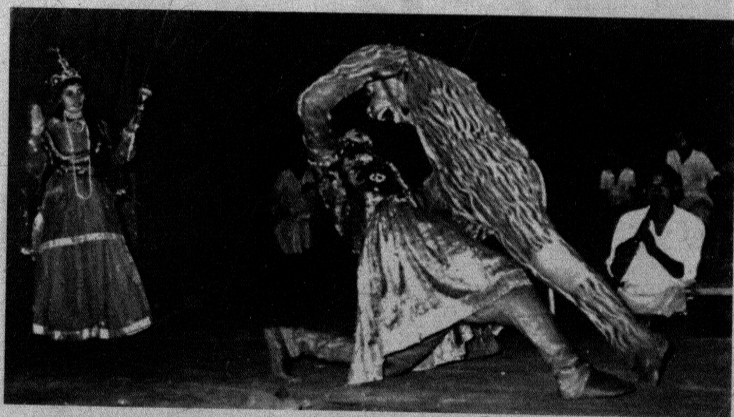
৩.১১. এদের মধ্যে 'আনুপূর্বিক কোনো কাহিনী নেই। কিন্তু কাহিনী ব্যতীত নাটক হয় না।... আনুপূর্বিক ঘটনা [theme] নিয়ে তারা রচিত নয়।'

৪. তাঁর মতে উল্লিখিত সূত্রগুলি যাদের ওপর প্রয়োগ করা যায় তাদেরই 'গ্রামীণ লোকনাটক' বলা যায়।

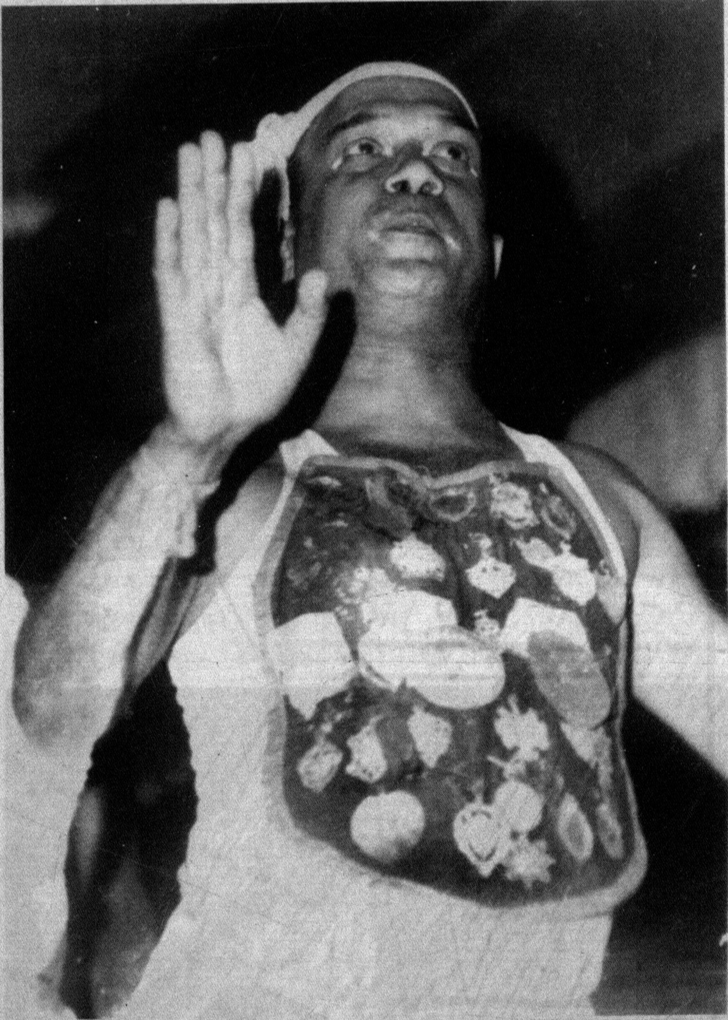
৫. এর পরে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আসতে পারে, বর্তমান সঙ্কলনের প্রথম প্রবন্ধ থেকে লোকনাটকের যে সংজ্ঞা-সার নিষ্কাশিত হল তা দিয়ে উক্ত প্রবন্ধকার উত্তরবঙ্গের মাত্র তিনটি পালাকে ['খন', 'পালাটিয়া' ও 'রঙ পাঁচাল'] প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাটক হিসাবে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। বাকি



চিত্র : ১



চিত্র : ২



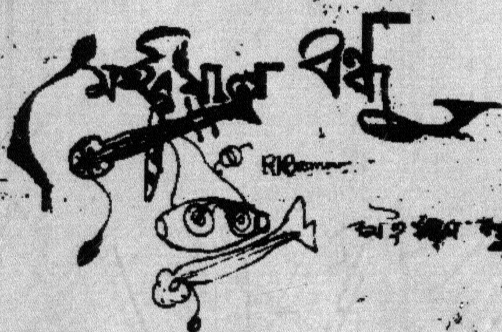
চিত্র : ৩



চিত্র : ৪

মইষাল - বন্ধু

মইষাল - বন্ধু



রচনা—



চিত্র : ৫



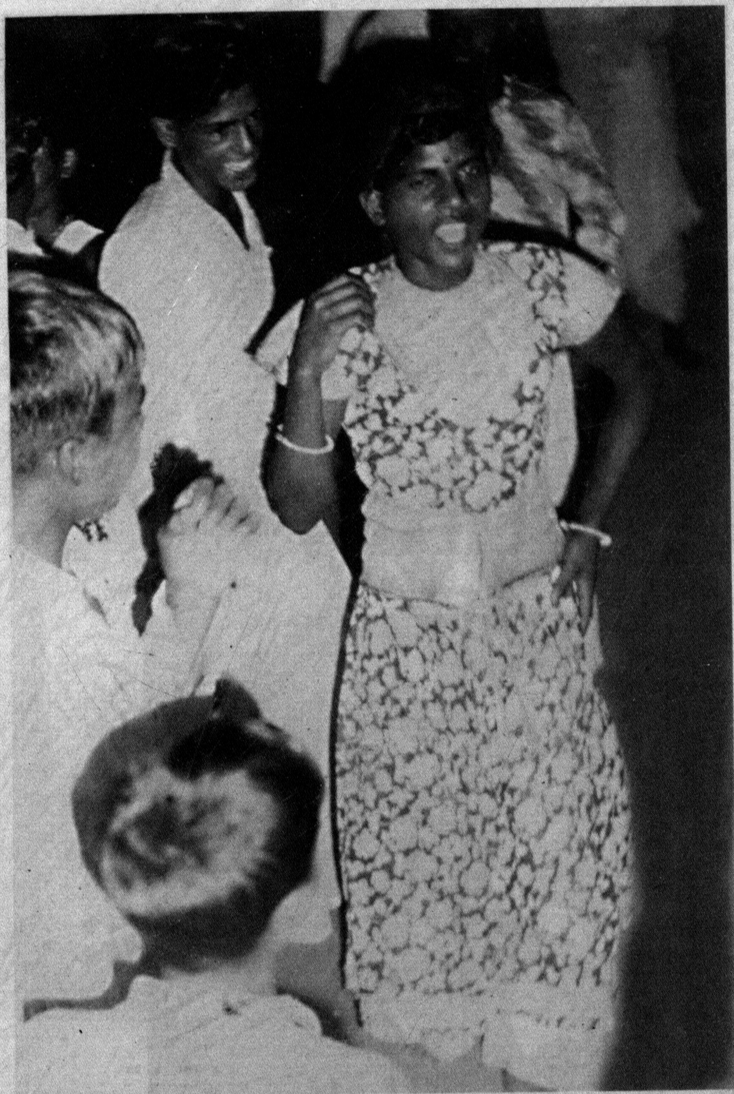
চিত্র : ৬



চিত্র : ৭



চিত্র : ৮



চিত্র : ৯



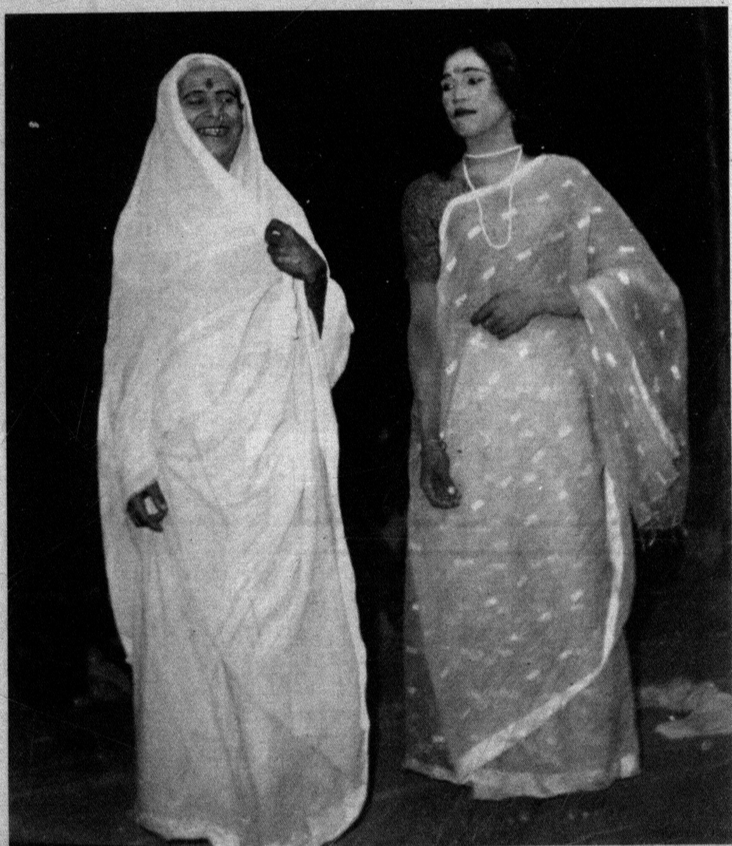
চিত্র : ১০



চিত্র : ১১



চিত্র : ১২



চিত্র : ১৩



চিত্র : ১৪



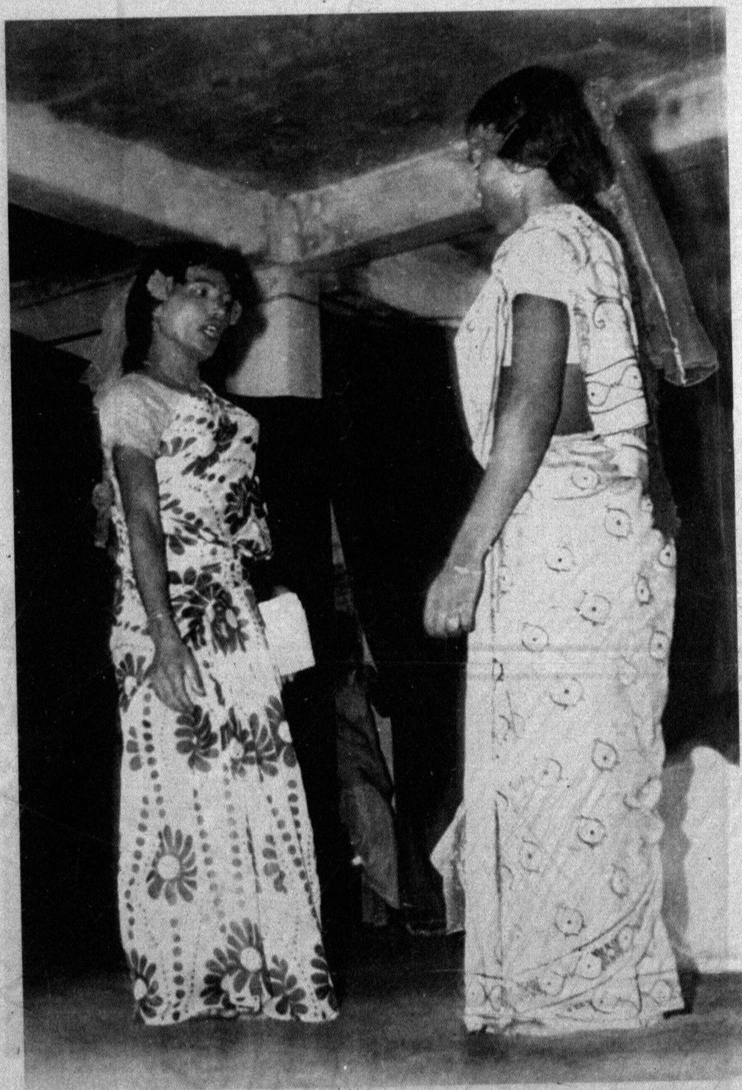
চিত্র : ১৫



চিত্র : ১৬

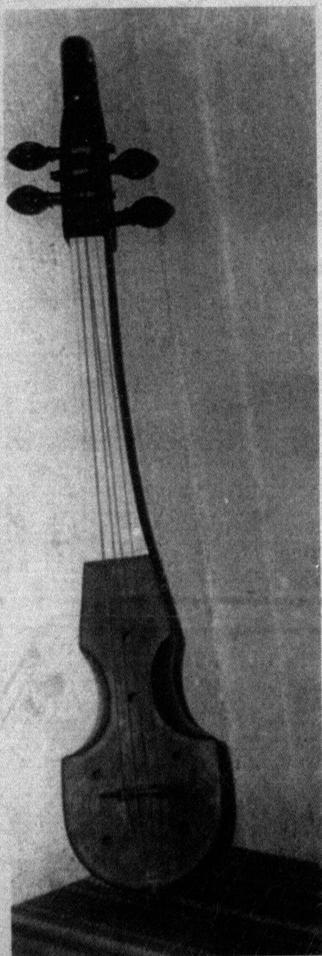


চিত্র : ১৭



চিত্র : ১৮





চিত্র : ২০

সবাইকে [আমাদের এই সংকলনে যারা আছে তারা তো বটেই, আরো যদি বাইরে কিছু থেকে থাকে তাদেরও] গ্রামীণ লোকনাটক বলতে চাননি।

৬. কিন্তু আমাদের এই সঙ্কলনে উদাহৃত গ্রামীণ লোকনাটকগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অত সঙ্কুচিত সংজ্ঞায় বেঁধে বাঙলার গ্রামীণ লোকনাটকগুলিকে বিচার করতে চাইবেন না। কারণ উক্ত এগারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণভাবে প্রায় সব গ্রামীণ লোকনাটকের মধ্যে কম-বেশি আছেই।

৭. অধিকন্তু, আদ্যন্ত কাহিনী না থাকলে নাটক [drama] না হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাধা 'লোক' সমাজের হয় না। ঐ সব পালার কোনো কোনোটায় খণ্ড-জীবনচিত্র বা সাময়িক ঘটনার খণ্ড-কাহিনী বর্ণিত হলেও সর্বস্তরের 'লোক' সাধারণ তার মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে থাকে। বোলান-আলকাপ-বনবিবির পালা-চোর-চুরনী ইত্যাদি পালার নাটকীয়তা কোন অংশেই কম নয়। তা থেকে গ্রামীণ আপামর দর্শকের নাট্যরসপ্রাশনে কোন রকম ঘাটতি হয় ন।

৮. কুশান বা বিষহরা ইত্যাদি পুরাণ বিষয়ক পালা। কিন্তু পুরাণ-কাহিনী হলেই যে সত্যমূলক হবে না, তা 'কৃত্রিম' হবে, তাতে জীবনের উত্তপ্ত আবেগের ছোঁয়াচ আদৌ থাকবে না তাই বা কেমন করে হয়। পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে থেকেই 'লোক'-সাধারণ আপন জীবন-সংসার ও সমাজের সত্যাকে অন্বেষণ করে সেখান থেকে আহৃত সত্যকে নিজেদের জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়। অতএব এই সত্য দৈনন্দিনতার ধূলা-মালিন্যযুক্ত না হলেও তা 'সত্যমূলক'। অতএব তাদেরও গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাধা কোথায়? এ কথা মনে রেখেই বোধ হয় প্রবন্ধকার [ড. ভট্টাচার্য] তাঁর লেখার একেবারে শেষে মন্তব্য করেছেন : 'তবে অন্যান্য গ্রামীণ লোকনাট্যের সঙ্গে তার যে খুব একটা বেশি পার্থক্য আছে তা নয়।'

৯. এ-ছাড়া 'যাত্রা' অত্যন্ত 'লোকপ্রিয়' ও জনমনোরঞ্জনকারী [popular and fascinating] অভিনয়মাধ্যম হলেও তাকে আমরা অনেকগুলি কারণেই 'গ্রামীণ লোকনাটক' হিসাবে গ্রহণ করিনি—কেন? তা যাঁরা 'যাত্রা' এবং সঙ্কলনে উদাহৃত লোকনাটক দেখেছেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন।

১০. ওপরে আমরা 'গ্রামীণ লোকনাটকে'র স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছি তার বাইরেও আরো কিছু বিশিষ্টতা নিয়ে তারা আপনা-আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ কবা একান্ত প্রয়োজনীয়।

১০.১. লোকনাটক মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়। এর চারদিকই খোলা। বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে দর্শকেরা আসরের চারদিকে গোল হয়ে বসে—কোন প্রসেনিয়ামের [proscenium] বাধা থাকে না। 'সাজঘব' [Green Room]-এব কথা আগেই বলা হয়েছে [৩.৫]।

১০.২. উত্তরবঙ্গের কোন কোন পালায় দেখা যায় বাদ্যকরেরা আসরেব মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে [প্রধানত 'কুশান' এবং 'বিষহরা' পালায় বাদ্যকরদের দাঁড়িয়ে বাজাতে দেখা যায়] সারাক্ষণ বাজনা বাজিয়ে যায়, আর অভিনেতারা তাদের ঘিরে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে যায়।

১০.৩. প্রত্যেকটি পালাই আঞ্চলিক। যাত্রা তেমন সারা বাঙলাতেই একই ভাবে দেখানো হয় [স্টেজনির্ভর যাত্রাভিনয়ের উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক], তেমন কিন্তু লোকনাটকের ক্ষেত্রে হয় না। উত্তরের পালার সঙ্গে মধ্য বা দক্ষিণের পালাভিনয়ের মিল অল্পই।

১০.৪. পালাগুলির সংলাপ প্রায় সর্বাংশেই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। ফলে ভাষাগত সংযোগ-সমস্যা রয়েই গেছে।

১০.৫ গ্রামীণ এইসব লোকনাট্য সবই সঙ্গীতনির্ভর—এদিক থেকে এদের অপেরা ধর্ম প্রায় অক্ষুণ্ণ। কোন কোনটিতে নৃত্যও অনেকখানি জায়গা করে নেয়।

১০.৬. গ্রামীণ লোকনাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এরা একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক; কোন ধর্ম-সম্প্রদায়কে কোনভাবেই আঘাত বা ব্যঙ্গ করে না। এদের দর্শকেবাও কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন নয।

১০.৭. আঞ্চলিক এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রই সুরসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন উত্তরে ব্যানা, দোত্‌রা, মুখাবাশি, মৃদঙ্গ, সঙ্গে ঢোল-কাঁসি, ঢাক, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, করতাল ইত্যাদিরও ব্যবহার দেখা যায়।

১০.৮. পোশাকের কথা আগেই বলা হয়েছে [৩.৪], তবে আজকাল কোন কোন পালায় কোন কোন দল ঝকমকে যাত্রার পোশাক ভাড়া করে নিয়ে আসে।

১০.৯ কোন কোন পালা আনুষ্ঠানিক, একটা ritual-কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় [তেমন, গম্ভীরা, বোলান ইত্যাদি], আবার কোনটি বা কেবলই আনন্দোপভোগ করাব জন্য [functional]। যদিচ কোন পূজা বা পাল-পার্বণ উপলক্ষে অনানুষ্ঠানিক কোন পালা-নাটক আমন্ত্রিত হয়ে আসতে পারে—পালা গাইতে পারে—সেখানে কিন্তু ঐ পালার functional চরিত্রটি ক্ষুণ্ণ হয় না। যেমন বীরভূমের লাভপুবে মাঘ মাসে অনুষ্ঠেয় 'ফুল্লরার মেলা'য় আলকাপের কোন দল 'কল শো' করার জন্য আমন্ত্রিত হতেই পারে।

১০.১০ গ্রামীণ লোকনাটকের প্রায় অনেকগুলিতে একটি ভাঁড় চরিত্র উপস্থিত থাকে। বিচিত্র তার সাজ-পোশাক। তাকে দেখা মাত্রই দর্শকেরা উচ্চ হাসিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। সে প্রায় সারা পালায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে, মূল নাট্য-সংলাপের এক-আধটা শব্দ তুলে নিয়ে সরস মন্তব্য করে। দর্শকেরা প্রাণভরে হাসতে থাকে। অথচ সে কোনভাবেই মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়। আসলে, অনাবিল অথবা কখনও স্থূল হাসি সৃষ্টিই তার কাজ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কেবল বাঙলার লোকনাটকে নয়, কিছু কিছু লোকনৃত্যেও এই ভাঁড় চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায়। [প্রমাণ হিসাবে আমার লেখা 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা' ১৩৮২ বা ১৯৭৫] গ্রন্থের চিত্রপরিচয় অংশের ২১ পৃষ্ঠায় মেদিনীপুরের কাঠিনাচের যে ছবি ছাপা আছে তাতে টুপি মাথায় ভাঁড়টিকে পেছন থেকে উঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে। এই ছবিটিই আমার লেখা ইংরাজি মনোগ্রাফ Folk Life and Lore of West Bengal [1981]-এব 41 পৃষ্ঠায় 44 নং ছবিতেও আরো স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে।] এই ভাঁড়ের ব্যবহারের কারণ কি? কোথা থেকে ও এলো, কার / কাদের প্রভাব এর পেছনে রয়েছে তা নির্ণয় করা একটি গবেষণা-সাধ্য বিষয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের সার্কাসের জোকারের কথা মনে পড়ছে কি?

১১. এ-প্রসঙ্গে একটি সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। ১৯৭৭ সালের অগাস্ট মাসে আমার শিক্ষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ইরানে পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য প্রদর্শনের জন্য গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। সেখানে ইরানি যাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো। এই যাত্রা এবং তার কমিক চরিত্র

ভাঁড় সম্পর্কে ড. ভট্টাচার্য তাঁর 'ইরাণ ভ্রমণ' [১৯৮০] গ্রন্থে যা লিখেছেন সেটি উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি লিখছেন :

'পালা আরম্ভ হলো : প্রথমেই সার্কাসের ভাঁড়ের মত রূপসজ্জা নিয়ে একটি চরিত্র প্রবেশ করল। তার মাথায় একটি আঁটোসাটো কাপড়ের টুপী, সারা মুখটিতে কালি বর্ণ লিপ্ত, গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সুদীর্ঘ এক গলাবন্ধ আলখাল্লা পরিহিত। আলখাল্লার ডান হাতটি প্রকোষ্ঠ বা মণিবন্ধ পর্যন্ত লম্বিত, বাঁ হাতাটি কনুই পর্যন্ত, কনুইয়ের পর থেকে তার প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত অন্য একাধিক জামার ছিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। পায়ে সস্তা দামের বিবর্ণ এক জোড়া ছেঁড়া জুতো।

'তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের মধ্যে যারা বসেছিল, তারা হেসে গড়িয়ে পাশের লোকের গায়ে পড়তে লাগল, আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হাসতে হাসতে নুইয়ে পড়তে লাগল।

'ইরাণী যাত্রার মূল চরিত্রই এই ভাঁড় চরিত্র। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইরাণী যাত্রার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন চরিত্র আছে, কিন্তু তাব প্রত্যেক পালার মধ্যেই একটি ভাঁড়ের চরিত্র অপরিহার্য রূপে যুক্ত হয়ে থাকে। ভাঁড়কে সর্বদাই কালামুখ অর্থাৎ কালো রঙে মুখ রঞ্জিত করে রূপসজ্জা করতে হয়। ক্বচিৎ সাদা রঙেরও ব্যবহার করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার না করে শুক্নো ময়দা মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয়। অভিনয় করতে গিয়ে মুখের আল্‌গা ময়দা অনেক সময় ঝরে পড়ে যায়, তখন প্রতিবারই ভাঁড় সাজঘরে এসে আবার নতুন করে ময়দা মুখে মেখে নেয়।... তার চরিত্র দ্বারা কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত হয় না কিংবা তার কোনো অগ্রগতিও তার দ্বারা সম্ভব হয় না, সমগ্র কাহিনী জুড়ে কেবল হাস্যরসের প্রবাহ অব্যাহত রাখবার জন্যেই পালার মধ্যে সে অপরিহার্যভাবে প্রধানতম অংশ অধিকার করে থাকে।...

'ইরাণী যাত্রার সঙ্গে পৃথিবীর বহু দেশেরই লোকনাট্যের কতকগুলো বিষয়ে গভীর ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।... আফগানিস্তানেব বিভিন্ন লোকনাট্য, এমন কি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অন্তত শতাধিক লোকনাট্যের রূপের সঙ্গে তার ঐক্য আছে। বাঙলার কথাও যদি ধরা যায়, তা হলেও দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে এখনো যে সকল গ্রামীণ লোকনাট্য

প্রচলিত আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটিব সঙ্গেই ইরাণী যাত্রার কতকগুলো প্রধান বিষয়ে ঐক্য আছে। তাদের মধ্যে ভাঁড়ের চরিত্র এবং তার গুরুত্ব অন্যতম। এক কথায় বলা যায়, ইরাণী যাত্রা উত্তব বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্য আলকাপ-এর বিষয়বস্তুর এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিন্নই বলা যায়। শুধু তাই নয়, উত্তর বাঙলার খনের গান, পালাটিয়া, রঙ পাঁচালি, এমন কি দেবদেবীর বিষয় নিয়ে লেখা লোকনাট্য বিষহরা [মনসামঙ্গল], কুশানে [বামায়ণ] এবং অংশত গম্ভীরা গানেও বিষয়বস্তুব ব্যবহার এবং পরিবেশনের দিক দিয়ে ইরাণী যাত্রাব অনেকটা অনুরূপ। ইরাণী যাত্রার যে চরিত্রটি অপরিহার্য অর্থাৎ মূল ভাঁড়ের চবিত্র, তা এদের মধ্যেও অপবিহার্য।

'...দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কৌতুককব ঘটনা ঘটে, তা নির্ভর করেই পালাগুলো রচিত হয়, এগুলো চিত্রধর্মী, কাহিনীগুণ কিছুই নেই। এইভাবে হেকিম ও তাব রোগী, দোকানের মালিক ও তার কর্মচারী, দোকানের মালিক ও ক্রেতা, উকিল ও তার মক্কেল, এমন কি, রাজা ও তাঁর মন্ত্রী, বাজপুত্র ও রাজকন্যা, প্রেমিক-প্রেমিকা ইত্যাদির চরিত্রও এইসব পালার মধ্যে আসে, কিন্তু প্রত্যেকটি পালারই কেন্দ্রীয় চরিত্র ভাঁড়। উত্তর বাঙলার যে সকল গ্রামীণ লোক-নাট্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তাদেরও প্রত্যেকেরই তাই। আগেই বলেছি, বিষয়টি তাৎপর্যমূলক।' [পৃ. ৮৯–৯২]।

১২. গ্রামীণ নাটকগুলির বস-পরিণাম প্রায় সর্বত্রই মিলনান্ত। মধুর মিলনের মধ্যে দিয়ে এবা সমাপ্তিতে পৌছায়। নিজেদের জীবনে ব্যথা-বেদনা-দুঃখ থাকলেও এখানে তারা তাকে আবার নতুন করে আস্বাদ করতে চায় না।

১২.১. কোন কোন পালায় আদিরসের ব্যবহারের অতিরেক লক্ষ্য করা যায়, যা আধুনিক শহুরে রুচিকে পীড়িত করে; কিন্তু গ্রামীণ মানুষের নিরাভরণ সারল্যের অনুষঙ্গে তা খুব একটা বেমানান লাগে না।

১২.২. অন্ততপক্ষে বাঙলার লোকনাটকের রচয়িতা-পরিচালক ও অভিনেতাদের সাহস অদম্য। তাঁরা সামাজিক-রাজনৈতিক অভিচারকে, সমাজব্যক্তিত্বের পতন-স্খলন-অন্যায়কে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন না।

প্রচণ্ড চাপ ও উৎপীড়নের মুখেও তাঁরা সত্যকে নিরাবরণ করতে ভয় পান না / নি। বাঙলার লোকনাটকের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এই তথ্য নতুন কিছু নয়।

১৩. এই সব বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সহযোগে গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যবোধ বহু পুরাতনকাল থেকেই অকৃত্রিম নান্দনিকতাকে পুষ্টিদান করে আসছে,—আধুনিক সুলভ আনন্দ মাধ্যমগুলির রঙিন হাতছানি এই সংকলনে উপস্থিত এবং তার বাইরেরও নাট্য উপকরণগুলিকে মেরে ফেলতে পারেনি; —মৃত্তিকালগ্ন তৃণের মতোই এরা আজও সবুজ ও সতেজ।



উত্তর বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য

লোকনাট্য কথাটি বর্তমান কালে অত্যন্ত শিথিলভাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছে। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, শিক্ষক কর্তৃক রচিত, সম্ভ্রান্ত প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত একাধিক সংস্করণের বহু গ্রন্থও বর্তমানে লোকনাট্য বলে পরিচিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত 'লোকনাট্য'-গুলো যেমন পাশ্চাত্ত্য নাট্যরচনার রীতি-প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত তেমনই পাশ্চাত্ত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী। সুতরাং এদের লৌকিক গুণ কিছুমাত্র নেই। অথচ এগুলোকে লোকনাট্য বলে অভিহিত করবার ফলে লোকনাট্য এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণের মনে যখন কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে, তখন তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে এই বিষয় সম্পর্কে যে ক্ষতির কারণ হবে, তা কোনোদিক থেকেই আর পূর্ণ হবার উপায় থাকবে না। সুতরাং এই সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

আমাদের দেশে নতুন যাত্রার পরিবর্তিত ও আধুনিক নাট্যমঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত রূপ আমরা আজ যাত্রা বলে দেখতে পাচ্ছি, তা প্রচলিত হবার আগে যে কৃষ্ণযাত্রার ধারা প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্যের কতকটা রূপ বিধৃত ছিল, কিন্তু তাতেও সম্পূর্ণ জিনিসটা ছিল না। সুতরাং যাঁরা সেই কৃষ্ণযাত্রা কিংবা তারই অনুকরণে রচিত এবং গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদিকে বাঙলার লোকনাট্যের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও লোকনাট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। গ্রাম্যজীবনে যে সাহিত্য মৌখিকভাবে জন্ম লাভ করে প্রচারিত হয়, তাই-ই লোকসাহিত্য হতে পারে না। সুতরাং নাট্যধর্মী যা কিছু গ্রাম্য জীবনে জন্মলাভ করে গ্রাম্য আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের সবই লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত লোকনাট্য বলতে কি বুঝায় প্রথমেই তা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য। লোকসাহিত্যের অন্যান্য সকল বিষয়ের মতোই তা বিষয় এবং রচনাগত পরিবর্তনের ধারা স্বীকার করে, কোনো কিছুই সম্পূর্ণ অবিচল হয়ে সমাজের

সামনে কোনো অপরিবর্তনীয় আদর্শের সৃষ্টি করে না। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে যে, তাব বিষয়বস্তু জনসাধারণের জীবনভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেকটি পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এবং তাদের নিয়ে যে সব কাহিনী রচিত হয় তাদের বিষয়ে আমাদের মনের মধ্যে একটি অবিচল এবং অপরিবর্তনীয় সংস্কাব আছে। তা বিসর্জন দিয়ে কিংবা তাকে যুগধারার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাহিনী কিংবা চরিত্রকে নতুন নতুন ভাবে রূপায়িত কবা যায় না। বিষয়বস্তু তার মধ্যে অবিচল থাকে, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ তার মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে এবং কাহিনীও তার অগ্রগতির ধারায় নতুন কোনো পথ সন্ধান করে নিতে পারে না, একই পথে চলতে থাকে, তার ফলে তার মধ্যে ক্রমে প্রাণশক্তি লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। কৃষ্ণযাত্রার কথাই যদি ধরা যায়, তা হলে কি দেখা যায়?

দেখা যায় যে তার কাহিনীর একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, তা ভাগবত থেকেই আসুক বা বৈষ্ণব পদাবলী থেকেই আসুক, যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা প্রথম রচনার দিন থেকে যতদিন পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত একই ধাবায় চলবে। তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এমন কি, তার প্রয়োগ-রীতির কোনো ব্যতিক্রম হতে পারবে না। যেভাবে কৃষ্ণযাত্রা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, এখনো গ্রামাঞ্চলে তা সেভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেবল তার কিছু কিছু অংশে মধ্যযুগের ভাষা আধুনিক যুগের ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সর্বাংশে তা হয়নি, তার অনেকাংশে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার মতো ব্রজবুলি ভাষার প্রভাব এখনো বর্তমান আছে। অথচ ব্রজবুলি ভাষা কৃত্রিম ভাষা। লোকসাহিত্যে যে কৃত্রিম ভাষার কোনো স্থান হতে পারে না, তা সকলেই জানেন।

কৃষ্ণলীলার সঙ্গে জনসাধারণের জীবনের যোগ কোথায়? এখানে জীবন বলতে বাস্তব জীবনই মনে করতে হবে, কারণ, সাহিত্য, তা শিষ্ট সাহিত্যই হোক, কিংবা, লোকসাহিত্যই হোক বাস্তব জীবন নির্ভর, প্রত্যক্ষতা তার একটা বিশেষ গুণ। লোকনাট্যের মধ্যেও তাই আমরা আশা করি। জীবন শব্দের অর্থই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। সুতরাং রূপকর্মে কিংবা জীবনে

যেখানে পরিবর্তন স্বীকার করা হয় না, সেখানে জীবনের ধর্মই নেই। যে সাহিত্য পরিবর্তনকে স্বীকার করে না, তা ক্লাসিক বা প্রাচীন সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু লোকসাহিত্য নয়।

অথচ কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে লোকসাহিত্যের কতকগুলো লক্ষণ আছে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু লক্ষণগুলো সবই বহির্মুখী, যেমন তা আংশিক মুখে মুখে রচিত হয়, মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। আংশিক বলছি এ-জন্য যে তার মধ্যে খুব সংক্ষিপ্ত যে গদ্য-সংলাপের অংশ আছে, তা মুখে মুখে তাৎক্ষণিক পদ্ধতিতে [Extempore] রচিত হয়, কিন্তু তার সঙ্গীতাংশ অর্থাৎ যে অংশ তার প্রায় পনের আনা রচনা অধিকার করে আছে, তা সবই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতাদিগের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর পদ। এই পদগুলোর কেবল ভাষাই নয়, সুরগুলো পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় ও অবিচল, তাদের রূপান্তর করে লৌকিক ক্ষেত্রে এনে পরিবেশন করবার কোনো উপায় নেই। তবে কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশত সুরের মধ্যে লৌকিকতা বা ভাঙা কীর্তনের সুর যোগ করলেও ভাষার মধ্যে কোনো পরিবর্তন কোনো দিক থেকেই স্বীকৃত হতে পারেনি। সুতরাং তাতে কাহিনী একটি অবিচল আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে, মধ্যযুগের কৃত্রিম ব্রজবুলিযুক্ত ভাষার ব্যবহার অপরিবর্তনীয় আছে, বাস্তবজীবন-নিঃসম্পর্কিত একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আছে, তা নিয়ে কখনো—আর যাই হোক, লোকসাহিত্য কিংবা তার বিষয়ীভূত লোকনাট্যও রচিত হতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণযাত্রার আর যে গুণই থাক, তা যে লোকনাট্য নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এ-কথা বিশেষভাবে বলবার একটু প্রয়োজন আছে, কারণ, অনেকেই মনে করেন, কৃষ্ণযাত্রা লোকনাট্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এককালে এ-ভুল আমি নিজেও করেছিলাম, তা স্বীকার করতে আজ আমার কোনো সঙ্কোচ নেই।

কৃষ্ণযাত্রার অনুকরণে এবং নতুন যাত্রার প্রভাব স্বীকার করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরো কতকগুলো পৌরাণিক বিষয়ক পাঁচালীধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন নাম। যেমন—রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি। কৃষ্ণযাত্রার একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় এবং সম্প্রদায়গত আদর্শ ছিল, কেবলমাত্র পরিবেশনা-কর্মের জনপ্রিয়তার জন্য অর্থাৎ কীর্তনগানের সর্বজনীন আবেদনের জন্য সম্প্রদায়গত সীমা অতিক্রম করে তা বৃহত্তর শ্রোতৃসমাজেও প্রচার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা এগুলো কৃষ্ণযাত্রার মতো কোনো গোষ্ঠীগত

সাম্প্রদায়িক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি বলে, এগুলোর রূপকর্ম অনেকটা লৌকিক স্তরে নেমে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লোকনাট্যের রূপ লাভ করতে পারেনি, যদি পারত, তবে তা আজো অবিকৃত থাকত। এ-সব 'যাত্রা' বলে পরিচিত রচনাগুলো লোকনাট্যের গুণান্বিত না হবার প্রধান কারণ, কালক্রমে এদের চরিত্রগুলো লৌকিক স্তরে নেমে এলেও এদের প্রত্যেকেরই কাহিনীগত এক একটি পৌরাণিক আদর্শ ছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে দুটির কাহিনী সংস্কৃত পুরাণ থেকে না এলেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা এক একটি সুনির্দিষ্ট রূপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এলেও এর একটি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি আছে। তাদের যথেচ্ছ আচরণ করবার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং চরিত্রগুলোর ক্রমবিবর্তন কিংবা পরিবর্তনেরও কোনো উপায় নেই। আদর্শ মঙ্গলকাব্যগুলোতে তাদের যা রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাদের লৌকিক নাট্যরূপের মধ্যেও তার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার একটি দায়িত্ব আছে। সুতরাং তাদের কাহিনী কিংবা চরিত্রগুলো কোনো সংস্কৃত পুরাণ থেকে না এলেও বাঙালির পুরাণ যে মঙ্গলকাব্য তার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা থেকে এসেছে। এ-দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের ক্ষেত্রেই কাহিনী এবং চরিত্রগত এক একটি অবিচল আদর্শ রক্ষা করবার দায়িত্ব আছে। সুতরাং এ-সব কাহিনী নিয়ে যে রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা কিংবা চণ্ডীযাত্রা রচিত হয়েছে তাও যথার্থ লোকনাট্য হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং এগুলোকেও লোকনাট্য বলে গণ্য করা যায় না।

বাঙলার পল্লী অঞ্চলে রামায়ণ-মহাভারত ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের বহু কাহিনী অবলম্বন করে আরো বহু নাট্যধর্মী নৃত্যগীত সম্বলিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বোলান গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের সকলের সম্পর্কেই একই কথা বলতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক একটি অবিচল আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে বলে তাদের স্বাধীন স্ফূর্তি ঘটার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ক্রমবিকাশের এবং ক্রমপরিবর্তনের ধারা রুদ্ধ হয়েছে, লোকসাহিত্যের চিরপরিবর্তনশীলতার ধর্ম থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে, তারপর সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বার ফলে তাদের প্রাণশক্তিও বিনষ্ট হয়েছে। তাই আজ বাঙলার পল্লীতেও রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা কিংবা চণ্ডীযাত্রা কোনো সাড়া জাগাতে পারে না। গ্রামীণ লোকনাট্যের আজ জনপ্রিয়তার অভাবের তাই-ই কারণ।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে যদি এ-কথাই বুঝতে পারা যায় যে, কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহ্যমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে মৌখিক রচিত কোনো গ্রামীণনাট্যও লোকনাট্য হতে পারে না, তবে বাঙলায় লোকনাট্য বলতে কি কিছু নাই? আমারও কিন্তু এমনই একটি ধারণা হয়েছিল যে বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্য বলতে আজ আর কিছু নেই, যা আছে তাকে প্রকৃত লোকনাট্যের সংজ্ঞায় ফেলা যেতে পারে না। সহসা মাত্র কিছুদিন আগে আমার উত্তরবঙ্গে যাবার সুযোগ হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমি অন্য অঞ্চলে গবেষণা কর্মে ব্যস্ত থাকায় এবং উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সেখানকার কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে আমার লোকসাহিত্য কিংবা লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করবার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সুযোগ হয় নি। তবে আমি আমার বহু ছাত্রছাত্রীকে, যাঁরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষকতা কিংবা অন্যান্য কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য নিয়ে কেউ কেউ গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিও লাভ করেছেন, তাঁদেরও গবেষণাপত্র পরীক্ষা করবার আমার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কেউ এই বিষয়ক গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে পারেননি এবং সেই ধারায় অনুসন্ধান করে তাঁদের অনুসন্ধান কর্মকে যথাযথ ফলপ্রসূ করে তুলতে সক্ষম হননি।

আমার সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের সুযোগে সেখানকার গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কয়েকটি গ্রামীণ অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পাই। তার ফলে দেখতে পাই যথার্থ গ্রামীণ লোকনাট্য বলতে যা বুঝায় তা এখনো উত্তরবঙ্গেই আছে, তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। উত্তরবঙ্গের গ্রামে গিয়ে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে আমি ইতিপূর্বে কোনো সংগ্রহকর্ম না করলেও, সেখানকার সংগ্রহ নানা পত্রপত্রিকায় যা প্রকাশ হতো, তা থেকে একটা বিষয় আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে 'কানু ছাড়া গীত নেই' এই প্রবাদটি অন্তত উত্তরবঙ্গের পক্ষে সত্য নয়, কোচবিহারের রাজদরবারে একদিন বৈষ্ণব ধর্মের যে অনুশীলনই হোক না কেন, তা জনসমাজের নিতান্ত সাধারণ স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। তাই সেখানকার প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নন, বরং গ্রাম্য 'চ্যাংড়া' মইষাল রাখাল, মাহুত, মাঝি এইসব, কিংবা তার নায়িকাও শ্রীরাধিকা নন বরং তার পরিবর্তে সামান্য কৃষককন্যা। ভাওয়াইয়া গানের মধ্য দিয়ে বিরহিণী নায়িকার যে অন্তর্বেদনা এত তীব্র বলে অনুভূত হয়

তার কাবণ, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা হয়,—রাধাকৃষ্ণের কোনো মাধ্যম গ্রহণ কবা হয না। সেই জন্য উত্তর বাঙলার প্রেমসঙ্গীতই বাঙলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে সর্বোত্তম প্রেমসঙ্গীত। সেইভাবেই আমার এ-কথাও মনে হয়েছিল যে সেখানে যদি কোনো গ্রামীণ লোকনাট্য এখনো বর্তমান থাকে, তবে তা নিশ্চযই পৌরাণিক কোনো কাহিনীভিত্তিক হবে না, বরং তার পরিবর্তে সাধারণ গ্রাম্য নবনাবীই তার নায়ক-নায়িকা হবে। তাই যদি হয, তবে তাদেব সম্পর্কে পৌবাণিক কিংবা প্রথাগত কোনো আদর্শ অনুসবণ কববার প্রয়োজন হবে না, কাহিনী এবং চরিত্রগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ কববাব সুযোগ পাবে।

উত্তরবঙ্গ গঙ্গা, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এই সব বিশাল নদনদী এবং তাদের বহু শাখাপ্রশাখা দ্বাবা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য উত্তরবঙ্গের বৈষয়িক উন্নতিতে বাধা হয়েছে, শিক্ষাদীক্ষাও আশানুরূপ প্রসাব লাভ কবতে পাবেনি, কিন্তু বাঙলার লোকসংস্কৃতির গবেষকদিগের পক্ষে এখনো তা সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থান হযে আছে। কারণ, চারিদিককার পরিবেশ থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ফলে তার মধ্যে আদিম এবং গোষ্ঠীজীবনের ধারা বহুলাংশে নিরুপদ্রব রয়েছে। অবশ্য উত্তরবঙ্গের এই বিচ্ছিন্নতা চিরকাল ধরেই চলে আসছে না। একদিন উত্তরবঙ্গেই বাঙলার রাজধানী ছিল। উত্তরবঙ্গই দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলার দ্বার পথ ছিল। গৌড় ধ্বংস হযে যাবাব পর থেকেই উত্তরবঙ্গের এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপের সূচনা হয়েছিল। নতুবা সেখানেই বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হযেছে, শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার একদিন তা কেন্দ্রভূমি ছিল। তা আজ দৃশ্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তাব প্রভাব সেই অঞ্চলের সকল জাতির লোকের মধ্যে এখনো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। শিল্প-সংস্কৃতিব বহু উপকরণ গিয়ে লোকসংস্কৃতিতে আশ্রয় এখনো সেখানে বেঁচে আছে। সেইজন্য সেখানকার জনজীবনের মধ্যে গভীবভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা তার ভিতর থেকে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপাদান এখনো উদ্ধার করতে পারি। তাই সারা পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বর্তমান বাঙলাদেশেও যখন আমরা 'কানু ছাড়া গীত' শুনতে পাই না, রাম-সীতা ছাড়া বন্দনা শুনতে পাই না, তখনো উত্তরবঙ্গে সাধারণ নরনাবীই লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের নায়ক-নায়িকা। উত্তর বাঙলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো যে প্রায় অকৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত আছে, তার প্রধান কারণ গৌড়ের পতনের পর থেকেই পাঁচশত বৎসরেরও

উর্ধ্বকাল যাবৎ তার বিচ্ছিন্নতা এবং সেগুলো এত শক্তিশালী তার কারণ একটা বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থান বলে, তার শিল্প-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। অনেক সময় নাগরিক শিল্প-সংস্কৃতি যখন নানা কারণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তখন তার উপকরণগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে লোকসংস্কৃতির রূপ লাভ করে। একদিন গৌড়ের সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল তা নানা ভাবে জনসাধারণের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে বিচিত্রমুখী লোকসাহিত্যের রূপলাভ করেছে। একটা শক্তিশালী ঐতিহ্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা বলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে আর কোনো নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারেনি। লোকসংস্কৃতির পেছনকার এই ইতিহাস কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না।

যাই হোক যে কথা বলছিলাম, উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এ-বার যে কয়েকটি গ্রামীণ অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের কয়েকটির মধ্যে প্রকৃত লোকনাট্যের রূপটি দেখতে পেলাম।

অনেকেই এ-কথা মনে করতে পারেন, আমি উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, আলকাপ, কুশানে কিংবা বিষহরার গানের কথা বলছি, কারণ, এ-গুলো সেখানকার গ্রামীণ জীবনে অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। গ্রাম্য পরিবেশে এ-সব অনুষ্ঠানও আমার একবার সেখানে দেখবার সুযোগ হয়েছিল সত্য, তথাপি একথা স্বীকার করতে হয় এদের মধ্যে একটিকেও লোকনাট্য বলে গ্রহণ করা যায় না। তার কারণগুলো বলা আবশ্যক। কারণ, অনেকেরই বিশ্বাস, এগুলো লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরবঙ্গে মালদহের গম্ভীরার গান ['গম্ভীরা গান' নয়, প্রকৃতপক্ষে তা 'গম্ভীরার গান'] পরিবেশনার দিক থেকে লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একটিমাত্র কারণের জন্য তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ এই গম্ভীরার গানে আনুপূর্বিক কোনো কাহিনী নেই। কিন্তু কাহিনী ব্যতীত নাটক হয় না। গম্ভীরার গান সাময়িক ঘটনার পর্যালোচনা মাত্র, কিন্তু কোনো আনুপূর্বিক ঘটনা [theme] নিয়ে তা রচিত নয়। একমাত্র এই কারণেই তাকে লোকনাট্যের অঙ্গীভূত করা যায় না।

আলকাপের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে তাই। তা-ও বিচ্ছিন্ন লৌকিক ঘটনার সমষ্টি মাত্র, তারও আনুপূর্বিক কোনো ঘটনা-অবলম্বন থাকে না। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে যাত্রা বা নাটকের কোনো কোনো পালা অবলম্বন করে আলকাপের পালাগান রচিত হচ্ছে এ-কথা সত্য, তথাপি আলকাপের

মৌলিক যা বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে কখনো কোনো আনুপূর্বিক নাটকীয় কাহিনী অবলম্বন করা হয় না। সুতরাং উপস্থাপনার মধ্যে লোকনাট্যের গুণ থাকা সত্ত্বেও তা-ও লোকনাট্য নয়।

তারপর যে কারণে ভাসানযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা কিংবা রামযাত্রাকে লোকনাট্য বলে গণ্য করা যায় না, সেই একই কারণে উত্তরবঙ্গের বিষহরা কিংবা কুশানেকেও লোকনাট্য বলা যায় না। কারণ, একক্ষেত্রে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল ও অন্যক্ষেত্রে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে তাদের কাহিনী রচিত হয়ে থাকে। এ-সব কাহিনীর কোনো ক্রমবিকাশ নেই, তার মধ্যে ক্রমপরিবর্তনের কোনো রীতিকেও স্বীকার করা হয় না, কিংবা তার চরিত্র ও বক্তব্যের মধ্যে যুগপ্রভাব কিছুই অনুভব করা যায় না, এক অবিচল আদর্শ অনুসরণ করে তাদের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং লোকনাট্যের দাবি তাদের দ্বারাও পূরণ হয় না।

তবে কুশানেই হোক কিংবা বিষহরাই হোক, এদের উপস্থাপনার মধ্যে নাটকীয়তা আছে, রূপায়ণের মধ্যে অসাধারণ শিল্পগুণ প্রকাশ পায়। মনে হয়, এদের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। রামযাত্রা কিংবা ভাসানযাত্রা অপেক্ষা এদের গুরুত্ব অনেক বেশি। সেইজন্য রামযাত্রা এবং ভাসানযাত্রা এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু গ্রামীণ জীবনে কুশানে এবং বিষহরা এখনও জীবন্ত হয়ে আছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন শ্রেণীর গ্রামীণ অনুষ্ঠান এখনো দেখা যায়, যাদের প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাট্য বলা যায়, তা পশ্চিম দিনাজপুরের খন বা খনের গান, মালদহ অঞ্চলের পালাটিয়া এবং জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের রঙ পাঁচাল। তাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাদের নায়ক-নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম্য নর-নারীর প্রতিনিধি। গ্রামেই সংঘটিত কোনো নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা তাদের বিষয়বস্তু, প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার মধ্যেও কৃত্রিমতা নেই—কোনো সাজসজ্জা নেই, কেবল যেখানে ছেলেরা মেয়ের অংশে অভিনয় করে সেখানে নিতান্ত সাধারণভাবে ছেলেরা মেয়ে সাজে, আর যখন যার যা পোষাক, তাই অভিনয়েরও পোষাক হয়ে থাকে। খনের গানে দেখতে পেলাম, একটি প্রধান চরিত্র পায়ে হাওয়াই চপ্পল, আধুনিক টেক্সাস্ ধরনের একটি ফুল প্যান্ট পরে গায়ে একটি সার্ট, তার উপর গলায় এক গরম [দারুণ গ্রীষ্মে] পশমী কমফর্টার জড়িয়ে অপূর্ব গীতনৃত্য সম্বলিত অভিনয় করল।

তাতে সাজঘর বলে কিছু নেই। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিক

ঘিরে বসে, যখন যার অভিনয় করবার প্রয়োজন তখন সেই সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার গিয়ে সেখানেই বসে থাকে। নাটকেব বিষয়বস্তু গ্রামজীবনভিত্তিক; সেই বৎসর [পুরানো কোনো দিনের কথা নয়] সেই গ্রামে যে-সব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়, নাট্যকাহিনীতে সঙ্গীতে সংলাপে নৃত্যে তারই রূপায়ণ দেখা যায। সুগভীর প্রণযমূলক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় গ্রাম্যজীবনে বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই সাধারণত অবৈধ প্রণয় কিংবা স্ত্রীপুরুষঘটিত সামাজিক অনাচার [incest], স্বজাতির বাইরে প্রেমজ বিবাহ—এসব সত্যমূলক ঘটনাই তাদের ভিত্তি হয়ে থাকে। তাদের জন্য কতকগুলো গান মুখে মুখে বাঁধা থাকে, সেগুলোকে অবলম্বন করে সত্যমূলক ঘটনাকে লক্ষ্য রেখে আসবে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক [extempore] সংলাপ রচিত হয়। কাহিনীর সূচনা আছে, ক্রমোন্নয়ন আছে এবং তার একটি সুস্পষ্ট পরিণতি আছে। বিশেষত গ্রামীণ শ্রোতার নিকট তার একটি সত্যমূলক আবেদন আছে। সেইজন্য নানা দিক থেকে অত সহজেই তা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। সব চাইতে বেশি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এক বছরের গান কিংবা কাহিনী পবের বছর আর শুনতে পাওয়া যায় না। সেই বছরের জন্য গ্রাম্য কবিরা সমসাময়িক কিংবা বাৎসরিক নূতন কাহিনীর সন্ধান করে এবং গ্রাম্যজীবনে তার সন্ধান ব্যর্থ হয় না। কাহিনীগুলো গ্রাম্য নরনারীর একান্ত প্রেমের অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বিশেষত সে প্রেমের কাহিনী সত্য হয়েও যদি অবৈধ কিংবা অস্বাভাবিক হয় তবে তা আরো বেশি উত্তেজনা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

উপরে যে বিশেষত্বগুলোর কথা উল্লেখ করা গেল তা প্রধানত খনের গানের উপর প্রযোজ্য, তবে অন্যান্য গ্রামীণ নৃত্যনাট্যের সঙ্গে তার যে খুব একটা বেশি পার্থক্য আছে তা নয়। উপরের বিশেষত্বগুলো থেকে বুঝতে পারা যাবে কেন প্রকৃত লোকনাট্য বলতে এগুলোকেই বুঝায়, রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণভিত্তিক কাহিনীর কৃত্রিম রূপায়ণকে বুঝায় না।

—

প্রবন্ধটি প্রায় পঁচিশ বছর আগে লেখা। পুরাতন সাময়িক পত্র থেকে এটি সংগ্রহ করা হলো বর্তমান গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা হিসাবে। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার ব্যাপারে গ্রন্থ-সম্পাদক প্রবন্ধকারের পুত্র ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্য স্বীকার করে।

□

যাত্রা : লোকনাট্য কি ?

অজিতকুমার ঘোষ

ইংরেজি folk কথাটির বাঙলা প্রতিশব্দ হল লোক। Folk বলতে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক অঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষ ধরনের প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কারশাসিত গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়কে বোঝায়। লোক শব্দটিও তেমনি সাধারণভাবে ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়গত মানুষকে বোঝালেও বিশেষ অর্থে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত বংশানুক্রমে এক বিশিষ্ট জীবনধারার বাহক গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়কে বোঝানো হয়ে থাকে। সেই জীবনধারা বলতে যেমন বাহ্য ক্রিয়া ও বৃত্তি—যথা, পশুশিকার, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, পূজা-উৎসব-মেলা, কারুশিল্প নির্মাণ ইত্যাদি বোঝায়, তেমনি বোঝায় উত্তেজিত চিত্তবৃত্তি এবং সহজাত আনন্দ-বেদনা প্রকাশের শিল্পমাধ্যমগুলির চর্চা। সেজন্য লোক কথাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পর্বত ও অরণ্যচারী এবং ভূমিচারী গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, সংস্কার, ক্রিয়া এবং আনন্দরসের শিল্পমাধ্যমগুলি। যথা, লোকবিশ্বাস, লৌকিক দেবদেবী, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য ইত্যাদি।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রজননপ্রবৃত্তি ও সন্তান উৎপাদনের কামনার ফলে আদিম পুরুষ ও নারী মিলিত হয়ে পরিবার গঠন করেছে, একই অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবার মিলিত হয়ে একটি মানবগোষ্ঠী [tribe] সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তখনও মানুষ অরণ্যচারী ও গুহাশ্রয়ী, শুধু শীতাতপ ও হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ভূমির উপর আকর্ষণ নেই, অধিকার নেই। সেজন্য তারা যাযাবর। এক অঞ্চল ত্যাগ করে আর এক অঞ্চলে গমনশীল। ক্রমে ক্রমে তারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে গৃহ নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেছে। ভূমিকর্ষণ করে কৃষিভিত্তিক সমাজের পত্তন করেছে। সেই ভূখণ্ডের জলবায়ু, আলো, গাছপালা, নদীনালা, পথপ্রান্তর, পশুপক্ষী, তার অনুভূতি, মনন, কল্পনাশক্তিকে বিশেষভাবে জাগিয়ে তুলে শিল্প ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত করেছে। মাটির উপর অধিকার জন্মেছে বলেই সেই মাটি রক্ষার জন্য লড়াই করেছে, বীরদের জয়ে নৃত্যসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উৎসব করেছে, তাদের মৃত্যুতে শোক ও বিলাপ করেছে, ওই গান ও নাচের মধ্য দিয়েই।

এতদিন শুধু আত্মরক্ষা করেছে। এখন তারা আত্মপ্রসার শুরু করল সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে, সুন্দরের সাধনার মধ্য দিয়ে। যে মাটির উর্বরা শক্তি তাদের শস্য দিয়েছে, জীবন বাঁচিয়েছে সেই উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা দেবদেবীর পূজা করেছে, উৎসব করেছে, আনন্দানুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। নৃত্য-নাটকের অধিপতি দেবতা হলেন শিব, সেজন্য তিনি নটরাজ, নটনাথ। তিনি হলেন শস্যদেবতা। অনেকের মতে শিবোৎসব থেকে নাটকের উদ্ভব হয়েছে। তেমনি গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসও হলেন শস্যদেবতা। তার উৎসব থেকেই গ্রীক নাটক উদ্ভূত হয়েছে। ডায়োনিসাসের উৎসবের সঙ্গে শস্যোৎপাদন কামনা মিশ্রিত হয়েছিল। সেজন্য প্রজনন ক্রিয়ার অনুকরণমূলক অভিনয় এবং উর্বরাশক্তির উদ্দীপিত জয়গান এই লোক-উৎসবের অঙ্গ ছিল। Goat song অথবা ছাগসঙ্গীত থেকে যেমন ট্রাজেডির উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি Phallic song অথবা লিঙ্গসঙ্গীত থেকে কমেডির উদ্ভব হয়েছিল। লিঙ্গসঙ্গীত গাইবার সময় উৎসবকারিগণ এক বিরাটকার লিঙ্গমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করত।

মানুষের আনন্দবেদনার ভাবপ্রকাশক মাধ্যম হল দুটি নৃত্য ও সঙ্গীত। নৃত্য দৃশ্যমাধ্যম আর সঙ্গীত শ্রব্যমাধ্যম। হৃদয়ের মধ্যে যখন আনন্দবেদনার আলোড়ন হয় তখন তা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের নানা ক্রিয়া অর্থাৎ পেশী সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে চায়। সেই সঞ্চালন ক্রিয়া যখন দেহভঙ্গির বৈচিত্র্য, সুনিয়ন্ত্রিত গতি ও তালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পুনঃপুনঃ ঘূর্ণন ও আবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়মবদ্ধ হয় তখন সৃষ্টি হয় নৃত্যের। কিন্তু লোকনৃত্য মানেই হল দলবদ্ধ নৃত্য। ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, আনন্দ-বেদনা তখনও মানুষের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠেনি, তখন যৌথ ভাবনা ও কামনাই সকলকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল। সেই ভাবনা-কামনাই সম্মিলিত নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ পেত। তবে নৃত্য তো স্বাধীন শিল্প নয়, তা সুর ও সঙ্গীতের উপর নির্ভরশীল। তখনও কণ্ঠসঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, কারণ কণ্ঠসঙ্গীত অর্থবহ বাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সঙ্গীতের ভাব প্রকাশ পেত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনির মধ্য দিয়ে। কালে কালে সেইসব ধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশক শব্দ ও বাক্যে পরিণত হয়। কিন্তু নৃত্যের জন্ম থেকেই নৃত্যের সঙ্গে তাল রাখত বাদ্যসঙ্গীত। নৃত্যের সঙ্গে চর্মবাদ্য, তারবাদ্য, শিঙ্গা ও বাঁশির ব্যবহার হত। এইসব বাদ্য নির্মিত হত মৃত

পশুর দেহাবশেষ দিয়ে। চর্ম দিয়ে তৈরি করা হত চর্মবাদ্য, অন্ত্র দিয়ে নির্মাণ করা হত তারযন্ত্র, শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি হত শিঙ্গা এবং বৃক্ষের ফাঁপা অংশ দিয়ে নির্মাণ করা হত বাঁশি। যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হত চর্মবাদ্য দিয়ে, যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ আহ্বান ফুটে উঠল শিঙ্গাধ্বনির মধ্য দিয়ে, অবদমিত বেদনা এবং রঞ্জিত আশার ভাষা ফুটে উঠত বাঁশি ও তারযন্ত্রে।

সঙ্গীতমিশ্রিত নৃত্যের মধ্য দিয়ে নানা অনুকরণমূলক ক্রিয়া দেখানো হত বটে, কিন্তু তখনও নাটকের জন্ম হয়নি। নৃত্যের মধ্য দিয়ে শত্রুবধের ক্রিয়া অনুকরণ করে দেখানো হত। শিকারের পিছনে উত্তেজিত শিকারীর ধাবন, আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে জয়োল্লাস ব্যক্ত করা—এগুলি বাদ্যযন্ত্রধ্বনিযুক্ত নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ পেত। তবে নৃত্যের মধ্য দিয়ে বাস্তব ঘটনা ও ক্রিয়ার অনুকরণ হলেও সেই অনুকরণাত্মক ক্রিয়া তখনও কিন্তু নাটক হয়ে ওঠেনি। সকল শিল্পের মূলেই যে রয়েছে অনুকরণ তা বলতে গিয়ে অনুকরণাত্মক নৃত্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন 'for even dancing imitates character, emotion and action by rhythmical movement', কিন্তু এই অনুকরণক্রিয়া যখন কথা ও কাহিনী আশ্রয় করল তখনই জন্ম নিল নাটক। সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে যখন কথা অর্থাৎ সংলাপ ও কাহিনী যুক্ত হল তখন নাটকের সৃষ্টি হল। কিন্তু এই সৃষ্টিক্রিয়া পূর্ণ, পরিণত রূপ পেতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। প্রথমদিকে সংলাপ এল বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথার মধ্য দিয়ে। সঙ্গীত ও নৃত্যের বাহুল্যের জন্য সুসংবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন কাহিনী গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগল। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে না, বাস্তব ব্যক্তিচরিত্ররূপ ফুটে ওঠে সংলাপের মধ্য দিয়ে। আর নৃত্যের গতি ও ভাবাভিব্যক্তি নাট্যচরিত্রের ক্রিয়া ও অভিব্যক্তির মধ্যে পরিণতি লাভ করল। সঙ্গীত ও নৃত্য থেকে নাটকের উদ্ভবের বিবর্তনস্তরগুলির মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের স্থলে সংলাপ ও কাহিনীর ক্রমগুরুত্ব-বৃদ্ধি আমরা লক্ষ্য করেছি। গ্রীক নাটকের উদ্ভবের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। ডিথাইর‍্যাম্ব সঙ্গীতের একজন নেতাচরিত্র ছিলেন। এস্কাইলাস দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন এবং সঙ্গীতের গুরুত্ব কমিয়ে সংলাপের গুরুত্বই প্রধান করলেন। সফোক্লিস আবার তৃতীয় আর একটি চরিত্র সংযোজন করলেন, সংলাপের গুরুত্ব ও কাহিনীর জটিলতা বাড়ল। ইউরিপিডিসের নাটকে সঙ্গীত শুধু

প্রচলিত রীতিরূপেই টিকে থাকল এবং ক্রিয়াময় সংলাপের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল।

বাঙলাদেশে সঙ্গীত ও নৃত্যাশ্রিত লোকনাট্যের উদ্ভব কিভাবে হল তা আলোচনা করা যেতে পারে। ডায়োনিসাসের শোভাযাত্রার মতো আমাদের দেশেও দেববিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা করা হত। শোভাযাত্রায় সঙ্গীত, নৃত্য ও কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি দেখা যেত। কালক্রমে এইসব উপাদানের সঙ্গে কিছু কিছু কথা ও কাহিনী যুক্ত হল এবং তখন লোকনাট্যের উদ্ভব হল। কিন্তু ডায়োনিসাসের শোভাযাত্রা সিটি ডায়োনিসিয়াতে যখন পৌঁছাত তখনই সেখানে নাটক শুরু হতো; আমাদের দেশেও ধর্মীয় শোভাযাত্রা যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাত তখন সেখানে লোকনাট্য অথবা যাত্রার আসরে অভিনয় শুরু হত। নাটকের জন্য নির্দিষ্ট লোকবেষ্টিত স্থান বা আসর দরকার, চলমান শোভাযাত্রার মধ্যে চরিত্রের কথা ও পর পর ঘটনা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

অভিনয়ের জন্য দরকার হল সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয়পটু শিল্পীর দল এবং তাদের দর্শকমণ্ডলী। একই জায়গার দর্শকদের কাছে বারবার একই অভিনয় দেখানো চলে না, সেজন্য নতুন নতুন জায়গায় কৌতূহলী দর্শকদের কাছে যাওয়া দরকার। সেজন্য নাট্যদল ছিল অবিরাম ভ্রাম্যমাণ। এই রকম নাটুয়া বা নেটোর দল বহু প্রাচীনকাল থেকে বাঙলাদেশে চলে এসেছে। নেটোর নাচ, গান ও কাচ অর্থাৎ সাজসজ্জা, মুখে মুখে রচিত পালা আশ্রয় করে গ্রাম্য জনগণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হত। সম্ভবত তারা সজ্জার পেটিকা নিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১০ নং চর্যাপদে 'তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এড্ডা'—তোমার জন্য আমি নটপেটিকা ত্যাগ করলাম।

নেটোর নাচ ও কাচের আর এক প্রকার ভ্রাম্যমাণ কৌতুক অভিনয়দলের কথা বলা যেতে পারে। তাদের বলা হয় সঙ। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোষাক পরে অঙ্গভঙ্গি সহ গান ও ছড়া কাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কৌতুকরসাত্মক অনুকৃতিকে সমাঙ্গ বা সঙ বলা হত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকার সঙের মিছিল বার করা হত। তাতে ছোট ছোট কৌতুকনাটিকার অভিনয় চলত।

বাঙলাদেশে যে-সব লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে লোকনাট্যের উপাদান ছিল সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। কারো কারো মতে পাঁচালী থেকে যাত্রা বা বাংলা লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। পাঁচালীর দুটি

অঙ্গ—গান ও ছড়া। সেই ছড়া অংশই হয়তো পরে সংলাপে পরিণত হয়েছে। প্রথমে পাঁচালীর গায়েন ছিলেন একজন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন দোহার ও মৃদঙ্গবাদক। কিন্তু কালক্রমে পাঁচালীর মধ্যে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানী হতে লাগল। মঙ্গলগানের মধ্যেও লোকনাট্যের উপাদান সন্ধান করা যেতে পারে। মূল গায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। মূল গায়েন ও দোহারগণ মন্দিরা নিয়ে তালে তালে নাচত ও গান গাইত। এই নাচ ও গানই মিলিত হয়ে এবং কিছু সংলাপেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাত্রাগানে পরিণত হয়েছিল। মনসার ভাসানেও গায়কগণ বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসরে দেখা দিত। এখানে নাটকের চরিত্ররূপ, সাজসজ্জা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ ছিল। গম্ভীরা বা গাজন উৎসবেও লোকনাট্যের অনেক উপাদান নিহিত রয়েছে। এই উৎসবে শোভাযাত্রা, তাণ্ডব নৃত্য, মুখভঙ্গি, হস্তপদাদি সঞ্চালন, শিবের চাষের পালার অভিনয় হয়। অর্থাৎ নাটকের অনেকগুলি লক্ষণই এই উৎসবে প্রকাশ পায়। ঝুমুর গানের শিল্পীরাও দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঝুমুর গান ও নাচ পরিবেশন করে থাকে। ঝুমুর গান যেখানে নৃত্যরীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংলাপের আকারে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই তার নাট্যগুণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাজন-উৎসব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোলান ও আলকাপ এবং ঢাকার কালীকাচের মধ্যে নৃত্যনাট্যের রূপ পাওয়া যায়। লোকনাট্যের মধ্যে মুখোসের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়! ছৌ-নাচ ও গম্ভীরা উৎসবে নানাপ্রকাব মুখোসের ব্যবহার হয়ে থাকে। খোলা আসরে দূরবর্তী দর্শকের কাছে মুখের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি দৃশ্যমান নয়। সেজন্য মুখোসের ব্যবহার হয়। মুখোসে মুখের অভিব্যক্তি গাঢ় ও অতিরঞ্জিত রেখা ও রঙে দূরবর্তী দর্শকের ভয়, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা জাগিয়ে রাখে। তবে মুখোস ব্যবহারের ফলে মুখোসধারী চরিত্র একটি বিশেষ ভাবপ্রকাশক টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়। চরিত্রের বিচিত্র ভাব ও মানসিক ক্রিয়া ব্যক্ত করার কোনো উপায় তাতে থাকে না।

লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে কোথায় কিভাবে লোকনাট্যেব উপাদান রয়েছে তা আলোচনা করা হল। কিন্তু উপাদান থাকলেই কোনো শিল্প নাট্যপদবাচ্য হয়ে উঠে না। যখনই সঙ্গীত প্রধান নয়, সহযোগী অঙ্গ হয়ে ওঠে, যখনই নৃত্য সার্বিক প্রাধান্য না পেয়ে শুধুমাত্র রমণীয় স্পর্শ ও

সুকুমার ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, এবং সংলাপ ও অবিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি গতিশীল নাট্যক্রিয়া দর্শকদের কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত করে রাখে তখনই জন্ম হয় লোকনাট্যের।

এই লোকনাট্যের ধারা আমাদের দেশে কিভাবে চলে এসেছে তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। বৈদিক যুগে সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি ও অনুকরণমূলক অভিনয় প্রচলিত ছিল। অভিনয়ের মূলে যে অনুকরণ-প্রবৃত্তি তা অ্যারিস্টটলের মতো ভরতও একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। যথা, 'লোকবৃত্তান্তনুকরণ', 'নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্'। এবং 'কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যাভিধীয়তে'। নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্গসঞ্চালন এবং পরে সংলাপ ও কাহিনী যুক্ত হওয়ার পরে নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। অ্যারিস্টটল বলেছেন, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত নাটকের পাশে সোফ্রোন এবং অন্যান্য অনুকরণশিল্পীদের মূকাভিনয় প্রচলিত ছিল। তেমনি আমাদের মনে হয় সুগঠিত নাটকের পাশে মুখে মুখে প্রাকৃত ভাষায় রচিত লোকনাট্যের অভিনয় ধারা প্রচলিত ছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রবহমান সংস্কৃত নাটকের ধারার পাশে এই গীতনৃত্যময় লোকনাট্য গ্রামীণ জনসাধারণকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এই নৃত্যগীতময় লোকনাট্যগুলিকে ভরতের পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রিগণ উপরূপক বলে নির্দেশ করেছেন। বাঙলাদেশে এই নৃত্যগীতময় নাটককে নাটগীতি অথবা গীতিনাট বলা হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই গীতিনাট শ্রেণীর রচনা। সংস্কৃতে রচিত হলেও বাঙলাদেশে প্রচলিত লৌকিক ভাষায় রচিত গীতিনাটের রূপই যে এর মধ্যে পরিস্ফুট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি সর্গে কবির [অধিকারীর] বর্ণনা, নৃত্যগীতময় অংশ, একভাষী সংলাপ এবং আবৃত্তিমূলক পদাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এই গীতনাটের মধ্যে গীতি, নৃত্য, আবৃত্তি ও ভাষ্য এই কয়েকটি অংশ রয়েছে এবং এই অংশগুলি নিয়েই গীতনাট গড়ে উঠত। এই গীতনাটেরই পূর্ণতর নাট্যরূপ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও সুসংবদ্ধ কাহিনী রয়েছে এবং এর মধ্যে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই এই তিনটি চরিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ উচ্চারণ করেছে। এখানেও সূত্রধারের ভূমিকা কবির। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের গৃহে যে যাত্রাভিনয় করেছিলেন তার পালা রচনা করেছিলেন স্বয়ং চন্দ্রশেখর। তিনিই যাত্রাপালার সর্বপ্রথম রচয়িতা। এই অভিনয়ে নৃত্যগীতি, কিছু সংলাপ এবং ভক্তিরসের সঙ্গে কৌতুকরসের

উপাদান যুক্ত ছিল। চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রার মধ্য দিয়ে লোকনাট্যের ধারা প্রবহমান ছিল। তার পরবর্তী যাত্রার ধারাকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

লোকনাট্যের যে আলোচনা উপরে করা হল তার থেকে এই লোকনাট্যের কতকগুলি লক্ষণ নির্দেশ করা যেতে পারে। যথা : ১. গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যে উদ্ভূত, গ্রামীণ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং গ্রামীণ জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত নাটকই লোকনাট্য। ২. লোকনাট্য সঙ্গীত-সম্বলিত নৃত্য থেকে উদ্ভূত হয়। সেজন্য গীত ও নৃত্য এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ৩. লোকনাট্য আঞ্চলিক ভাষাশ্রয়ী, আঞ্চলিক পটভূমি ও ঐতিহ্য এর মধ্যে থাকে। ৪. বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক ও গীতিমূলক। মানুষের বিশ্বাস, ত্যাগ ও ভক্তি জাগিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। ৫. লোকনাট্য চারিদিকে দর্শক পরিবেষ্টিত খোলা আসরে অভিনীত হয়। এখানে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী, অভিনয় সহায়ক কর্মী ও দর্শকমণ্ডলী সকলেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে। অতিশায়িত অঙ্গ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা এবং আবেগপ্রকাশের প্রবলতা এখানে অপরিহার্য। ৬. মৌখিক ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকনাট্য মুখে মুখে রচিত হয় এবং স্মৃতিবাহিত পরম্পরার ধারা এতে রক্ষিত হয়।

নগরপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি এই দুই ধারায় যেমন সংস্কৃতি বিভক্ত হল, তেমনি নাটকও লোকনাট্য ও সুগঠিত শিল্পসম্মত মঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাগরিক নাটকে বিভক্ত হল। নগরবাসীরা কৃষির পরিবর্তে শিল্প উৎপাদন শুরু করল এবং উৎপাদিত শিল্প তাদের অর্থপ্রাচুর্য দিল। তারা চাইল সূক্ষ্ম শিল্পকলাপ্রসাধিত, বৈদগ্ধ্যমার্জিত, রসাশ্রিত নাটক। সেই নাটক শুধু প্রেক্ষাগৃহের কলাকৌশলনিয়ন্ত্রিত মঞ্চেই সম্ভব। সেজন্য, মঞ্চনাট্যই নাগরিক জনসমাজের পৃষ্ঠপোষিত নাটক হয়ে উঠল। কিন্তু লোকনাট্যের ধারা বিলুপ্ত হল না। নাটক ও অভিনয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হল—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। ভরতের কথায়—'লোকধর্মী নাট্যধর্মী তু দ্বিবিধ স্মৃতঃ'। অন্যত্র আবার বললেন, 'স্বভাবো লোকধর্মী তু বিভাবো নাট্যমেব হি।' অর্থাৎ, স্বভাবাশ্রিত অভিনয় হল, লোকধর্মী অভিনয় আর বিভাব কিংবা বিশিষ্ট ভাবের অভিনয় হল নাট্যধর্মী অভিনয়। বিভাবের অর্থ বিকৃত ভাব না বলে বিশিষ্ট ভাব বলাই বিধেয়। সাজসজ্জা, অলঙ্কার, আলো, শব্দ, সঙ্গীত ও সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গসঞ্চালন ও অভিব্যক্তির

মধ্য দিয়ে নাটকের বিশিষ্ট ভাব উদ্রেক করা হয় বলেই এই অভিনয়কে নাট্যধর্মী অভিনয় বলা হয়েছে। লোকধর্মী অভিনয়ে অভিনয় হল সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াস; আব নাট্যধর্মী অভিনয়ে অভিনয় বিবিধ শিল্পপ্রকরণ এবং আঙ্গিকেব উপব নির্ভরশীল। লোকধর্মী অভিনয়ে অভিনেতা ও দর্শকমণ্ডলী পবস্পবের মধ্যে মিলেমিশে আছে, শুধু কথা ও গান দিয়ে এখানে ভাবরসেব সৃষ্টি হয়। তাতে দাতা ও ভোক্তা এক হয়ে যায়। আব নাট্যধর্মী অভিনয়ে অভিনয় সীমাবদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে, সেখানে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে হয়। কাবণ দূবত্ব না হলে মায়াজাল সৃষ্টি কবা যায় না, মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতীয়মান করানো যায় না; নাট্যধর্মী অভিনয়ে অভিনেতা যেন চারদিক ঘেরা কারাগারে বন্দী। চাব দেওয়ালঘেবা মঞ্চেব শুধু সামনের দেওয়ালটি অর্থাৎ যবনিকা প্রয়োজন মতো কখনো তোলা হয়, কখনো আবার তা দিয়ে মঞ্চটি ঢেকে দেওয়া হয়। মঞ্চ ঢাকা থাকে বলে প্রত্যাশা বাড়ে। অভিনেতাদের আগমন-নির্গমনও সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তাদের নিয়ে কৌতূহল ও চমকের আব শেষ নেই। কৃত্রিম আলোয় অজানা জায়গা থেকে হঠাৎ অপরূপ সাজসজ্জায় এসে যখন অভিনেতা অভিনয় শুরু করে তখন রোমাঞ্চিত আবেগের থর থর উত্তেজনায় দর্শকবৃন্দ আলোড়িত।

সব অভিনয়ই প্রথমে লোকধর্মী, তারপর স্থাপত্যশিল্প, পূর্তবিদ্যা, নির্মাণশিল্প, বস্ত্রশিল্প, অঙ্কনকলা, আলোক শিল্প, গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করে সেগুলি প্রেক্ষাগৃহনির্মাণ এবং নাট্যপ্রয়োগের কলাকৌশলে ব্যবহার করলেই নাট্যধর্মী অভিনয়ের সূচনা হয়। লোকধর্মী অভিনয়ের পরে নাট্যধর্মী অভিনয়ের উদ্ভব হলেও এই দুই প্রকাব অভিনয়ের ধারাও পাশাপাশি চলতে থাকে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে লোকধর্মী অভিনয়ের ধারা এবং শহরের প্রেক্ষাগৃহে নাট্যধর্মী অভিনয়েরই প্রচলন রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ভরত পুত্রগণসহ ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রধ্বজ উৎসব উপলক্ষে দেবদৈত্যের যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে রচিত নাটক প্রয়োগ করেছিলেন। নাটকের পরিণতিতে দেবতাদের জয় ও দৈত্যাদেব পরাজয় দেখানো হয়েছিল। এই অভিনয় মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য এ-অভিনয়কে বলতে হয় লোকধর্মী অভিনয়। দৈত্যরা এ-পরাজয় মেনে নেবে কেন? তারা প্রচণ্ড গোলমাল শুরু করে দিল। ইন্দ্র অবশ্য তাঁর জর্জর দণ্ড দিয়ে অসুরদের শাস্তি দিলেন। কিন্তু বোঝা গেল

এরূপ-অনাবৃত ও অরক্ষিত স্থানে অভিনয় করলে বিরোধী পক্ষকে আয়ত্তে আনা মুস্কিল হবে। তখন ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যশালা নির্মাণের আদেশ দিলেন। নাট্যশালার প্রতি দ্বারে রক্ষক রাখা হল। ইন্দ্র স্বয়ং ছিলেন রঙ্গমঞ্চের পাশে এবং বারান্দায় বিদ্যুৎপ্রবাহ সচল রাখা হল [ঠিক বর্তমান কালের মতো বৈদ্যুতিক তারের বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা আর কি!]। রঙ্গালয় নির্মাণের আগে যে মুক্ত স্থানে প্রথম লোকধর্মী নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে। হিমালয়ের উপরে বহুপর্বতসমাবৃত, আম্রবৃক্ষসমাকীর্ণ, রমণীয় কন্দর ও নির্ঝর শোভিত স্থানে অভিনয় হয়েছিল। যে দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেগুলি হল অমৃতমন্থন ও ত্রিপুরদাহ। প্রথমটি হল সমবকার ও দ্বিতীয়টি হল ডিম। এই দুই শ্রেণীর নাটকই বীররসাত্মক এবং দেবদৈত্যের প্রবল উত্তেজনাময় যুদ্ধ এই দুই প্রকার নাটকে দেখানো হত। বিস্তীর্ণ মুক্ত জায়গা এই ধরনের নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দুটি নাটকেই দেবদৈত্যের প্রবল পরাক্রম ও উত্তেজনাময় যুদ্ধ দেখানো হয়েছিল। দৈত্যরা দর্শক হয়ে নিজেদের পরাজয় দেখে কিভাবে সহ্য করবে; তাই প্রচণ্ড হাঙ্গামা। ইন্দ্রের জর্জর দণ্ড প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন এবং অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সুরক্ষিত রঙ্গালয় নির্মাণ। রঙ্গালয়ে যখন অভিনয় এল তখনই সূর্য চন্দ্রের আলোর অভাবে কৃত্রিম আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা করতে হল। নাট্যশাস্ত্রে আছে—'প্রগৃহ্য দীপিকাং দীপ্তাং সর্ব রঙ্গং প্রদীপয়েৎ'—অর্থাৎ, জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে [নাট্যাচার্য] সম্পূর্ণ রঙ্গালয় আলোকিত করেছেন। এই কৃত্রিম আলোকেই নাট্যধর্মী অভিনয়ের উপকরণগুলি, অর্থাৎ, অলঙ্কারের দীপ্তি ও বর্ণ, অঙ্গ রচনার বিবিধ প্রলেপ ও রঙের ব্যবহারে শিল্পীদের চিত্রময় সৌন্দর্য রচনা, সাজসজ্জার উপাদান, বর্ণ ও আকৃতি এবং নেপথ্যজাত শব্দ ও সঙ্গীত ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে অভিনয়ের চরিত্রগুলি শিল্পমূর্তি ধারণ করে এবং নিকটবর্তী দর্শকদের চোখে দৃশ্যমান অভিনয়ের সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যক্তির আভিনয়িক অনুষ্ঠানটি নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। ভরত তাঁর সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে এই নাট্যধর্মী অভিনয়ের কথাই বলেছেন। হিমালয়ের শিলাস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আম্রতরুর ছায়াঘেরা, নির্ঝরসিঞ্চিত আসরে দেবদৈত্যের সিংহনাদ ও বজ্রগর্জনের মধ্য দিয়ে যে লোকধর্মী অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তার কোনো বিবরণ পরে আর পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেই লোকধর্মী অভিনয় প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করে লোকপরম্পরায় স্মৃতিবাহিত

ধারায় চলে এসেছে, এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভবের পরে সেই ভাষার মাধ্যমে লোকনাট্য বা যাত্রারূপে লোকরঞ্জন করে এসেছে।

লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই লোকনাট্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়; যেমন, রাজস্থানে রাসধারী, উত্তর প্রদেশে নৌটঙ্কী, বিহারে বিদেসিয়া, মহারাষ্ট্রে তামাসা ইত্যাদি। উড়িষ্যায় ও বাঙলায় লোকনাট্যের নাম হল যাত্রা। তবে লোকনাট্যের কোনো রূপ যদি মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে শিল্পসম্মত নাটকের ন্যায় সূক্ষ্ম-বিধিনিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিকতার স্থানে কলাকৌশলনিয়ন্ত্রিত হয় তা হলে তা আর লোকনাট্যের পর্যায়ে থাকে না।

বাঙলা লোকনাট্য যাত্রার উল্লেখ আমরা প্রাচীন বৈদিক কাল থেকে দেখতে পাই। দেবপূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিরকাল যাত্রা অথবা গমন একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই যাত্রা হল দেববিগ্রহ এবং দেববিগ্রহের অনুসরণকারী শোভাযাত্রীদের এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন। বৈদিক সমাজে যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান নিয়ে একটা শোভাযাত্রা বার করবার প্রথা প্রচলিত হয়। ক্রমে সেই স্নানের ব্যাপার নিয়ে রাজারা শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করতেন। ক্রমে ক্রমে এই শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে। দেবদেবীদের সকল পূজা-উৎসবই একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক স্থান থেকে অপর এক স্থানে গমন এবং উৎসবশেষে আবার স্বস্থানে প্রত্যাগমন প্রত্যেক দেবযাত্রার অঙ্গ। দেবযাত্রার সঙ্গে দেবভক্তদের যাত্রা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। ভক্তদের কণ্ঠে থাকত দেবমহিমাজ্ঞাপক গান এবং সেই সঙ্গে থাকত রঙ-তামাসা-ভাঁড়ামি এবং অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গি। রথযাত্রা অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। অনেকের মতে বৌদ্ধরথযাত্রা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় পরিণত হয়েছে। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীতে উত্তররামচরিত নাটকে সূত্রধারের মুখে বলেছেন : 'কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়ামার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি'—অর্থাৎ, কালপ্রিয়নাথের যাত্রা অথবা মেলায় সমাগত সম্মানিত সজ্জনদের বিজ্ঞাপিত করছি। মনে হয় উত্তররামচরিত নাটকটি কালপ্রিয়নাথের উৎসবে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রথের রশি নাটকে কালপ্রিয়নাথের [শিবের] রথযাত্রা উৎসবের উল্লেখ করার সময় সম্ভবত উত্তররামচরিত থেকেই এই দেবতার নামটি নিয়েছিলেন। বাঙলায় শ্রীকৃষ্ণের যাত্রাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই যাত্রা কোথাও দোলযাত্রা, কোথাও রাসযাত্রা এবং কোথাও বা ঝুলনযাত্রা।

দেবযাত্রা, উৎসব ও মেলা এই তিনটির সঙ্গে প্রাচীন যাত্রা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। গমনজ্ঞাপক যাত্রা শব্দটি বিশেষ ধরনের লোকাভিনয়জ্ঞাপক কিভাবে হল তা আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্মীয় শোভাযাত্রীদল দেববিগ্রহ অনুসরণ করে বিগ্রহের গন্তব্যস্থলে সমবেত হত। সেই সমবেত দেবভক্ত গায়ক ও শিল্পীদের দ্বারাই যাত্রাভিনয়ের সূচনা হল। অর্থাৎ, যারা প্রথম দেবতার সঙ্গে যাত্রা করেছিল তারা দেবতার মহিমাজ্ঞাপক অভিনয় করল, তাও যাত্রা নামে অভিহিত হল। যাত্রা—মূল অর্থ গমন, পরবর্তী অর্থ বিশেষ ধরনের অভিনয়। বলা বাহুল্য, প্রথমে যাত্রাভিনয় ছিল গীতপ্রধান এবং কিছু সংলাপ। সুতরাং যাত্রার প্রাথমিক স্তর ছিল দেববিগ্রহের নিকটবর্তী স্থানে দেবমহিমাজ্ঞাপক গীতপ্রধান, সংলাপমিশ্রিত অভিনয়।

ক্রমে ক্রমে যাত্রা সুসংবদ্ধ কাহিনীর মধ্যে উপস্থাপিত হল এবং সংলাপের গুরুত্বও বাড়তে লাগল। যাত্রা একটি লোকরঞ্জন শিল্পমাধ্যম রূপে গড়ে উঠল এবং শিল্পে প্রবীণ ও দক্ষ লোকেরা এক একটি ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করল। তাদের অভিনয় দেখাবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা কিংবা নাট্যগৃহ ছিল না, সেজন্য তারা ছিল ভ্রাম্যমাণ। যাত্রাই ছিল তাদের জীবন ও জীবিকা। যুগের পর যুগ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রার মৌলিক দিকগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই ছিল। খোলা আসরে অভিনয়, গীতের প্রাধান্য, সোচ্চার কণ্ঠে অতিশায়িত অঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয়, দেবমহিমাজ্ঞাপন এবং লোকশিক্ষা প্রচার—এগুলিই ছিল যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য।

যাত্রার তৃতীয় স্তরে আমরা দেখলাম, যাত্রার উপরে থিয়েটারের প্রভাব। এই থিয়েটারের প্রভাবে থিয়েটারের নাটকের প্রভাব পড়ল যাত্রার পালায়। অর্থাৎ, যে যাত্রা ছিল গ্রামজীবনে অনুষ্ঠিত লোকাভিনয় তা আস্তে আস্তে শহরের আনাচে-কানাচে অনুপ্রবেশ করতে লাগল। থিয়েটারী নাটকের মতো যাত্রার পালাও নাটকে রূপান্তরিত হল, নাটকের গতিশীলতা, দ্বন্দ্বসংঘাত, সংগীতের পরিবর্তে নাট্যক্রিয়ার প্রাধান্য, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীগ্রহণ ইত্যাদি।

যাত্রার চতুর্থ স্তরে যাত্রার উপরে চলচ্চিত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যাব বিসদৃশ প্রভাব দেখা গেল। পিছনে পর্দার ব্যবহার, পর্দার উপর আলো ও ছায়ার প্রতিফলন, স্পট্ লাইটের ব্যবহার। যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের মধ্য

দিয়ে নানা অর্থবহ, উত্তেজনাজনক শব্দ ও গতিবেগসৃষ্টি ইত্যাদি দেখা গেল। চিরাচরিত নীতি ও ধর্মের আদর্শ সম্পর্কে সংশয় ও প্রতিবাদের সুরই ধ্বনিত হল। দেশীয় ও জাতীয় সীমানা থেকে যাত্রার কাহিনী সম্প্রসারিত হল বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও গণসংগ্রামের প্রচারমাধ্যম হয়ে উঠল যাত্রা।

উপরে আলোচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের যাত্রাকে নিশ্চয়ই লোকনাট্যরূপে স্বীকার করতে হয়। তৃতীয় স্তরের যাত্রার উপরে চিৎপুরের যাত্রার মালিকদের অর্থনিয়ন্ত্রিত জাঁকজমকপূর্ণ শিল্পপারিপাট্যযুক্ত উপস্থাপনার রীতি প্রবর্তিত হয়নি। গ্রামের লোকজীবনের সঙ্গে তখনও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু চতুর্থ স্তরে যাত্রার মূল ধারা সম্পূর্ণরূপে চিৎপুরের অর্থশালী যাত্রার মালিকদের অধীন হয়ে পড়ল। অর্থবলে তাঁরা মঞ্চ ও চিত্রজগতের নামী ও দামী শিল্পীদের যাত্রাদলে নিয়ে এলেন, সাজসজ্জা, আলো, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অভিনয়কে করে তুললেন বিরাট, বিস্তৃত, আড়ম্বর ও জাঁকজমকে চমকপ্রদ। যাত্রা বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনয় মাধ্যম। হাজার হাজার দর্শককে যাত্রা দাপটের সঙ্গে ধরে রাখে। তার প্রচারের চমক ও বিজ্ঞাপনের চটকের তুলনা নেই। তবে খোলা জায়গায় অভিনয় ছাড়া লোকনাট্যের কোনো লক্ষণই এতে এখন নেই। কলকাতার বিভিন্ন নাট্যশালায় তো যাত্রা এখন নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। চারদিক খোলা আসর তো উঠেই যাচ্ছে। অভিনয় স্থলের এক প্রান্তে পশ্চাৎ দেওয়ালের সম্মুখভাগে বহু যাত্রাভিনয় চলে। নগরভিত্তিক এই যাত্রার দলগুলি মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে অভিনয় এগুলিকে লোকনাট্যরূপে চিহ্নিত করা মুশকিল। তবে গ্রামের মধ্যে যে যাত্রার দলগুলি এখনও লোকজীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে আছে সেগুলিই লোকনাট্যরূপে স্বীকৃত হতে পারে।

১৯৯৪-এর ২০ মার্চ 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ'-এর পক্ষে 'আশুতোষ ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতা'-র যে আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়।

□

গ্রামীণ লোকনাট্যক : আলকাপ [পঞ্চরস]

মহঃ নুরুল ইসলাম

নাম-ব্যাখ্যা :

আলকাপ মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহের জনপ্রিয় লোকনাট্য। আলকাপের শিল্পী ও সমঝদার মহলে জনশ্রুতি আছে যে, আলকাপের স্রষ্টা হলেন বোনাকানা বা বনমালী প্রামাণিক। তিনি অধুনা বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শিবগঞ্জ থানার এলাকাধীন মোনাকষা গ্রামে বাস করতেন।

'আলকাপ' শব্দটি ব্যঞ্জনাধর্মী। 'আল' শব্দের নানাপ্রকার অর্থ আছে—কন্টক, সীমানা, কীলক, হুল ইত্যাদি। 'কাপ' কথাটির অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাসা, সঙ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের ভিক্ষাযাত্রা অংশে কাপ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়: 'কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ, / কেহ বলে বুড়োটি খেলাও দেখি সাপ।' এখানে কাপ শব্দটি বঙ্গব্যঙ্গকারী অর্থে ব্যবহৃত। 'কাপ' শব্দটির উৎপত্তি কাপট্য থেকে [কাপট্য > কাপটা > কাপ], যার অর্থ ছদ্মবেশী বা কৌতুক।

আলকাপের পরিচয় প্রসঙ্গে আলকাপ শিল্পী গোপালচন্দ্র মণ্ডল [চণ্ডীপুর, ফরাক্কা] বলেন: আলকাপ শব্দটি 'আলকাটাকাপ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর মানে সীমানা [জমির আল], আর আলকাটাকাপ-এর অর্থ সীমাহীন হাসি-তামাসা বা অসংযত রঙ্গরসিকতা। আবার প্রখ্যাত আলকাপ ও গম্ভীরা শিল্পী বিশু পণ্ডিত [বিশ্বনাথ পণ্ডিত, ইংলিশবাজার, মালদা] বলেন যে : আলকাপের কাপগুলি যেহেতু আগে ছোট ছোট ছিল, সেহেতু সীমায়িত অর্থে 'আলকাপ' নামকরণ।

উপর্যুক্ত মতামতগুলি ছাড়াও আলকাপ শিল্পীদের মধ্যে সমধিক আলোচিত এবং বহু কাপের মধ্যে পরিস্ফুট আলকাপ শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় তা হল, ব্যঙ্গমূলক বা বিদ্রূপাত্মক অভিনয়রীতি। এখানে 'আল' অর্থে হুল এবং 'কাপ' অর্থে কৌতুক বা প্রহসন বোঝানো হয়েছে।

আলকাপ অধ্যুষিত এলাকায় 'আল' বলতে 'হুল' বোঝায়। যেমন লাটিমের নিচের দিকে যে অংশটি ধারালো কাঁটার মতো, যার উপর অবলম্বন করে লাটিমটি আবর্তিত হয়, ইংরেজিতে যা pivot বা

আবর্তনকীলক, এই এলাকায় তার নাম আল। বলদ বা মোষকে জোরে হাঁটাবার জন্য যে ছড়ি ব্যবহার করা হয়, তাকে এই এলাকায় বলে পয়না। এই পয়না বা পাঁচনের আগায় ছুঁচের মতো ধারালো একটি বস্তু থাকে তাকেও বলে 'আল'। গরু-মোষকে আলবিদ্ধ করে দ্রুত চালনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাউকে মৌমাছি বা ভীমরুলে হুলবিদ্ধ করলে বলা হয় 'আল ম্যার‍্যাছে' অর্থাৎ হুল ফুটিয়েছে। আলকাপের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যগুলিকে মূর্ত করে তুলে মানুষকে সচেতন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে জমিদারি উচ্ছেদের কাপটির কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

জমিদার তাঁর ছেলে সুরেনের জন্য সুন্দরী পাত্রী খুঁজতে ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন। ম্যানেজার বিভিন্ন জায়গায় খবরটি জানাবার জন্য ঢুলিকে ঢোল শহরৎ করতে নির্দেশ দেন। নানা জায়গা থেকে পাত্রীর সন্ধান আসে। জমিদারের ছেলের এক গরীব চাষীর মেয়েকে পছন্দ হয়। কিন্তু কদাকার কুৎসিত জমিদারপুত্রকে দেখে মেয়েটির পছন্দ হয় না। সে তার অপছন্দের কথা তার বাবাকে জানিয়ে দেয়। তবু জমিদারের চাপে পড়ে এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয়ে মেয়েটির বাবাকে রাজি হতে হয়। বিয়ের দিন কৃষক-কন্যা জমিদারপুত্রকে মালা দিতে গিয়ে ম্যানেজারের ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দেয় এবং প্রথামতো তাদের মধ্যে বিয়ের কাজও সমাধা হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ জমিদার ম্যানেজার ও কৃষকটির উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রজারা ম্যানেজারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে জমিদারের জমিদারি উচ্ছেদ করে [কাপটি মালদহ জেলার সুজাপুর-বামুনপুর গ্রামের আবুল কাশেম খলিফার কাছ থেকে সংগৃহীত]।

আলকাপের এলাকা :

আলকাপের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার নামটি জড়িত। আলকাপ কিন্তু মুর্শিদাবাদের পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহেও অভিনীত হয়। বীরভূম জেলার রাজগ্রাম, মুরারই, লাভপুর, নলহাটী; বিহারের সাহেবগঞ্জ [সাঁওতাল পরগণা] জেলার মহেশপুর, বারহারোয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল; পুর্ণিয়া জেলার বাঙলার সীমান্তবর্তী বাঙলা ভাষাভাষী এলাকা; রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, কানসাট, ভোলাহাট, রহনপুর, আমনুরা প্রভৃতি এলাকায় এবং মালদহ জেলার সর্বত্র আলকাপ গান অভিনীত হয়। তাছাড়া দিনাজপুর, বর্ধমান, নদীয়া জেলার কোথাও কোথাও আলকাপের আসর

বসে থাকে। তবে আলকাপের 'কাপ' অংশটিতে আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রাধান্য থাকায় এক অঞ্চলের আলকাপ অন্য এলাকার দর্শকদের কাছে ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না।

অভিনয়কাল :

আলকাপ পূজা-উৎসব অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ একটি লোকনাট্য। আলকাপ অভিনয়ের কোনো নির্দিষ্ট কাল নেই। তবে প্রাকৃতিক দিক থেকে অনুকূল সময়ে আলকাপের অভিনয় হয়ে থাকে। সাধারণত বর্ষাকালের পর, বিশেষ করে দুর্গা পূজার পর থেকে আলকাপের আসর বসা শুরু হয় এবং গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত নানাস্থানে আলকাপের অনুষ্ঠান হয়। কোনো কোনো জায়গায় মাসাধিক কাল পর্যন্ত আলকাপের অনুষ্ঠান একনাগাড়ে চলে। গ্রামীণ সমাজে আমন ধান উঠে যাবার পর মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ; তখন থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়টা আলকাপের অনুষ্ঠানের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। বর্তমানে কৃষিপ্রযুক্তির পরিবর্তন, এক-ফসলী জমিকে দো-ফসলী / তিন-ফসলী জমিতে রূপান্তর, গ্রামীণ কুটিরশিল্পের বিকাশের ফলে আলকাপের আঙ্গিকগত উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে সময়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে আলকাপ সন্ধ্যায় বা একটু রাত্রে শুরু হয়ে পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলত। কিন্তু বর্তমানে পাঁচ-ছয় ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠানের সময়কে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। টিকিটের প্রথা চালু হবার ফলে এক জায়গায় দীর্ঘ আসরও বসে না। তাছাড়া আনন্দ বিনোদনের জন্য সিনেমা, ভিডিও, টিভি, যাত্রা ইত্যাদি মাধ্যমের লৌকিক সমাজে আধিপত্য বিস্তারের ফলেও সময়সীমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এ-ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে—আলকাপের অভিনয়ের সময় পরিবর্তনের।

আলকাপের শিল্পী ও দর্শক সমাজ :

আলকাপ দল ওস্তাদ বা ছড়াদার, ছোকরা, কপ্যা, সাধারণ অভিনেতা, বাজনদার, দোহারকি প্রমুখ নানা ধরনের শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত। আলকাপ দলে যিনি ছড়া কাটেন, কাপ, পালা রচনা করেন তাঁকেই ছড়াদার বা মাস্টার বলা হয়। আবার তাঁকে খলিফাও বলা হয়। সাধারণত তাঁর নামানুসারেই দলের নামকরণ হয়। দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক আসরে মাস্টার বা খলিফাই দলের প্রধান কাণ্ডারী। বর্তমানে আলকাপের সময়সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে ছড়াদারের ভূমিকা গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

আলকাপ গানের মধ্যে কাপ অংশে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁকে বলা হয় কপ্যা বা সঙাল বা সঙদাব। মালদহ জেলার বহু জায়গায় কপ্যাকে আবার বলা হয লাব্বাড়—এই খোট্টাই ভাষার অর্থ হল ঠাট্টাকারী বা কৌতুককারী। 'কপ্যা' দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, মজার গান ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শক সাধারণকে কৌতুকরস পরিবেশন করে থাকেন। 'কপ্যা' হিসাবে বোনাকানার বিশেষ সুনাম ছিল।

আলকাপ গানে নারীবেশী পুরুষ অভিনেতা বা গায়কদের বলে 'ছোকরা'। আবার নাচিয়াও বলা হয়। 'খেমটা নাচ' অংশে ছোকরারা অংশগ্রহণ করে বলে তাদের অপর নাম খেমটি। তাদেব মেয়েদের মতো চলন-বলন অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে হয়। তাদের কণ্ঠস্বরও সুরেলা ও সুমিষ্ট হয়। তবে নির্দিষ্ট বয়সের পর আর তাবা ছোকবা থাকে না, গলা তখন কর্কশ হয়ে যায়। মুস্তাফা সিরাজের ভাষায় বলতে হয়—মৃন্ময়ী প্রতিমার রুক্ষ কাঠামো বেরিয়ে আসে। ছোকরাব বয়স সম্পর্কে ওস্তাদ ঝাঁকসু বলতেন: 'কম বারো উপরে বিশ / তাতে একটু উনিশ বিশ।'

বিখ্যাত ছোকরাদের মধ্যে বোনাকানাব দলেব মৃত্যুঞ্জয়, উপেন; ঝাঁকসুর দলের শান্তি; মকবুলের দলের মহেন্দ্র, যষ্ঠী; আরো পরবর্তীকালে মাহাতাব, ফুলচাঁদ, বাবলু সরকার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে কিছু কিছু দলে মেয়েরা আলকাপ অভিনয় করতে আসছে।

ওস্তাদ, কপ্যা, ছোকরা ছাড়া আলকাপ দলের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন বাজনদার, দোহারকী, সাধারণ অভিনেতা প্রমুখ। আলকাপ দলের বাজনদাররা কেবল বাজনাই বাজান না, অন্যান্য ভূমিকায়ও মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন। অন্য শিল্পীরাও প্রয়োজনে বাদ্যযন্ত্র বাজান বা দোহাবকীর কাজ করেন।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে আলকাপ দলের শিল্পীরা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান। তাঁরা অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের মধ্যে বহু শিল্পীই নিরক্ষর বা কেবল স্বাক্ষর করতে পারে মাত্র। যে সময়ে গান হয় না, সেই সময় তাদের অনেকেই ক্ষেতমজুর, রিক্সাচালক, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করতে হয়। তবে বর্তমানে বেকারত্বের কারণে বা আলকাপ গান একেবারে পেশাদারী ও বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকে ঝুঁকে পড়ায় কিছু কিছু শিক্ষিত যুবক আলকাপ বা পঞ্চরসে আসছেন। এমনকি সাধারণ অভিনেতা হিসাবে আলকাপ অধ্যুষিত এলাকার

বাইরের শিক্ষিত যুবকরাও দলে আসছেন। কিন্তু আলকাপের অঞ্চলের যে নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে, তাঁরা সেই ভাষার সংলাপ না বলে মান্য কথ্য-ভাষায় সংলাপ বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলকাপের কাপে বা পালায় লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কোন সংলাপ থাকে না। তাৎক্ষণিকভাবে চরিত্র ও ঘটনা অনুযায়ী সংলাপ শিল্পীকে তৈরি করে নিতে হয়।

আলকাপের দর্শক বা শ্রোতারাও শিল্পীদের মতই আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। আগে যখন আলকাপ গান 'জুয়া'র আসরের উপর নির্ভরশীল ছিল, তখন আলকাপের আসর বসত লোকালয় থেকে একটু দূরে—মাঠে বা বাগানে। সেখানে শিক্ষিত বা একটু উঁচু তলার মানুষেরা যেতেন না, আলকাপ গান সম্পর্কে তাঁদের মনে একটা বিরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে আলকাপ বা পঞ্চরসে বেশ কিছু জায়গায় প্রবেশপত্র চালু হওয়ায় আলকাপের আসর গ্রামের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য অংশের শিক্ষিত ও বিত্তশালী মানুষের পাশাপাশি মহিলারাও শ্রোতা হিসাবে আসছেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ :

বোনাকানার সময়ে আলকাপ গানের শিল্পীদের বিশেষ কোনো পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। তাঁর সাধারণ পোশাকেই বিভিন্ন চরিত্রকে রূপায়িত করে গেছেন। বড়জোর যিনি রাজা বা জমিদার চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন তাঁদের ধুতি-পাঞ্জাবী বা প্যান্ট-শার্টটা একটু ভালো হলেই চলতো। কিন্তু ঝাঁকসুর সময়ের পর থেকে আলকাপ গানে পেশাদারিত্ব বা বিনিয়োগের ব্যাপার কিছুটা গুরুত্ব পাওয়ায়—চরিত্রানুযায়ী কিছু কিছু জরির পোশাক, ঢাল-তলোয়ার, মুখোশ ইত্যাদিরও ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাধারণ গ্রাম্য চেহারাকে আরো সুন্দর, আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আজকাল দামী-দামী সাজ-সজ্জার উপকরণ আসতে আরম্ভ করেছে।

বাদ্যযন্ত্র ও অনুষঙ্গ :

বোনাকানার সময়ে শোনা যায় হাঁড়ি বা থালা-বাসনের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রের কাজ চলতো। পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে করতাল, ঢোল, তবলা, বাঁয়া, হারমোনিয়াম, কনসার্ট, ফুলোট বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে কিছু কিছু দলে ইলেকট্রিক গীটার বা আরো আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মঞ্চ বা আসরেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ফাঁকা মাঠে বা বাগানের মধ্যে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে আসর করা হত, মাথার উপরে থাকত খড় বা

পাটকাঠির সামান্য ছাউনি। হ্যাজাকের আলো হলেই চলত। আসরে মাইকের ব্যবহার শিল্পীদের অক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। বর্তমানে লোকালয়ের মধ্যে চারিদিক ঘিরে রীতিমতো প্যান্ডেল করে, আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করে মাইক লাগিয়ে আলকাপ বা পঞ্চরসের অভিনয় হচ্ছে। এমনকি স্পট লাইটেরও ব্যবহার কোনো কোনো দলে দেখা যাচ্ছে।

আলকাপের বিষয় :

আলকাপের বিষয় ও আঙ্গিকের বিকাশ-বিস্তার-রূপান্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আলকাপের বিকাশ পর্ব বোনাকানা থেকে শুরু করে ঝাঁকসুর পূর্ব সময় পর্যন্ত। সেই সময়ে আলকাপের একমাত্র আঙ্গিক ছিল 'কাপ' বা 'নক্সা'। তখন বোনাকানার পালার বিষয় পারিবারিক বিরোধ, দুই সতীনের ঝগড়া, কোনো বিশেষ মুদ্রাদোষ বা বাতিক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। কাপগুলিতে কখনও কখনও উচ্চ-নীচ উভয় সম্প্রদায়ের উপস্থাপনার মাধ্যমে নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে লোকশিল্পীরা তাঁদের ইচ্ছাপূরণ বা সামাজিক ন্যায়-বিচারের আকাঙ্ক্ষা করতেন। পরবর্তীকালে ঝাঁকসুর সময় থেকে আলকাপের নানা দিক দিয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রতিভাধর ওস্তাদ ঝাঁকসু আসর বন্দনা, বৈঠকী গান, ছড়াগান, কাপ, পালা ইত্যাদি পাঁচটি আঙ্গিক নিয়ে আলকাপকে পঞ্চরসে পরিবর্তিত করেন। 'আসর বন্দনা' অংশে সরস্বতী-কালী প্রমুখ দেবতার বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদের বন্দনা বা দেশবন্দনাও শুরু হয়। আলকাপের মধ্যে বৃষ্টি বন্যা, খরা, অধ্যাত্মভাব ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছড়াগান রচিত হয়। 'বৈঠকী গান' অংশে দর্শনদের গীতিরসের পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য হিন্দী-বাঙলা ছায়াছবির গানের সঙ্গে লোকগীতিও গীত হয়। 'কাপ' অংশটি ছোট হয়ে গিয়ে একেবারে হাল্কা চটুল বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। তার 'আল' বা 'বিদ্ধ করার' বা সচেতন করার ভূমিকা প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে।

আলকাপের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে যাত্রার মতো পালাভিনয়গুলি। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে সুন্দর আলকাপ পালা রচিত হতে দেখা যায়। ঝাঁকসুর সময়ে এই 'পঞ্চরস' যাত্রা শুরু করে উক্ত পঞ্চ-আঙ্গিক নিয়েই। ৭ বা ৮-এর দশক পর্যন্ত এর প্রভাব চলতে থাকে। বর্তমানে আলকাপের পঞ্চরস নাম থাকলেও মূল পালাটিকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকে প্রায়

সব দলই। আবার এমন কিছু দল আছে যারা 'পঞ্চরস অপেরা' নাম দিয়ে চিৎপুরের যাত্রা দলের মতো পালাভিনয় করে চলেছেন। যেমন—জয়রাণী অপেরা, সুমিত্রা পঞ্চরস অপেরা ইত্যাদি। এইসব দল আলকাপের ঐতিহ্য থেকে সরে এসে হাল্কা মনোরঞ্জনের দিকেই বেশি নজর দিচ্ছে। ফলত বর্তমান আলকাপ পালাগুলিতে আধুনিক যাত্রাপালারই অন্ধ অনুকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে আলকাপের ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু শিল্পীরা নিরুপায়, অসহায়।

বর্তমানে 'আলকাপ পঞ্চরস', 'আলকাপ পঞ্চরস অপেরা', 'পঞ্চরস অপেরা'—মোটামুটিভাবে এই তিনটি নাম নিয়েই আলকাপ দলগুলি কোনক্রমে টিঁকে আছে। সিনেমা, টিভি, ভিডিও, যাত্রা ইত্যাদি অবসর বিনোদন মাধ্যমগুলির সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে গিয়ে আলকাপ তার ঐতিহ্য বা ধারাবাহিকতা থেকে অনেক দূর সরে এসেছে। তার গায়ে ব্যবসায়িক সাফল্যের অবাঞ্ছিত ক্লেদ জমতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সবের মধ্যেও কিছু কিছু দল বা ওস্তাদ [খলিফা] আলকাপের 'কাপ' অংশটুকুকে এখনও ধরে রেখেছেন। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতিবোধ বাড়িয়ে তোলা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফল ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেও পালা, কাপ, ছড়া রচনা করে চলেছেন। যাঁরা আলকাপের এই ঐতিহ্য অনেক কষ্টে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে নবেদ আলী, করুণাকান্ত হাজরা, ফুলচাঁদ, শ্যামচাঁদ প্রমুখের নাম করা যায়।

সংক্ষিপ্ত উদাহরণ :

আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের আলকাপ পালা ও গানের উদাহরণ দেবো। পালাগুলি আকারে বেশ বড় তাই তার থেকে দেওয়া উদাহরণ হবে সংক্ষিপ্ত। এ-ছাড়াও ডুয়েট, বন্দনা, কাপ ইত্যাদিরও কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হবে।

প্রথমে একটি আসর বন্দনার কাপ [একে গানও বলা যায়] :

'মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোরো না,
ও মায়ের দুটি চরণ বিনে আমার মন
অন্য কারেও আর জানে না।
মাগো আনন্দময়ী... ... ... ॥ ধ্রু ॥

ভবানী বলিয়া যবে যাবো চলে

মনে ছিল এই কামনা।
মাগো অকূল পাথারে ভাসাবি আমারে
দুঃখ রাশি মোর গেল না।
মাগো আনন্দময়ী ... ... ॥ ধ্রু ॥

এরপরে দুটি বৈঠকী গানের উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. তোমার মুখের হাসি বড় ভালোবাসি
বদন তোল কথা বলো ওগো প্রিয়সী।
কেন কর মান ওগো বিধুমুখী
তোমার লাগি আমি যোগী সেজেছি।
তোমার মুখের....ভালোবাসি ॥
তোমায় করব বলে খুশি
রঙিন মাথার ফিতে এনেছি।
তোমায় মুখের হাসি . ভালোবাসি।

২. বারেক বদন তোল কথা বল ওগো বিনোদিনী
তুমি কিসের তরে করেছ মান বল বল শুনি।
তোমার লাগি যত করেছি আছে তোমার মনে
বৃন্দাবনে হেরি আয়ানে ধরেছিল নাম আমি কুণ্ডলিনী
বারেক বদন তোল...বিনোদিনী
নারীর রূপে কেমন নাই হে দয়া
নারী যে বড়ই পাষাণী
বারেক বদন তোল...বিনোদিনী।
মেলহে নয়ন বলহ বসে
শুন শুন ও মানিনী
বারেক বদন তোল...বিনোদিনী ॥

এর পর উদ্ধৃত হবে 'কাপছড়া গান' :

১. *আলকাপের সৃষ্টি সম্পর্কে ছড়াগান :*

তবে শুনুন শুনুন শুনুন সবে শুনুন দিয়া মন,
পঞ্চরসের কিছু কথা করে যাই বর্ণন ॥

আলকাপেরই সৃষ্টিকর্তা বোনাকানা নাম
তার মোনা কয়সা ধাম।
আগেব কালে বাঁশতলাতে হতো এসব গান
এলো ঝাঁকসু সরকার
কি চমৎকার দেশে পেল সুনাম
তার চরণে পঞ্চরসের সকলেরই প্রণাম ॥
প্রণাম কেন হলো?
বলতে হলো আমায় বিস্তার করে
মুর্শিদাবাদেব পঞ্চবসে গান
পৌঁছে দিল ঘবে ঘরে।
তিনি এই সভ্যতা জ্ঞানের কথা দিলেন সবাব কানে
আলকাপ থেকে উন্নতি করে
প্রচার করলে পঞ্চরস নামে।—

২. *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিষযক ছড়া :*

আমরা ভাই হিন্দু-মুসলমান
এক মাটিতে বাস করি, একই সুরে গাই গান
আমরা হিন্দু-মুসলমান।
হিন্দু যারে জল বলে মুসলমান কয় পানি,
হিন্দু যারে দিদিমা বলে মুসলমান বলে নানি।
হিন্দু যারে লবণ বলে মুসলমানে কয় নূন।
হিন্দু যাবে রক্ত বলে মুসলমানে কয় খুন।
একই রক্ত একই মাংস একই ফল জল
তবে কেন ভায়ে হবে রে কন্দল॥

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজকাল আলকাপে পালাগান যাত্রার মতো করে গান ও সংলাপের মাধ্যমে অভিনীত হয়। এগুলি আকারে দীর্ঘ। এখানে খণ্ডাংশমাত্র উদাহৃত হল।

জামাই আনার কাপ :

স্ত্রী : জামাই আশা করি আমি মনেতে
যাওনা হে নাথ জামাই আনিতে।
জামাই না আনিলে পরে

রইব না তোমার ঘরে
লোকেতে নিন্দা করিছে।

স্বামী : জামাই আনাব কি গুণ আছে বলি তোমারে
প্রেয়সি তুমি বুঝিবে পরে।
তোমার কথা শুনে ভাবনা হচ্ছে মনে
এক দানাও নেই যে আমার ঘরে।

[এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে প্রচণ্ড বচসা।]

স্ত্রী তোর কথা শুনে মোর গায়ে এলো জ্বর
তোর মুখেতে আগুন দিয়ে যাব বাপের ঘর।
তুমি মরা পাজি ফাঁকি দিচ্ছ রোজই
মন টিকলো না তো বাড়িতে
জামাই আনা আশা করি মনেতে।
মরা রব না রব না তোর ঘরে
জামাই না আনিলে পরে।

স্বামী : সুন্দরী তোমার হাতে আমি ধরি,
আমারে একা ফেলে যেও না ছাড়ি·

স্ত্রী : মরা তুমি আমার একটাও কথা শুননা.
ভালো করে বেচে খাওযাবো আমার গায়ের গয়না।

স্বামী : মাগীটে বছরকার হাল তুই তো জানিস না,
চোর ব্যাড়াইছে বাড়িতে বাড়িতে খবর তো
রাখিস না।

[শেষ অবধি স্বামী স্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে গেল। জামাই আনতে য়াই বাড়িতে গিয়ে বেয়াইকে উদ্দেশ্য করে সে গান ধরেছে।]

বেহাই আছো বাড়িতে,
জামাই এলাম নিয়ে যেতে।
জলদি করে দাও বিদায় করে,
এলাম আমি জামাই নেবার তরে।
তোমার জামাই নাইকো বাড়িতে
গিয়েছে ধানের ক্ষেতেতে,
ছেলে এখন যেতে পারে না।

ছেড়ে জমির ধানে ছেলে যাবে হে কেমনে?
জল বিনে ধান তো বাঁচে না।

মেয়েব বাবা . বেহাই তুমি আমার কথা শুননা,
জামাইকে না নিয়ে গেলে
তোমার বেহান বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।
বেহাই জামাইকে একবার পাঠাও না।

ছেলের বাবা . তুমি আমার কথা শুনো না
তোমার জামাই এখন যেতে পারে না।
একথা তুমি বেহানকে বুঝিয়ে বলো না।

[বাধ্য হয়ে জামাই ছাড়া ফিবে এল এবং স্ত্রীকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলল।]

এই কাপটি বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড়থানার ইলামী গ্রামের আলকাপ শিল্পী পঙ্কজভূষণ দাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

বর্তমানে আলকাপের 'কাপ' অংশে আগের মতো ছড়াগান বা পদ্য-সংলাপ কম। আধুনিককালের একটি কাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

দুঃখিনীর কাপ :

দুঃখিনীর স্বামী মারা গেছে। বিধবা দুঃখিনীর বড় কষ্টে দিন কাটে। একদিন দুঃখিনীর বড় দাদা যায় দুঃখিনীকে দেখতে। দাদা বোনের রুক্ষকেশ ও ছিন্নবেশ দেখে বড় কষ্ট পায় এবং বোনকে বাড়ি নিয়ে আসে। ননদকে দেখে বৌদির মনে মনে ভীষণ রাগ। একদিন দাদার অনুপস্থিতিতে চরম ক্ষুধার্ত দুঃখিনী বৌদির কাছে খেতে চাইলে বৌদি ননদকে চরম অপমানিত করে।

বৌদি : তুই কি বাড়ি থ্যাকা খ্যাই খ্যাই কর‍্যা অ্যাসাছিস? শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী সবাইকে খ্যায়্যাও তোর প্যাট ভরেনি। আমাকেও খ্যাইতে এস্যাছিস? আবার যদি খ্যাবার চ্যাহাছিস তো ঝাঁটা ম্যার‍্যা মুখ ভ্যাঙা দিব।

একথা শুনে দুঃখিনীর বড় রাগ হয় ও বৌদির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। ঝগড়া হতে হতে বৌদি ননদকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পথে যেতে যেতে দুঃখিনীর সঙ্গে দাদার দেখা হয়ে যায় এবং সে সব কথা দাদাকে খুলে বলে। দাদা কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বোনকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

বাড়ি গিয়ে দাদা তার বৌকে বোনের খবর জানতে চায়। বৌ তার স্বামীকে মিথ্যা কথা বলে ননদের নামে অপবাদ দেয়।

বৌ : তোমার বহিনকে বললাম আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দাও আর তাতে তোমার বোনের খুব রাগ হয়ে গেল। সে রাগ করে বাড়ি চলে গেছে।

স্বামী বৌকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এক পরিকল্পনা করে।

স্বামী : হাটে শুনলাম তোমাদের সব ঘর বাড়ি পুড়ে গেছে। তোমাদের কিছুই নেই। সবাই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে। যদি কিছু চাল ডাল টাকা পয়সা থাকে তো দাও আমি তোমাদের বাড়িতে দিয়ে আসি।

বৌ শুনে কাঁদতে লাগল। তারপর খুদের হাঁড়ির ভেতরে টাকা পয়সা ভরে সেই হাঁড়িটা তার বাপের বাড়িতে দিয়ে আসতে বলল। তার স্বামী সেই খুদের হাঁড়ি শ্বশুরবাড়িতে না নিয়ে গিয়ে চলল বোন দুঃখিনীর বাড়িতে।

দাদা : দুখিনী! দুখিনী! বাড়িতে আছিস?

বোন : কে দাদা? এসো এসো।

দাদা : তোর জন্য কিছু খুদ নিয়ে এসেছি।

বোন : সে কি দাদা! আমি তো খুদের ভাত রোজ খাচ্ছি! তুমি আমার জন্য কিছু চাল আনতে পারনি?

দাদা : আরে বোন এটুকুই নিয়ে এসেছি অনেক বুদ্ধি করে। তুই ঘরে রেখে দে।

ঘরে খুদ রাখতে গিয়ে খুদের ভিতর অনেক কাঁচা টাকা [মুদ্রা] দেখে বোন অবাক হয়ে দাদাকে বলছে।

বোন : দাদা দেখ দেখ খুদের ভিতর কত কাঁচা টাকা।
[দাদা দেখে অবাক]

দাদা : বোন তোর ভাগ্য ভাল, এই টাকা তোর ভাগ্যে রয়েছে, তাই তোর ঘরে এনে দিলাম। তুই তোর ভাঙা ঘর ভেঙে নতুন করে কর। আর ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া কর।

দাদা বাড়ি ফিরে এল।

স্বামী : তোমাদের ঘর পুড়ার খবরটা মিথ্যা।

বৌ : তুমি জানলে কি করে?

স্বামী তোমার জেঠতুতো ভাই নির্মলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তার কাছে জানতে চাইতেই, সে বলল গুজব! তাই আর যায়নি।

বৌ আমার খুদের হাঁড়ি কি হল!

স্বামী : আবার কষ্ট করে খুদ গিয়ে দিয়ে আসবে। তাই দুঃখিনীকেই দিয়ে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে আবার খুদ দিলে লোকেই কি বলবে?

একথা শুনে বৌয়ের ভীষণ রাগ। সে মনে মনে দুঃখিনীকে শাস্তি দেবার পরিকল্পনা করতে থাকে।

বৌ : জান আমি আজ ভীষণ খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তোমাকে-আমাকে যম তাড়া করছে। ঠাকুরমশাই বলেছেন 'ননদ ব্রত' করতে হবে। তুমি দুঃখিনীকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

স্বামী : 'লক্ষ্মী ব্রত' 'ভাদুলি ব্রত' 'মনসা ব্রত' এসব শুনেছি 'ননদ ব্রত' করতে হয় এমন তো শুনিনি!

বৌ : তোমাকে এত জানতে হবে না, তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে এস, না হলে আমরা মারা যাবো।

তার স্বামী বুঝতে পারলো এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য আছে। বোনকে শাস্তি দেবার জন্যই তো বৌ এরকম ছক কষেছে। সেও আর কম যায় কিসে! সে চলল তার শাশুড়িকে আনতে।

জামাই : মা আমাদের বড় বিপদ হয়েছে, আপনার মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে—আমরা দুজনেই মারা যাবো তাড়াতাড়ি। ঠাকুর বিধান দিয়েছে শাশুড়িব্রত করার। আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। একাদশী পার হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

শাশুড়ি . সে কি বাবা! এমন দুঃস্বপ্ন! তোমরা দুজনেই মারা যাবে।

জামাই . হ্যাঁ আপনি তাড়াতাড়ি চলুন, দেরি করলে আর খেয়া পাবো না, আমরা দুজনেই মরে যাবো!

শাশুড়ি : দাঁড়াও বাবা, আমি দু-এক খানা কাপড় নিয়ে নি।
[এই বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।]

জামাই : মা, ঠাকুর বিধান দিয়েছেন আপনাকে ঘোমটা দিয়ে যেতে হবে এবং মুখে কোন শব্দ করা চলবে না। শব্দ করলেই পূজা নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা দুজনেই মারা যাবো!

শাশুড়ি . ঠিক আছে বাবা! তোমরা মারা যাবে আর আমি এ-টুকু করতে পারবো না। ঠিক পারবো! তুমি যা বলেছ সেই মতই করব।

জামাই-শাশুড়ি বাড়ি পৌঁছে গেল। শাশুড়িকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে জামাই বেরিয়ে এল।

এবার বৌকে বলছে—আমি দুঃখিনীকে নিয়ে এসেছি। বল আর কি করতে হবে?

স্ত্রী : পুজোতে তো ঢাকী ঢুলি লাগবে তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এসো।

স্বামী ঢাকী ঢুলি ডাকতে গেল, আর এদিকে বৌ বেশ শক্ত করে একখানা ঝাঁটা বাঁধলো এবং উঠোনের মাঝখানে তাড়াতাড়ি গোল করে একটা জায়গায় আলপনা কাটলো।

ঢাকী ঢুলি হাজির। দুখিনীর দাদা কাঁসর ঘন্টা নিজেই হাতে তুলে নিল! দুখিনীকে মনে করে বৌ তার মাকে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এসে একটা পিড়ির উপর উত্তর দিকে মুখ করে বসতে বলল।

তারপর মুখে বিড় বিড় করে কি বলে আর মাঝে মাঝে ননদ ভেবে তার মায়ের উপর জোরে জোরে ঝাঁটা পেটা শুরু করে। শাশুড়িও জামাই-মেয়ে মারা যাবে ভেবে মুখে কিছু বলে না, সব পিটুনি মুখ ঢেকে সহ্য করে। কিন্তু যখন তার সহ্যের সীমা ছড়িয়ে গেল তখন মুখের কাপড় ফেলে দিয়ে চিৎকার শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে বৌ মা মা—বলে কাঁদতে শুরু করে। তারপর শাশুড়ি জামাইকে ডাকে, জামাই সব কথা শাশুড়িকে বলে। শাশুড়ি সব কিছু শোনার পর বুঝতে পারে এটা তার মেয়ের শয়তানী বুদ্ধি। তখন শাশুড়ি তার মেয়েকে ভালোভাবে চলার পরামর্শ দেয় এবং ননদকে নিয়ে আসতে বলে। কাপটি এখানেই শেষ হয়ে যায়।



গ্রামীণ লোকনাটক : বিষহরা বা বিষহরী পালা

দিগ্বিজয় দে সরকার

'যে জন পাতিবে ঘট আমার পূজার।
ধনে জনে পূর্ণ হবে তাহার সংসার।।
সংসারের যত বিঘ্ন দিম্ দূর করি
সেই বাদে ধরিনু নাম আমি বিষহরী।।'

কোচবিহারের লোকনাটকের দুটি ধারা—কুশান [কুষাণ] ও দোত্‌রা। দোত্‌রা গানের বিষয়বস্তু ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক কাহিনী। এইসব পালায় অলৌকিক বিশ্বাস অবশ্যই স্থান পায়। পালাগুলো লোককথা-কাহিনী, প্রবাদ বা কোনো সাধারণ কেচ্ছা-কাহিনীকে নিয়ে আবর্তিত হয়। পালা হতে পারে—'রূপধন কন্যা', 'করিম বাদশা', 'গুঞ্জবা বিবি', 'দুবুলাবালী' ইত্যাদি। দোত্‌রা পালায় মূলের হাতে থাকে দোত্‌রা। মুখ্য কাহিনীকে সেই-ই টেনে নিয়ে যায়। ছোক্‌রাদের নাচ [ছেলেরা মেয়ে সেজে] অবশ্য থাকে।

কুশানে [কুষাণ] রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ আশ্রিত কাহিনী থাকে। অনেকটা জলপাইগুড়ির 'মান পাঁচালের' মতো। পালা হতে পারে 'লবকুশ', 'দানী রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'বেহুলা ভাসান', রাবণ পালা' ইত্যাদি। কুশানে মূলের হাতে অবশ্যই থাকে 'বেনা' [বীণা < বেনা]। মূল গায়ক পালা গেয়ে যান, দোয়ারী হাসায় কাঁদায়, নয়ন জলে ভাসায়। ছোক্‌রাদের নাচ চলতে থাকে। আগে এসব পালায় চরিত্রাভিনেতা থাকতো না। এখন চরিত্র আসরে নামে। মেয়েরাই ছোক্‌রাদের নাচ নেচে যায় অক্লান্তভাবে। এই হচ্ছে ছোট্ট কথায় কোচবিহারের গ্রামীণ নাটকের জগৎ।

তবে কুষাণে [কুশান] পালার সঙ্গে 'বিষহরা' পালার একটা সম্পর্ক আছে। 'বিষহরা' বা 'বিষহরী' পালা কুশানের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পালা। মনে করবার কারণ আছে আগে কোনো এক সময়ে বিষহরী পালার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গে মনসার পূজার ব্যাপকতার সঙ্গে মনসামঙ্গলের স্বতন্ত্র ধারাটি এখনো সজীব বিষয়। লোকজীবনের সেই স্তরে 'বিষহরা' প্রবল দাপটে চলেছিল। এখনো বিষহরা গানের সুর ও অভিনয়রীতি খানিকটা নিজস্বতা বজায় রেখেছে। স্মরণযোগ্য

বিষহরা পালার মূলেরা নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে এই গান পরিবেশন করতেন।

আজ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছব আগেও 'বিষহরা' পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এর নাচ দেখে কখনো কখনো মতো হত এখনই সাপ এসে আছড়ে পড়বে আসরে। বেহুলার পতিহারা কান্নায় পাষাণ গলে যেত। অভিনয় বলতে তখন 'মূল' [মূল গায়ক] আর দোযারী। চাবদিকে উৎসুক দর্শকে-ঘেরা নাট্যাঙ্গন।

শুধু কোচবিহারে নয় বিষহরা পালাব সাম্রাজ্য উত্তরবঙ্গের সবকয়টি জেলায়। কোচবিহার-জলপাইগুড়ি অবশ্য এই লোকনাটকের সমৃদ্ধ অঞ্চল।

বিষহবা পালা বছরের যে-কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হয। 'বিষহবা' কেন বিষহবা বা বিষহরী শুরুতেই সে কৈফিয়ৎ মা পদ্মার জবানীতে জানা গেছে। পালাগানের সুসময় শীতকাল, [বর্ষণ বাদে] অন্য সময়ও হয়। বাজবংশী সমাজে কোথাও কোথাও এখনো এমনটা প্রচলন আছে যে, বিয়ের পূর্বে এই গানের আসব বসানো হয়। যাকে ধর্মীয় সংস্কার [Ritual] বলে সেই ভাবটা এখন ক্ষীণ। মনসার কাহিনীতে প্রাধান্য পায় সতী বেহুলার কথা। এই পালা তাই 'সতী বেহুলা' নামেও চলে। মূলত বেহুলার সতীত্ব ও ত্যাগের মহিমা এবং নর ও দেবতার দ্বন্দ্ব এই পালার প্রধান আকর্ষণ। এরই সঙ্গে আছে লোকনাটকের লৌকিক আঙ্গিক-লোকাচার-লোকমানস-লোকভাষা।

কোচবিহারে এই পালায় স্থানীয় ভাষার ব্যবহার প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য এখন এই পালার ভাষা মিশ্র। স্থান ও আসর অনুসারে, এমনকি, মূলের অভিপ্রায় ও যোগ্যতা অনুসারে পালার ভাষাভঙ্গি, কথোপকথন ঠিক হয়ে থাকে। এখন এতে চরিত্রাভিনেতা এসেছে, যা আগে ছিল না। এ পালা আগে ছিল মূলত 'গীত-মনসামঙ্গল'। পরে আসে নাচ ও দোয়ারী। তারও পরে চরিত্রাভিনেতা।

বিষহরা গানের অভিনয়রীতি, গায়কী ও নৃত্যভঙ্গী এখন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত। প্রতিভাবান মূল. দোয়ারী ও ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন ছাড়াই চলছে বিষহরা—সাধারণত কুশান [কুষাণ] নাটকের ধারায়।

সংযোজন :

'সমগ্র শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া বিশেষত শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মনসার মাহাত্ম্যসূচক যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই কোচবিহার অঞ্চলে

বিষহরীর গান বলে, পূর্ববঙ্গে তাহা বিষহরীর গান বলিয়াই পরিচিত। ইহা চাঁদসদাগর ও বেহুলার কাহিনীমূলক রচনা। পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল বিষহরীর গানের সাধু রূপ।

বিবরণটি উল্লেখযোগ্য : 'বিষহরীর গানের দলেও মূল গায়েন [এঁকে 'মূল' বলে] এবং দোয়ারী থাকে। এই গানের কতকগুলি বিশিষ্টতা রয়েছে। যেমন মূলের হাতে থাকে চণ্ডোর অর্থাৎ চামর। এ-ছাড়া থাকে দু-জন খোলবাদক, দু-জন খাপিবাদক এবং দু-জন বংশীবাদক। এই বংশী বা বাঁশী—গানের শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানা সাপ খেলানো সুরের সংস্কার মনে করিয়ে দেয়, এমনভাবে বাজিয়ে চলে। এই গানে মনসার বিভিন্ন পালা নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তিতে গাওয়া হয়, ['বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর', ড আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত; পৃ. ১৪৬১]।

এইসঙ্গে একটি 'বিষহরা বা সতী বেহুলা' পালা উদ্ধৃত করা গেল।

বিষহরা বা সতী বেহুলা পালা

প্রথম দৃশ্য

[চাঁদসওদাগরের গৃহে প্রবেশ]

চাঁদ : শয়তানী পদ্মাবতী কত হানি করে,
ধনে-জনে চৌদ্দডিঙ্গা ডুবাইছে সাগরে।
একে একে করিছে মোর ছয় পুত্র নাশ,
বিদুয়ার[১] কান্দনে কষ্ট বাড়িতে করা বাস।
সোনেকা সতীরে মোর কত কষ্ট সয়।
মুখখানা দেখিলে হায় বুক ফাটি যায়।
বাড়ি হইল ছানুয়া মোর নারী হইল বোবা,
আন্দারে ডুবিয়া খাইছে মোর সর্ব শোভা॥

পদ্মা : শোন, শোনেক চাঁদ, এলাও কং মোর পূজা কর।
ধনে-জনে ভরিয়া উঠবে তোর সব ঘর।

চাঁদ : কায়? কায়? কানী? এলাও আশা মোর পূজার
বাঙ্গে! মুই চাঁদ শিবের বেটা ঠোক্‌ঠোকে[২]র না পার।
শেয্যায় লখাই মোর তারও যদি হয় হানি
তবু না পুজিম তোক ব্যাঙ্ খাওয়া কানী

[সোনেকার প্রবেশ]

সোনেকা : কুড়িয়া ঘোড়ার দপাদপি সার। একে একে মরিল মোর ছয় বেটা। শোকে মুই পাতর। তোমার জন্য মোর এই দশা। সংসার ছারেখারে গেইল। ওমরায় হইল দেব-দেবী। মানুষ হয়া বিবাদ করা ভালো নোয়ায়। লখিন্দরকে বিয়া দিয়া মোক শান্তি দেও।

চাঁদ : সোনেকা না কইস মোক এমন কতা তুই। এই মাসত বিয়া দিম্ লখাইর। কানী যদি দেবী হয় ব্যাঙ্ খায় কেনে উয়ায়?

পালাটী জারুয়া ছাওয়া
দেখা পাইলে দিম্ ধাওয়া
উয়াক করে না ভয় চাঁদ।
আছে হেমতালের নাটী
উড়িয়া দিম দাঁতে পাটি
ঘুঘু দেখাইলে মুই দেখাইম ফাঁদ।
বালা লখিন্দরের বিয়াও এই মাসত্ দিম
এই মোর মনত্ আছে আশা।
বান্দিয়া লোহার ঘর তাতে রাখিম কইনা-বর
কানীর মুখত দিম চুণ কালি।
দুরন্ত হেমতাল নিয়া নিজে রমু মুই জানিয়া
দিম পাহারা সারারাতি।
ধন্নন্তরী থাকিবে সাথে ফাঁক না রাখিম কোনটাতে
যা সোনেকা জ্বালাও চাইলেন বাতি ॥

সোনেক : সদাগর তোমার হৃদয় পাষাণ। ছয় ছয়টা শোকের দগদগা আগুন কেমন করিয়া নিয়া বেরাং তা জানেন। কোলমোছা ছাওয়া লখিন্দর নিয়া আর খেলা খেলেন না দোহাই তোমার।

চাঁদ : সোনেকা, সতী যদি হইস তুই মোর বচন ধর
আশীর্বাদে বুকত্ পাষাণ খানি ধর।
কানীর কোপে গেইছে মোর ছয়খান পঞ্জর
লখাই বাদে বান্দিম মুই লোহার বাসর ঘর।
সাগাই-সোদর তুই কর ডাকাডাকি
কইন্না জুড়িবার বান্দে করিম পাকাপাকি।

সোনেকা · মা ভবানী, তোর মন্ত্ কি আচে তুই জানিস। তুইও সতী মাও, মুইও সতী। পতির আদেশ না শুনি মাও তুই দুঃখ পাচিস। দক্ষরাজের যজ্ঞের কথাখান মিথ্যা নোয়ায়। পতির বচন ধরি মোর পোড়া বুকখান বান্দিনু। শেষমেষ তোর হাতত্।

[পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা · এলাও মোর কথা ধর নির্বুদ্ধি চাঁদ। ছয় পুত্র পাবু আর পাবু চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন। না শুনিলি মোর কথা মরিবে লখাই, নাই খণ্ডন।

চাঁদ : হাঃ-হাঃ-হাঃ
কি কলু কি কলু ব্যাঙ্ খাওয়া কানী
খাড়াও পূজা দ্যাং।
আনতো হেন্তাল নাটী
ভাংগং কানীর ঠ্যাং।
একে একে করলু মোব ছয় পুত্র নাশ
নিও ডারু ভাঙিয়া তোর মিটাইম মনে আশ।

পদ্মা : শোনেক দর্পী চাঁদ পদ্মাব কথা শোন,
হাসিয়া উড়াইম তোর লোহার ভবন।
বাসরে ঠোকাই খাইম লখাইর প্রাণ
সেথায় দেখিব তোয় হেন্তাল খান।

[পদ্মার হাসি ও প্রস্থান।]

[হেমতালের লাঠি নিয়া চাকর লেংয়ার প্রবেশ]

লংয়া : নিলাজের নাককাটী ড্যাংরা[৪] দেয় নিলজ্জা কয় মোর বিয়াও। ওমরা হইল দেব-দেবী। উমার সঙ্গে বিবাদ। সদাগর কোন্টে গেইল তোমার কানী। নেও তোমার হেমতাল খান, দেও উমার ধুরধুরি তুলিয়া।

চাঁদ : ভয় পাচে মোর পদ্মা বিষহরী
সনেকা কয় উযাক পূজা করি।
মুখভরা বিষ যার কুটিল চলন
তার চরণ ধরিতে পারি শিবের নন্দন!

লেংয়া : সে কথাতো হয়। যার ঠ্যাং নাই তার কোন ঠ্যাংটা ধরিবেন বাহে। ধরিবার নাগে উয়ার নেটু[৫]। বাপ্‌রে কায় উয়ার নেটু ধরিবে।

চাঁদ . শোন লেংয়া যাব আমি কইন্‌না জুড়িবার
সত্বর করেক তুই জোগার তাহার।

লেংয়া : তোমরা বা কেমন কইন্‌না চান? খাটো না ঢাঙ্গা? না ফরফরি? আগোত্‌ মোক বাতান। তাবপর মুই জোগার করোং।

চাঁদ · যে কইনা রান্ধিতে পারে লোহার কালাই
শোনেক লেংয়া মুই সেই কইন্‌না চাই।

লেংয়া : ওরে বাপ, তোমার সেনে কথা। আইজ-কাইলকার ডাইল-ই গলে না। আর লোহার কালাই। হ্যাঁ, সদাগর একনা কথা কই তোমাক। সেদিন উজানী নগরে গেইচং। সেইটে মোর একে না সম্বন্ধি ভাই আচে। উয়ার নাম ঠেংযা। আলাপে সালাপে মুই কনু আমার ইত্তি খেসারী-মুসুরী কোনো ডাইল গলে না। ভাত করে কারাং কারাং। কনটোলেব জিনিস তো। উয়ায় মোক কইল সাহো বানিয়ার বেটি রান্ধিলে পাথব লোহা সউগুলা জল হযা যায়। তা সদাগর ঐ কইন্‌নার খোঁজ নিলি হয় না? তোমার বাড়িত্‌ সাত গীত্তানী সাত কিলিংকাবী[৬]। মোর দাঁতও ভাঙ্গিছে, পেটেরো বিষ ধরিছে। দেখেন না তোমরা মোর দাঁতগুলা নটর-চটর করি ধচ্চে।

চাঁদ : চলেক লেংয়া উজানী নগর
ঐ কইন্‌নার সাতত্‌ বিয়া দিব মোর লখিন্দর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নদীর ঘাট : সখীসহ বেহুলা নদীর ঘাটে। নদীর ঘাটে পদ্মা গোপনে মালা জপে]

পদ্মা : মালা জপং টপর টপর, / কতক্ষণে আইসে দৈচূড়ার খবর।
নাড়িয়া বন্ধু ছাড়িয়া যায়, / মন করে মোর হায়রে হায়।

সখী : সখি, শুনলু বিদুয়ার কেমন হাউস? মালা জপে ফির আরো বন্ধুর কথা ভাবে।

বেহুলা : মোর তাতে কি? উয়ায় মালা জপে জপুক, হাম্‌রা অন্য ঘাটত্‌ যাং।

[উভয়ের অন্য ঘাটে গমন সেখানেও মালা জপে বুড়ি পদ্মা]

বেহুলা . সখি মোরা যে ঘাটত্ যাই সে ঘাটত উয়ায় জপির বইসে। এলা আমবা করি কি?

সখী : উয়ায় মালা জপে জপুক। বেলা ডুবির ধচ্ছে। চল হাম্‌রা গাও ধূই[৭]।

বেহুলা : মাও, যে ঘাটত্ হাম্‌রা যাই সেইটেই তোমরা মালা জপির বইসেন। খানেক সরি বইসো, মোরা গাও ধুই।

পদ্মা : মাও রে মাও, তুই আচ্ছা ঝগড়ী চেংড়ী[৮] তো। মুই কি গোটা ঘাটখান জুড়িয়া আছং। দূর অদি গাও ধুইস না কেনে। [বেহুলা জলে নামতেই] তোর আক্কেল কিনা কি, বামন সজ্জন মানিস না। হতলক্ষ্মী, তোর পায়ের জল পড়িল মোর অঙ্গে। বিয়ার রাইতে স্বামীক তোর খাইবে ভুজঙ্গে।

বেহুলা : তোমার পায় পবং বিদুয়া মাও, কেনে দেন মোক অভিশাপ, অবোধ বলিকা মুই। অজ্ঞানে পবিছে পানি, মাপ চাং করি দেন মাপ।

পদ্মা : মাপ করা কি মুখের কথা। যে শাপ মোর মুখত্ বিরাইচে তা আর কি সোন্দায়[৯]। তোব যেমন কর্মফল।

বেহুলা · যে হইছে সে হইছে মাও চুপ চাপ ঘরে যাও
মরিলে জিয়াই প্রাণপতি।
সতী মায়ের কইন্‌না আমি জন্মকালে দৈববাণী
বিদুয়া না হইম মুই, হইম মহাসতী ॥

পদ্মা : ইস, কি দেমাক! মুইও দেখিম তুই কেমন সতী।

[পদ্মার প্রস্থান]

[গান]

বেহুলা : আরে ও দারুণ বিধাতারে বিধাতা
হাউস না মিটিল মোর পিন্দিয়া সাওখা।
কোন বিধি ধরিয়া কলম, লিখিছেন কপালে।
মুছিলে না মোছা যায় ধোয়া না যায় জলে রে
যদি বিয়ার রাইতে স্বামী মরে, কোন নারীর পরাণে ধরে
হায় বিধাতে ভাসাইলা সাগরে ॥

[দৈববাণী]

না কান্দ না কান্দ সতী, ডুব দেও জলে;
অক্ষয় শাখা-সিন্দুর পাইবে অতলে।
এই শাখা সিন্দুর দেখি যমে পায় ডর
সতীত্ব মহিমা দিয়া ভুবন উজ্জ্বল কর।

সখী : চলেক সখী। দৈববাণী তো শুনলু। গাও ধুইয়া চলেক বাড়ি চলেক।

তৃতীয় দৃশ্য

[সাহো বানিয়ার গৃহ। লেংয়া ও চাঁদের প্রবেশ]

লেংয়া : আরো ও বানিয়া মশাই বাড়িত্ আছেন না নাই?

ঠেংয়া : তোমরা কোন্টেকার মানষি হে বাহে। আরে বইসো, বইসো ইত্তি।

লেংয়া : আরে বসি তো হয় তা বানিয়া মশাই বাড়িত আছে না নাই?

ঠেংয়া আবে ঘরোত নাই, বাড়িত আছে। ইত্তি উত্তি কোনটে বা গেইচে। খানেক বইসো, আইসে বলে।

লেংয়া : ভালো কথা, একেনা গুয়া পান আনেক, হুক্কাটো আনেক। সাথত্ সদাগর আছে। একে না বিয়র আলাপ আছে।

[ঠেংয়ার প্রস্থান]

[সাহো বানিয়ার প্রবেশ]

সাহো : আরে, সদাগর মশাই, নমস্কার! নমস্কার! গরীবের বাড়িত্ হাতির পাও। তা কি মনে কি আসিচেন? আজি থাকা খাবে। ওহো ঠেংয়া বাড়ির ভিত্রৎ খবর দে। তা কি মনে কবি?

চাঁদ : শুন শুন সাহো বানিয়া আমার বচন;
লখিন্দরের বিয়াও দিব করিয়াছি মন।
তোমার ঘরে আছে এক কইন্না গুণমণি
বেহুলা তার নাম লোক মুখে শুনি।
তোমার কাছে কইন্না তব ভিক্ষা আমি চাই
বেহুলার সাথে বিয়াও দিব দুর্লভ লখাই।

সাহো : এটা ভাগ্যের কথা। তোমরা আমার কুটুম্ব হবেন। তা তোমরা কিবা চান সেটাও তো শোনা যায়।

চাঁদ : শুন শুন সাহো বানিয়া আমার বচন।
খালি আমি ভিক্ষা চাই ঐ কইন্‌না ধন ॥
যে কইন্‌না রান্ধিয়া দিবে লোহার কালাই ॥
তার সাথে বিয়া দিব আমার লখাই ॥

সাহো : এটা বড় পরীক্ষা। মানুষ কি পারে।

লেংয়া : তোমরা ভয় না খান। উয়ায় সবই পারে। এই ধরেন লোহার কলাই। হামরা খানেক ঘুরিয়া আসি।

[চাঁদ ও লেংয়ার প্রস্থান]

[মেনকার প্রবেশ]

মেনকা : উলা কায় আসিছে। হুর মুই শুনলু...

সাহো : আরে সেই তো, কোনটা যে হয়।
চম্পক নগরে আছে চাঁদ সদাগর
মহামানী লোক কয় অতি বড় ঘর।
তিনি আসিয়াছেন পুত্রের বিবাহ কারণ
যে কন্যা গলেয়া দিবে লোহার কালাই
তাক দিয়া দিবে বিয়াও দুর্লভ লখাই।

মেনকা : সেজন্যে ভাবনা ক্যানে। মাও বিষহরির কৃপায় বেহুলার অসাধ্য কিছু নাই। আজি ঘাটৎ গাও ধুবার যায়া শাখা-সিন্দুর পাইচে। তোমরা নাগি পর। বেহুলা মাও শুনি যা, এত্তি আয় মা।

[বেহুলার প্রবেশ]

মেনকা : বেহুলা মাও মোক না করিস লাজ।
লোহার কলাই গলেয়া ফেলা সতী নারীব কাজ ॥
এই কাজ পারিবু কিনা তুই করিবার।
ডেকানু সোনার মাও তাই পুছিবার ॥

বেহুলা : বিষহরির চরণ বন্দী যে কাজ ধরিম
পিতা-মাতার আশুর্বাদ সেইটা করিম।

মেনকা : ধরেক এই লোহার কলাই। ভাল করি রান্না করিস। বিয়াই খাবে।

[সকলের প্রস্থান—ঠেংয়ার প্রবেশ]

ঠেংয়া : বাহে, হাসেন না, এলায় শোনেন বানিয়ার বৌ কি কি রান্দিছে।

[গান]

[দর্শকদের দিকে তাকিয়ে]

ডিমার[১০] তরকারী রান্দিছে চোলমানকন দিয়া।
অম্বল রান্দিয়া খুইছে শুকাতি মিশাইয়া।।
খেশারীর ডাইলৎ দিছে শুকটার[১১] ফোরান।
পায়েস রান্দিছে দিয়া করকচ লবণ।।
সরবতে মিশিয়া দিছে সিদলের[১২] রস।
বিয়াই খাইয়া কত করিবে সুযশ।।
ট্যাংয়া দৈ-এ কটকটা চুড়া।
আটিয়া কলার বিচি খাবে চাঁদবুড়া।

ঠেংয়া : তোমরা কায কায় খাবেন? হাত তোলেন বাহে। মুই ডাকেয়া নিম।

[চাঁদ ও লেংয়ার প্রবেশ]

সাহো : বুঝলেন সদাগর, মোর বেহুলা মাও না পারে এমন কাজ নাই। বইসো. গুয়া-পান[১৩] খান।

লেংয়া : সদাগর কাম লাগি গেইচে। মনের সুখে বিয়াও বাড়ির গুয়া-পান চোবের ধরো।

[ডাইলের পাত্র হাতে ঠেংয়ার প্রবেশ]

ঠেংয়া : আরে লেংয়া না, ইত্তি আয়। দেখি যাও লোহার কালাই গলিয়া ডাইল হইচে। [ডাল চাখিয়া] আঃ কি মিষ্টি রে দেখ সদাগর, দেখ। [লেংয়া চাখিয়া দেখে]

সাহো : বেহুলা রান্ধিয়া দিছে লোহার কালাই।
ঐ দেখ সদাগর, কোন চিন্তা নাই।
তোমার পুত্রের সাথে কইন্না বিয়াও দিব।
চম্পক নগরে আমি কুটুম্ব করিব।।

চাঁদ : আজি হতে মোর হইলেন বিয়াই।
তোমার কইন্না বিয়াও দিব আমার লখাই।।
প্রথম বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষ তিথি।
সপ্তমীর দিনে বিয়াও, ডাকি আনো জ্ঞাতি।।
আজিকার মত মুই ফিরিয়া যাং ঘর।
বিবাহ করিতে আসিবে বালা লক্ষিন্দর।।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[সাহো বানিয়ার বাড়ি—মেনকা ও বধূবেশে বেহুলার প্রবেশ]

বিয়ার দৃশ্য, গান ইত্যাদি

মেনকা : বেহুলা মাও আয় মোর বুকোত আয়।
বুকের ধন পরার হবু বুক যে ফাটি যায়।।
মুই মায়ে শিখাং বাচা মোর বুদ্ধি ধর।
অল্প বয়সে মাও তুই যাও পরার ঘর।।
পরভাতে মাও ছড়া দিবু সন্ধ্যায় দিবু বাতি।
শ্বশুর-শাশুড়ির পায়ে করিবু ভকতি।।
হ্যাটমুণ্ডে কথা কবু বানিয়া দুলালী।
পরার বাড়ি পরার ঘর দেখি শুনি চলেক।
আর মুই একে না কথা বাতেয়া দেই[১৪] শুনেক।।
দারু বাতেয়া দেং মাও দারুর জানং ভাও।
অন্যায় করিলে বালা না করিবু রাও।।
শনিবারে ভাঙ্গে মই তারো নাগে ডোর।
আলির কচুয়া[১৫] লাগে বিষমার পাচ খোল।।
চিলার ভাসার[১৬] কুটা লাগে, কাউয়ার ভাসার নরি।
সেই দারু মারিবার লাগে কুমারী ঝিমারী।।
শিলের উপর শিল থুইয়া দারু করবু জরতি।
শিলের উপর শিল থুইয়া দারু করবু জরতি।
সেই দারু মারিবার লাগে অমাবস্যার রাতি।।

মাও, আরো এক না কতা কং। পদ্মার সাতে সদাগরের বিবাদ। তুই চুপ কবি উয়াক পূজা করবু মাও।

[বরবেশে লখাইয়ের প্রবেশ—শাশুড়িকে প্রণাম]

লক্ষিন্দর : শাশুড়ি মাও মুই বিদায় নিয়া বাড়ি যাবার চাও। মোক হাসি মনে বিদায় দাও।

মেনকা : আজির মতো থাক জামাই যাইবেন কালি।
বেহুলা চলিয়া গেইলে মোর বুক হইবে খালি।।

লক্ষিন্দর : শাশুড়ি মাও, পদ্মার সাতে বিবাদ করে বাপ। সেইজন্য বান্দিছে লোহার বাসর। সেই ঘরে রইলে মোর নাহি ডর।

[সকলের প্রস্থান]

[সাহো বানিয়ার প্রবেশ]

সাহো : লখিন্দরের সাতে বেহুলার বিয়াও দিয়া মুই কি ভাল করলু? মাও বিষহরি ছাওয়া দুইটাক ভালকরি আখিস মাও। যাই ছাওয়া দুইটাক বিদায় দিয়া আসং। মেনকা...কোন্টে গেইচেন।

অন্য দৃশ্য

গান [মেয়েরা]

বর কইনায় বিয়াও হয়, নাকের নোলক ঢুল খেলায়।
বানিযা দুলালী আই মোর শ্বশুরবাড়ি যায় রে।

[গাটিয়ার শব্দ. লেংযার দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি]

বেহুলা : প্রভু, জোর করি পানি।
এপার ওপার দেখা না যায় এ কোন নদীখানি॥

লক্ষিন্দর: ওরে অবোধ প্রিয়া, শোন মোর বাণী
এই তো নদীর নাম হইল উজানী।
ওরে অবোধ প্রিয়া মোর,
এই নদীর ঐ পারে চম্পক নগর।
চম্পক নগরে আছে চম্পাবতী পুরী।
সেখানে থাকেন পিতা চান্দ অধিকারী॥

পঞ্চম দৃশ্য

বাসরঘর

[বেহুলা ও লক্ষিন্দরের প্রবেশ]

লক্ষিন্দর. বানাইছে পিতা মোর এই বাসরঘর
বেহুলা এখন মোর নাই কোন ডর।

বেহুলা : প্রভু, মন কেনে বা করে আংসাং
ভাল না নাগে বসের গান।
সুবন্ন প্রদীপজোড়া মনে হয় সর্পে মোড়া,
যমদূত বেড়ায় তোমাক ঘিরিয়া।

লক্ষিন্দর: অবোধ প্রিয়া মোর উলা কথা ছার।
বিধির বিধান নয় খণ্ডন যাবার॥

যা হইবে তা হইবে মোর কপালে যা লিখা।
সত্যি যদি মৃত্যু থাকে আসি দিবে দেখা ॥
কিন্তু মুই এইটা কবা পারং, এইটে মুই সর্পাঘাতে মরিম না।
বিশ্বকর্মা গড়াইছে এই লোহার বাসর।
সুই ঢুকিবার মতো ঘাটা নাই তার ॥
পাহারা দিতেছে পিতা হেমতাল হাতে।
ধন্বন্তরী জাগিযা আছে মহা ঔষধী হাতে ॥
মোব খুব ভোক ধরিছে। মোক খাবাব দেও।

বেহুলা : এইটে কোন্টে কি পাং?

লক্ষিন্দর: প্রিযা, পাতালপুরীতে আছে চাল-ডাল।
প্রদীপেব তেল আছে আগুনে দে জ্বাল ॥
খিচুরী রান্দেক প্রিয়া খাই প্রাণ ভরি।
তারপর দুইজনে রঙ্গ-রস করি ॥
প্রিয়া, মুই খানিক শুতি রই। খাবার রান্দে মোক ডাকান।

[উভয়ের প্রস্থান]

[লেংয়া ও চাঁদসদাগরের প্রবেশ—চাঁদের হাতে লাঠি]

লেংয়া : সদাগর তোমার আরু ভয়। চারিদিক পাহারা। বিশ্বকর্মা বাসর বান্দিচে। বাতাস ঢুকির ভয় খায়। তবু আপনি হেমতাল হাতে পাহারা দেন।

চাঁদ : সর্বনাশী কানীরে লেংয়া, নাই দেয় দেখা,
তাহার দংশনে মৃত্যু কপালের লেখা।
সেই লেখা মুছি দিম মুই দর্পী চাঁদ,
পদ্মার সাতে মোর তাই তো বিবাদ।

[নেপথ্যে পদ্মার হাসি]

চাঁদ : ক্যায় হাসে? ক্যায়? আয় লাগাইম পিট্টানি[১৭] [প্রস্থান]

[ভিতর হতে লক্ষিন্দরের কাতরানি]

লক্ষিন্দর : উঃ পদ্মা, তোর আক্কেল নাই। রান্দা ভাত তুই খাবের দিলু না।
বেহুলা, প্রিয়া কোন্টে[১৮] গেলা তুই। মুই আর বাচং না।
কোথা প্রিয়া কোথা তুমি বিষে দংশাইল কালফণী

হায় প্রিয়া জীবন অশেষ।
শোন না শোন তুমি বিদায় হইনু আমি
জনমের মত দেখা শেষ।

[খাবার থালা হাতে বেহুলার প্রবেশ]

বেহুলা : ওঠ, ওঠ প্রভু চম্পকের শুয়া
ওঠ প্রভু অন্ন খাও আসিয়া।

কেনে বা উত্তর নাই। যাই, যায়া দেখং কেমন নিন্দ যায়। [ঘরে গিয়া]

প্রভু, প্রভু...একি! মাও পদ্মা বাদ সাধিছে। [কান্না] হায়রে মোর পোড়া কপাল বিয়ার রাতি বিদুয়া হনু। মাও পদ্মা তোর আক্কেল নাই। মোক একি করলু। মুই সতী নারীর সতী কইন্না! হাতে মোর অক্ষয় শাখা, কপালে মোর অক্ষয় সিন্দুর। দেখং তুই তাক কেমন করি মুছিস?

[গান]

স্বামীধন, ও স্বামীধন...
না দিল বিধি এ ঘর রাখিতে রে।
এই ছিল কপালে লেখা
স্বামীর সাথে মোর না হইল দেখা রে
বিয়ার রাইতত্ হনু স্বামীহারা।
কালি পুছিবে শাশুড়ি মাও
কি দিয়া পুছিব গাও রে
ছাড়িয়া গেইলেন মোক
একেলা মন্দির ঘরে রে।। [প্রস্থান]

[চাঁদ ও লেংয়ার পাহারাদান—সোনেকার প্রবেশ]

সোনেকা : তোমরা শোনেন না ঐ খ্যাগো' ঘরত্ ক্যায় কান্দে? এইটে খাড়া হয়া কি করেন?

চাঁদ : আরে পাগলী,
ফুল্লমনে গান করে পুত্র-পুত্রবধু।
বাসর রাতি যাপন করে মনে ভরা মধু।।
সোনেকা, তুই মোর খালু কুল মান।
পুত্রের বাসর ঘরে দিস তুই কান।।
বেহুলা গলেয়া দিচে লোহার কালাই।
সেই কইন্না বিয়াও দিছং কোন শঙ্কা নাই।।

সোনেকা থাকেন তোমরা বসি। মোর মনত কয় কি বা হইচে। মুই যায়া দেখং আগৎ। [ঘরে প্রবেশ]

[বেহুলার হাত ধরিয়া সোনেকার পুনঃপ্রবেশ]

সোনেকা : সদাগর, কি দেখো চায়া
দেখ যায়া সোনার লখাই
কালনাগিনীর বিষে বাঁচে নাই।
মোর সোনাব বাছা, বাপ মোক ছাড়ি কোন্টে গেলু. ..।

[প্রস্থান]

বেহুলা : শ্বশুর বাপ স্বামীকে মোব না পোড়ান অনলে।
উয়াক ভাসেয়া দেও সাগরের জলে ॥
পতি নিয়া যাইম মুই নিজে স্বর্গপুর।
আনিম গিয়া প্রাণপতি আর ছয় ভাসুর ॥

চাঁদ : পদ্মা আজি নিলু মোর দুর্লভ লখাই,
মোর মুখত দিলু চুণ কালি ছাই।
শিরজিনু লোহার বাসর লখাইর বাদে
তবু তুই ভাঙ্গিলি ঘর।
ছয় পুত্র গেছে মোর ছয় খান পাঞ্জর।
চাঁদ সদাগর মুই শিবের নন্দন,
তবু না করিম তোর চরণ বন্দন।

[বেহুলার প্রতি]

একে একে মরিল মোর সাত ব্যাটা।
ইহাব অধিক দুঃখ কলা যদি যাবে কাটা ॥
পাতের খনে পাত বেচাই খোলের খনে খোল।
একো একো মুড়া বেচাইম ভাদব মাসের ওল ॥
লখাই মরিচে মোর দুর্লভ লখাই!
সৎকার করিতে ডাক জ্ঞাতি ভাই ॥

[চাঁদের চরণে বেহুলা]

বেহুলা : শ্বশুর বাপ, শ্বশুর বাপ না পোড়েন অনলে।
মিনতি জানাং মোক ভাসান সাগরে ॥
শ্বশুর বাপ এই নেও হাতের কঙ্কণ।
পাঁচ ঝাড় কলার মূল্য করেন গ্রহণ ॥

আজ্ঞা দেও শ্বশুর বাপ ভূড়া[১৯] বান্দিবার।
আজ্ঞা দেও যাং মুই পতি জিয়াইবার।।

চাঁদ : আন্দাব ঘুট ঘুট বিজলী গগনে গরজে দেওয়া।
এ ঘব থাকি ও ঘরৎ যাবা নাই ক্যামনে দিবু খেওয়া।।
পথে আছে নানা বিপদ, আছে দুষ্ট লোক।
কোন প্রাণে আজ্ঞা দেং মা সাগরৎ যাইতে তোক।।

বেহুলা : শ্বশুর বাপ কেনে মোক বাধা দিবাব চান।
নিচ্চয় ফিরাই আনিম পতিধনেব প্রাণ।।
অক্ষয় সিন্দুর ফোঁটা মোব এই কপালে।
পাইচং অক্ষয় শাখা সাগবের জলে।।
মোক কায বিধুয়া কবে কেমন সে দেবতা।
স্বর্গপুরে যায়া মুই পুছিম সেই যতা।।
দর্পী শ্বশুরের মুই দর্পী বধূ সতী।
দেবতাব দর্প ভাঙ্গি আনিম প্রাণেব পতি।।

চাঁদ : যাও মা, যাও লক্ষ্মী আশুর্বাদ করং।
মহাসতী হও মা, পতীক ফিরি পাও।
যারে লেংয়া খবর দে মোর নৌতুন সাগাই।
বেহুলা ভাসিবে জলে লইয়া লখাই।।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নদী-পথে বেহুলা]

[গান]

বেহুলা : ওহোরে পবন, আমি নারী
ভাসিনু সাগরের জলে বে...
আর সাগরে যেমন কুটা[২০] ভাসে
সেও কুটা কিনারে চাপে রে...
কেহ যদি মোর আপন হইত
মরা স্বামী মোর বাঁচোয় দিতরে.. পবন।

[টাংউরা মাঝি ও সংকাই সদাগরের কথা]

টাংউরা : সদাগব, এটা নিলক্ষ সাগর। এইটে ভূরাত চরি, বেটিছাওয়া ক্যায় আসিল? ওটা দেও নোয়ায় তো।

সংকাই মাঝি, তোমরা নৌকা দিয়া ভুরাটা ঠেকান, মুই পুছ করোং।
ক্যায় তুমি সুন্দর কইন্না কেন ভাস জলে?
নিলক্ষ সাগরে তুমি মরা কেন কোলে?
পরিচয় দেও মোক কিবা তব নাম?
কোন কূলে জন্ম আর কোন দেশে ধাম?

[গান]

বেহুলা · দূরে বাখ সাধু নৌকার মেলা
টলমল করে মোর কলার ভেলা
স্বামী মোর পড়িবেন জলে রে ॥
উজানী নগরে ঘর বাপ সাহো সদাগব
মার নাম মেনকা কয় সকলে
ছিল মোর এক ভাই নাম তার সংকাই
চার বছর হইল দেশান্তরী রে ॥
মানী চাঁদ সদাগর তার পুত্র লক্ষিন্দর
তার সাতে বিবাহ যে করি।
স্বামী মোর বিয়ার রাইতে মরে হায় সর্পাঘাতে
স্বামীক নিয়া ভাসিনু সাগরে রে ॥
পতির জীবন লাগি বর আমি নিব মাগি
শিব কাছে দেবতা-নগরে রে ॥

সংকাই বেহুলা ভগিনী মোর আমি যে সংকাই।
বাণিজ্য করিয়া আজ দেশে ফিরি যাই ॥
চল বোন মোর সাতে চল ফিরি ঘর।
মানুষ কি যাইতে পারে দেবতা নগর ॥
মৃত কি বাঁচিতে পারে ভবে পুনরায়।
পাগলামী ছাড় বোন ফিরে আয়।
লখাইর বদলে দিব রাজার নন্দন।
শাংখার বদলে দিব সোনার কংকণ ॥
মূল্যবান বস্ত্র দিব অগুরু সম্ভার।
গলায় পেন্দিয়া দিব চারু চন্দ্রহার ॥

বেহুলা · না কইস না কইস দাদা ও কথা না কইস।
সত্যি যদি তুই মোর সহোদর হইস ॥

নিশ্চয় জানিস দাদা জিয়াইম মোর পতি।
সতী মায়ের কইন্‌না মুই হই মহাসতী॥
অবিধবা বেহুলাক যায় আড়ি করে।
তাহার বিচাব চাইব দেবতা নগরে॥

সংকাই : মাঝি, ছাড়িয়া দেও নৌকার মেলা।
চলিয়া যাউক মোর বোনের ভেলা॥

বেহুলা : দেশে গিয়া না বল একথা।
শুনিলে জনিনী মাও কাটারিতে দিবে গাও
বাপ মোর আছাড়িবে মাথা॥

[গান]

অরণ পোড়া যায় বে উড়িয়া পবে ছাই
আজিকার নিদানেব দিনে দরদী কাহ নাই। [প্রস্থান]

[বরশি হাতে গোদা ও গোদানী]

গোদা : থুঃ-থুঃ মাও আই সাগরেব বয়োটা।

গোদানী : আরে গোদা, শালদুরারে—শালদুরা[২১]!

গোদা : কি কইস সাইতের সময়। একে চড়ে দাঁত ভাঙ্গি দিম।

গোদানী : আরে গোদা, না হয় না হয়, তুই বুঝলু না—বড় শাল, বড় শাল।

গোদা : আরে গোদানী দেখতো ওটা কি সরসর আসি ধচ্ছে।

গোদানী : আরে মুই কং কং করি কনু না। ওইটা কিরে? আরে ওটা না বত্তা-মরা-রে।

গোদা : বত্তা-মরা কিরে? ভাল করি ক।

গোদানী : ঐ তর দোষ। মুই কনু একটা বত্তা, একটা মরা।
বত্তা-মরা হইল না? আরে পরমা সুন্দরী কইনা?

গোদা : দেখং দেখং। তুই খালই আর বরশি ধরি বাড়ি যা। মুই খানেক দেখি আইসং। মোর আশা ছাড়।

গোদানী : আশা ছাড়ি দিম? আরে গোদা যাইস না। ওটা একটা প্যাত্তানি[২২]। পালেয়া আয়।

গোদা : মোর সাতত্‌ চাউটালী করলু তুই?

গোদানী : নারে গোদা, দেখিস না একটা মানষি মরিয়া যাইচে। পালেয়া আয়। তোক ধরিবে।

গোদা . মুই আর বাচিম নারে। তোর রান্দা ভাত আর খাইম নারে। আমার পিলাটা ঝাপিব ধরচে।

গোদানী এত্তি আয়। মাতাত্ ছেপ দেং। কানি নগুলটা কামড়ে দেং। আঁচলের একনা তাও দেবু।

[বেহুলার প্রবেশ]

গোদানী মাও, তোমরা কায হন? তোমরা কি মশানের প্যাত্যানা দেও? মরাটা কেন্টে মারলেন? কি কি পূজা নাগে। হামবা পূজা দিম। মোর স্বামীক না ধবেন মাও।

বেহুলা মাও মুই বেহুলা সতী। শ্বশুব চাঁদ সদাগবের সাতে মা মনসার বিবাদ। পদ্মার কোপে মোর পতি মরিচে। মুই মরা স্বামীক ধবি স্বর্গে মহাদেবেব কাছে যাং। মোর স্বামীক জিয়াইবার আশে।

গোদানী · ও তুই শিবপুর যাবু। তোর ভয নাই। তুই আসি গেইচিস। এলা বাবা তো শিবপুরত্ থাকে না। বানাসুর ওয়াক বানেশ্বরত্ বসাইচে। আইটালী কুরাও[২৪] দীঘি আছে। ঐ দীঘি থাকি বংতি নদী বিরাইচে। ঐ নদীত গাও ধুইয়া বাবারটে বর চাবু। যা চাবু তাই পাবু। ঐ দেখ বংতি নদী।

বেহুলা . তোমরা মোর সাত জনমের মাও ছিলেন। তোমার ঋণ শোধ করিব নাও। [প্রস্থান]

গোদা · কিরে গোদানী, আর তো ইদি আসিবে না?

গোদানী : দিচং আদাং বাদাং কয়া[২৫] বানেশ্বর বুলি চালেয়া। আজি বাড়ি চলেক। এদি আব আসবু না রে গোদা।

[উভয়ের প্রস্থান]

[ধোপানীর প্রবেশ। ছেলেকে মারিয়া কাপড় ধুইয়া আবার ছেলে জিয়াইয়া চলে যেতেই]

বেহুলা : পাও ধরি মাও তোমরা কায়? মোর মনে কয় তোমরা মোর পতিক বাঁচেয়া দিবার পারেন।

ধোপানী : তুই কায তোব পরিচয় দে। কি হইচে শোনং আগত্।

বেহুলা : মাও মুই সাহো বানিয়ার বেটি বেহুলা। শ্বশুর চাঁদ সদাগরত্ সাতে মা মনসার বিবাদ। সেই বাদে মনসা মোর স্বামীকে মারিছে। মুই স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা বুলি দেবলোকে

যাং মহাদেবের কাছে। তোমরায় মহাদেবী মাও মোর স্বামীক বাঁচেয়া দেও, তোমার পাও ধরং মাও।

ধোপানী : বেহুলা তুই দেবপুরী যা। মহাদেবের কাছত্ বর চাবু।

সপ্তম দৃশ্য

[ধ্যানে মহাদেব। বেহুলা প্রণাম করে গান ধরে]

বেহুলা : ও কি বিধাতা ও মোর বিধাতা
এত দুঃখ শোক কেনে বা দিলেন বিধি রে।
যদি স্বামী ধনক নাহি পাব গলায় কাটারী দিব
বন্ধা দিব তোমার উপরে বিধি রে।।

[মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ]

মহাদেব : ক্যায় মোর ধ্যান ভঙ্গ করিলেক। আইসো বব মাগো।

বেহুলা : বাবা, মুই বেহুলা। তোমরা সব জানেন বাবা। মোর মরা স্বামীক বাঁচেয়া দেন বাবা। এই দেখেন বাবা, মোর হাতত্ অক্ষয় শাখা, কপালত্ অক্ষয় সিন্দুর। মুই ক্যানে বিদুয়া হইম বাবা। মোর মরা স্বামীক ফিরিয়া দেও বাবা।

[পদ্মার প্রবেশ]

মহাদেব : পদ্মা তোর আক্কেল নাই। তুই বেহুলার স্বামীক মারিচিস। বিধাতার আশীর্বাদে উয়ায় সতী। উয়ায কেমন করি বিদুয়া হয়? দেবতার মান-কুল সব নষ্ট করলি তুই। লক্ষিন্দরক বাঁচেয়া দে তুই।

পদ্মা : বাবা সকল দেবতা পূজা পায়। মুই পূজা পাই না। মোর গতি কি হইবে বাবা? চাঁদ মোর পূজা দিলে সগায় মোক পূজিবে। মোর বিচারটা কর বাপ।

মহাদেব : বেহুলা তুই বাড়ি যা। পদ্মার পূজার ব্যবস্থা করিস। চাঁদ মোর বড় ভক্ত। উয়াক যায়া মোর আদেশ কবু। যা বেটি মোর বরে ধন-জন-সপ্তডিঙ্গা সব পাবু, স্বামীধনক পাবু। চারো যুগে তোর নাম মহাসতী। যা পদ্মা বালা লক্ষিন্দরক ধরিয়া আয়। [পদ্মার প্রস্থান]

বেহুলা : বাবা তোমার সামনায় আজি করি অঙ্গিকার।
নরলোকে পদ্মা পূজা করিম প্রচার।।
ভাদর মাসের পয়লা তারিখ যোড়য প্রচারে।
হইবে পদ্মার পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।।

[লক্ষিন্দর সহ পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা : আশীর্বাদ করোং সতী চির সুখী হবু।
বাবার আদেশ যায়া চান্দের আগৎ কবু।।
প্রতিষ্ঠা হলে পূজায় চান্দের দ্বারায।
তুইও ধন্য হবি মাও নিজ মহিমায়।।
যে জন পাতিবে ঘট আমার পূজার।
ধনে জনে পূর্ণ হবে তাহার সংসার।।
সংসারের যত বিষ দিম দূর করি।
সেই বাদে ধরিনু নাম আজি বিষহরি।।

জয় মনসার জয়, জয় বিষহবিব জয়।

এই পালাটি কোচবিহারের খাগডাবাড়ি নিবাসী প্রয়াত নারায়ণচন্দ্র রায়ের কাছে রক্ষিত বহু পুরাতন একটি খাতা থেকে অনুলিখিত হয়েছে। মূল খাতাটি এমন ব্যবহার অযোগ্য যে তার থেকে অনুলিপি করা একান্ত কঠিন, তবু সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে, অভিনব এই পালাটিকে পাঠযোগ্য করে আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌছে দিতে। খাতায় ব্যবহৃত বানান অবিকৃত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা গেছে। এ-পালার সংলাপের ভাষা অনেকটাই শিষ্ট; কারণ খাগড়াবাড়ি অঞ্চল আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত। আসরে গেয় বা অভিনীত পালার এটি একটি কঙ্কাল রূপ—পালা গায়কেবা আসর বুঝে পালাব দৈর্ঘ্য বাড়ান বা কমান। আসলে এটা অনেকটাই তাৎক্ষণিকভাবে [Extempore] গীত ও অভিনীত হয়। ভাষাও একইভাবে স্থানীয় বা শিষ্ট রূপ নেয়। এখানে গানেব মাধ্যমে নাট্যরূপটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পালার মধ্যে কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সর্ববোধগম্যতার প্রয়োজনে তার কয়েকটির অর্থ এখানে দেওয়া গেল :

১. বিধবা। ২. সুবিধা হবে না। ৩. জারজ। ৪. যার লজ্জা নেই তার নাক কাটলেও লজ্জা হয় না—প্রবাদ। ৫. লেজ। ৬. কেলেঙ্কারী। ৭. স্নান করা।

৮. ঝগড়াটে মেয়ে। ৯. ঢোকে। ১০. ডিমের। ১১. শুকনো মাছ। ১২. রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত এক প্রকার ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ রান্নায় ব্যবহৃত হয়, যা- তাঁদের খুবই প্রিয়। ১৩. পচানো সুপারীসহ পান। ১৪. বলি=বলিয়া দেই। ১৫. পিটিয়ে। ১৬. বাসা [Nest]। ১৭. কোথায়। ১৮. বাসর ঘর। ১৯. কলাগাছের ভেলা। ২০. শুক্‌নো খড়। ২১. ছোটো ছোটো কচ্ছপ— অমঙ্গলের চিহ্ন। ২২. ভূত। ২৩. চাতুরী। তুলনীয়—'আগৎ না কইচং মুই চাউটালী করলু তুই।' ২৪. কোচবিহারেব বাণেশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট বংতি নদী বয়ে গেছে তার উৎপত্তিস্থল এই আইটালী কুড়া। ২৫. আবোল-তাবোল বলে— প্রবাদ বাক্য।



গ্রামীণ লোকনাটক : গম্ভীরা

প্রদ্যোত ঘোষ

গম্ভীরা : অর্থ : 'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়।[১] তবুও আমরা অভিধান অনুসরণ করে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বা ব্যবহারিক যে অর্থ পাই তাতে দেখা যায় যে ১. গম্ভীরা। বি. [গম্ভীর মূল] ২. পুরীধামে কাশী মিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নিভৃত প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান, তার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহ। 'গম্ভীরা ভিতরে রাত্রো নাহি নিদ্রা লব', চৈ চ ৩১৩, 'গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল' ৩৫০. ৩. জগন্নাথদেবের শয়ন মন্দির। 'গম্ভীর গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি / গম্ভীরা কুহরে জ্বলে প্রদীপ সন্ততি', চৈ. ১০৩. ৪. গ্রাম্য দেবতার স্থান [দিনাজপুর] ৫. শিবের মন্দির, গাজন ঘর; গাজন উৎসব'।[২] অভিধানকারকে অনুসরণ করে সেই ধারণা করা যেতে পারে যে গম্ভীরা শব্দে বাড়ির অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বোঝায়। অন্তত চৈতন্যযুগে তা বুঝতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গম্ভীরা পূজা বা উৎসবের ক্ষেত্রে গৃহ বা মন্দির অথবা তাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের কোনো সম্পর্ক নেই। গম্ভীরা সম্পর্কে প্রথম গবেষক অবশ্য শিব-মন্দির হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন 'গম্ভীরা' শব্দটি।[৩] কিন্তু আসলে মন্দিরের সঙ্গে এ শিবের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ আজও এই পূজা বা উৎসব উন্মুক্ত আকাশের নিচেই অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও বা চাঁদোয়া অথবা ত্রিপল ইত্যাদি দিয়ে ঢাকে, কিন্তু অন্যান্য লোকদেবতার পূজার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বিষয়ে এর পূর্ণাঙ্গ মিল দেখা যায়।

আজকের গম্ভীরা পূজা উৎসব, নৃত্য-গীত প্রভৃতির সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিবের মূর্তি স্থাপন করে পূজা, গাজন ইত্যাদি শিব অনুষঙ্গী সব কিছুই এই গম্ভীরার অন্তর্গত। আলোচনা ও বিচার করে আমরা দেখাতে সচেষ্ট হবো যে এই শিব প্রকৃতপক্ষে কে? তাঁর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যই বা কি? সমগ্র পূজা ও উৎসবাদির উৎস কোথায়?

মালদহের গম্ভীরার শিবে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটি উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে প্রসারিত সূত্রেরই ফল। আমরা পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখতে পাই যে পরিপূর্ণভাবে কোচ ও রাজবংশীদের দ্বারা কেবল তিনটি পূজা এখনও হয়ে থাকে।

আদিবাসী কোচপলের পূজা গম্ভীরার প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে প্রয়াত গবেষক হরিদাস পালিত আর্য শিবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। লোকমতকে তিনি স্বীকার করে নিয়েও এটিকে শিবের পূজা বলে স্থির করেছেন। আজ গম্ভীরা এক ধরনের লৌকিক শিবপূজা বটে, কিন্তু আদিতে তিনি শিব নন। শিবকে যুক্ত কবার তাগিদে পালিত মশায় 'আদ্যের গম্ভীরা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। অবিভক্ত মালদহ জেলায় কোথাও 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে কথা শুনিনি। আসলে এর প্রধান অংশগ্রহণকারীদের ধর্মের মধ্যে গম্ভীরার কোনো বীজ আছে কিনা তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বামনগোলা থানার জগদলা অঞ্চলে বিশিষ্ট গম্ভীরা-উৎসবে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করার চিত্র আজও আদিম ধর্মানুষ্ঠানের কথা যেমন মনে পড়িয়ে দেয়, তেমনি জাদুবিদ্যা ও তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শব্দটিকে আদি জনজাতীয়দের বলে অনুমান কবেছেন।[৫] উত্তর বাঙলার সংস্কৃতির উপকরণ সাধারণত উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে প্রসারিত [কেবল তন্ত্রধর্ম গৌড় থেকে উত্তরে প্রসারিত]। জলপাইগুড়ির গমীরা শব্দটি ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বশবর্তী হয়ে গম্ভীরায় পবিণত হয়ে থাকবে। গম্ভীরা শব্দ থেকে গমীরার উৎপত্তি হয়নি, এটি কি সত্য? গমীরার ও গম্ভীরার মধ্যে গানের ঢঙ ও বিধয়বস্তুর যে পার্থক্য তা কিন্তু ভাববার বিষয়। মালদহের গম্ভীরা বিদ্রূপাত্মক। খণ্ড পালাগানের অঙ্গীভূত, কিন্তু জলপাইগুড়ির গমীরা নৃত্যবিহীন একক গান। গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য আবার গমীরা গানের অগ্রজ এবং তার মধ্যেই তার গোত্র লুকিয়ে আছে তা তো অস্বীকার করা যায় না। গামারের কথাও অন্যত্র উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধেয় আচার্য।[৬] ধর্মঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হতো[৭] এবং কোন সময় সেই পিঁড়িকেই হয়ত ধর্ম বলে পূজা করা হতো, তাই গামারা থেকে গম্ভীরা এসেছে এ-কথা মনে করা যেতে পারে।

এ-বিষয়ে উল্লেখ্য যে মালদহের গম্ভীরা পূজা বৎসরের শেষ দিনেই অনুষ্ঠিত হতো বা হওয়ার কথা, যদিও নরনারীদের উৎসব ও পূজায় যোগদানের সুবিধার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। তা কিন্তু পরবর্তীকালের যোজনা। সুতরাং প্রধান দিন ঐ চৈত্র সংক্রান্তি। ঐ দিনটিতে চড়কও অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক যে সূর্যোৎসব তা স্বীকৃত সত্য।

অতএব সূর্যপূজা পরবর্তী পর্যায়ে শৈব ধর্মের প্রভাবে আদিবাসীদের হাতে গম্ভীরা নাম নিয়েছে—একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। গৌড়েব দ্বিতীয় ধর্মপালদেব ও গোবিন্দচন্দ্র দেবের আমলে রাজ্যমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় এক প্রকার পূজাগৃহ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হতো, তার নাম গম্ভীরা।[৮] আরও একটা কথা—বাঙলার যশোহর-খুলনা অঞ্চলে গাজনের শিবের ঘরকে কোথাও কোথাও 'গম্ভীর ঘর' বলা হয়। সুতরাং শৈব প্রভাবে এই শিবপূজা গম্ভীরা পূজার নাম নিয়েছে একথাও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

সীমানা : অবিভক্ত মালদহের প্রায় সব থানাতেই গম্ভীরা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নাচোল পূর্ব পাকিস্তানের [বর্তমান বাংলাদেশ] অন্তর্গত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মালদহ জেলার দশটি থানায় আজও গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটে গম্ভীরা পূজার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও বাঙলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের ন্যায় মালদহের গম্ভীরা পূজায় নতুন জামাকাপড় কেনা ও পরার ধুম পড়ে যেত। গম্ভীরা পূজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আগেকার দিনে বর্তমান ছিল। এখনও গম্ভীরা উৎসব চলে বটে, কিন্তু তাতে সঙ্গীতের প্রাধান্য বেশি। এ-গীত এখন স্থান-কাল মানে না, তাই আগের গম্ভীরা গীতের চেয়ে আজকের গম্ভীরার পূজাবিহীন গীতে সর্বজনীনতার ছাপ বেশি। বর্তমানে এ-উৎসবের পীঠস্থান বলতে ভোলাহাট, আইহো, মহদীপুর, জোত, আরাপুর, সাহাপুর, পুরাতন মালদহ ও শিবগঞ্জকেই বোঝায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মালদহ জেলাব উত্তর-দক্ষিণের দুই জেলা অর্থাৎ পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায়ও গম্ভীরার যে প্রভাব পড়ে নি তা নয়। সেখানেও দু-চারটি শিবপূজা গম্ভীরা নামেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে মুর্শিদাবাদ জেলা অপেক্ষা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এর প্রভাব অধিকতর। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামের শিবপূজা গম্ভীবা পূজা নামে পরিচিত। অতএব এই সীমানা ধরে অনুসন্ধান করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে যুক্ত বাঙলার অন্তর্গত গঙ্গার উত্তরাংশে সামান্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জন সহ অঞ্চলগুলির মধ্যে গম্ভীরা পূজা ও উৎসবের প্রচলন আছে যার কেন্দ্রে রয়েছে অবিভক্ত মালদহ জেলা।

গম্ভীরা মণ্ডপ : প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে অর্থাৎ বঙ্গাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও গম্ভীরা মণ্ডপ যেভাবে সাজানো হতো আজ আর সে রকম হয় না। তার কারণ মূলত দুটি। ১. অর্থনৈতিক সংকট। ২. সামাজিক পটপরিবর্তন। সে গ্রামীণ গৌরব আজ অস্তমিত, তবুও অনুসন্ধানে তখনকার দিনের একটা চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

তখনকার মণ্ডপশ্রী বড়ই মনোরম। সতেজ পদ্মফুলে গম্ভীরা মণ্ডপ সাজানো হত। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলতো এবং সর্বদা ধূপ-ধূনার গন্ধে সমস্ত গম্ভীরা মণ্ডপ পূর্ণ থাকতো। উজ্জ্বল আলো থাকতো সমগ্র স্থানটিতে। গায়ক ও নৃত্যবিদেরা মশাল হাতে করেই এক 'গম্ভীরা' থেকে অন্য 'গম্ভীরা'য় যাতায়াত করতো। দর্শকদের বসার কোনো আসন ছিল না প্রথম যুগে। নিজেরাই আসন বাড়ি থেকে আনত। উন্মুক্তস্থানে বিরাট চাঁদোয়া দিয়ে গম্ভীরা মণ্ডপ প্রথমে আচ্ছাদিত থাকতো। কোনো কোনো স্থানে মণ্ডপের চারদিকে চারটি বৃহৎ লোহার পিলসুজে বড় চারটি প্রদীপ সারাক্ষণ জ্বলতে দেখা যেত। ঝাড়, দেয়ালগিরি, লণ্ঠন, আয়না প্রভৃতিও সেখানে থাকত। মোটা মোমবাতি এবং নানান ধরনেব পটও চারদিকে ঝুলত।

বিভিন্ন রঙের কাগজের পত্রপুষ্পদ্বারা গম্ভীরা মণ্ডপ সজ্জিত হওয়ার কারণও আছে। এই প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই ছিল প্রচলিত।

প্রাচীনকালে সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের দ্বারা গম্ভীরা মণ্ডপ হত সজ্জিত। কিন্তু ইদানীংকালে তার অভাব ও ব্যাপক চাহিদার জন্য কাগজের ফুল দিয়েই সাজানো হয় মণ্ডপ। এতদিন নূতন পদ্ম ব্যবহার করার সমস্যা কাগজের ফুল অনেকখানি সমাধা করেছে। যদিও তার জৌলুস অনেকখানি অন্তর্হিত ।

আজকের গম্ভীরা মণ্ডপের সে জৌলুস আর নেই, তবুও কাগজের ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর রীতি মোটামুটি চলছে। আগেকার মণ্ডপ সাজানোর সবচেয়ে জাঁকজমকের পূজার খবর আছে ভোলাহাটের মণ্ডপগুলির। সেখানে ছয় থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হতো। এখনকার খরচ পাঁচশত থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত।

আগেই উল্লেখ করার হয়েছে গম্ভীরা মণ্ডপের অলংকরণের কথা। মাটি, শোলা ও মোম নির্মিত ফলফুলের পূর্ণ অনুকরণ করা হতো। কাগজের দ্বারা মণ্ডপের ঝালর তৈরি হতো। ছেনী দ্বারা কাগজে বিবিধ প্রকারে ছিদ্র করে ঐ ঝালরগুলো প্রস্তুত করা হতো। এগুলো দেখতেও ছিল

অতি মনোরম। প্রাচীনকালের এই শিল্পকলা আজ মুমূর্ষু। তবুও আইহো, মহদীপুর ইত্যাদি গ্রামে আজও তার পূর্ব ঐতিহ্য চলে আসছে। ভোলাহাটের ঐশ্বর্যপূর্ণ মণ্ডপের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁতীরাও এই সময়ে নতুন নক্সাযুক্ত কাপড় তৈরি করতো, কারণ সারা বছরের বিক্রির মোট পরিমাণ এই একটি মাসেই হতো।

অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী : প্রাচীনকালে তো বটেই, আজও গম্ভীরা উৎসব পূজা, গীত-নৃত্যাদিতে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশীদের মধ্যেই গম্ভীরার ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ-বিষয়ে মালদহে ব্যাপক অনুসন্ধান করে প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় অ-বর্ণহিন্দু [Non-caste Hindu] সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু, অর্ধ-আদিবাসী ও আদিবাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে গম্ভীরার অনুষ্ঠানাদির ব্যাপক প্রচলন। ইদানীং কালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি এই উৎসব-পূজায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগদান করলেও তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানা, কালিয়াচক থানা, হাবিবপুর থানা, রতুয়া থানা, মানিকচক ইত্যাদি থানার অন্তর্গত মুখ্য অধিবাসীবৃন্দ হলেন নাগব, বিন্দ্ কাহার, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতার, মাহিষ্য, চাঁই [মণ্ডল], পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীপ্রমুখ সমাজের নিচের থাকের মানুষ। আর গম্ভীরার মুখ্য অংশগ্রহণকারীগণ নাগর, কেউট, কাহার, গোয়ালা, জেলে, তাঁতী, বিন্দ্, ধোপা, নাপিত ও রাজবংশী। এর মধ্যে রাজবংশীরাই সর্বাপেক্ষা বেশি এ-পূজায় অংশগ্রহণ করে।

গম্ভীরা ও গ্রাম্য-প্রধান : মণ্ডল : প্রায় সত্তর/ আশি বছর আগে এক একজন দলপতি থাকতেন প্রতি গ্রামে—অনেকটা এখনকার পঞ্চায়েত প্রধানের মতো। সেই গ্রামপ্রধানকে বলা হতো মণ্ডল। বিচক্ষণ এই প্রধান লোকটিব মতামত সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিত। সে-সময়ে প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে এক একটি গম্ভীরা থাকত। আসলে এটি মালদহ অঞ্চলের জাতীয় উৎসব বলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানও মণ্ডলের তদারকিতে হতো। এক এক গোষ্ঠীর এক একটি গম্ভীরা। মালদহে যত গম্ভীরা বর্তমান, তার মধ্যে আদি গম্ভীরার নাম 'ছত্রিশী গম্ভীরা'। ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকলেও ছত্রিশী গম্ভীরার মণ্ডলের বা প্রধানের পদ একজনই গ্রহণ করতেন।

আদিতে জমিদার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে গম্ভীরার আয় হতো। পরবর্তী সময়ে বা এখন প্রায় সব গম্ভীরাই সর্বজনীন। মণ্ডলের মধ্যে

বিবাদেব ফলে পরবর্তী পর্যায়ে মণ্ডল যায় ভেঙে। তাতে দুই বা ততোধিক গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তাতে দেখা যায একই গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি গম্ভীরা উৎসব শুরু হলো। গ্রামীণ সমাজের কাঠামোর রূপান্তর হওয়ায় সব কিছুব সঙ্গে এইভাবে পূজা-উৎসবেব পরিবর্তন হয়েছে।

গম্ভীরা পালাগান : গম্ভীরা পালাগানেব সঙ্গে গম্ভীরা মুখোশ-নৃত্যেব কোনো মিল নেই। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধাবা—অবশ্য শিব-গাজন উভয়ের মধ্যে ক্ষীণ যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে। এই উভয়ের মধ্যখানে গম্ভীবার যে আচারাত্মক অনুষ্ঠান হয়, [চারদিন/তিনদিন/সাতদিন] যা 'ঘটভবা', ছোট তামাসা, বড় তামাসা ফুল ভাঙ্গা, আহারা বা বোলবাই বা বোলাই, সামশোল ছাড়া, ঢেঁকী চুমান বা ঢেঁকী মঙ্গলা নামে পরিচিত,—তাদের প্রসঙ্গ আমাদেব আলোচনাব সীমানার বাইরে। যে গম্ভীরা গান বা পালা-গান,—যার মূল ঢঙ যাত্রা তাই-ই আমাদের আলোচ্য। কারণ, এখন গম্ভীবা গানই আদবণীয় তার জেলার চৌহদ্দীব বাইবেও। একদা গম্ভীবা-আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, গম্ভীরা গানের ঢঙ যাত্রার। তাই একে গম্ভীরা পালাগান বলা উচিত। এবং গম্ভীরার এই যাত্রার ঢঙও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ঘটেছে বলে মনে হয়।

গম্ভীরা পালাগানেব আসরের চিত্রটি এইরূপ :

প্রায় বার থেকে ষোল ফুট ব্যাসযুক্ত গোলাকার অংশকে আসর করে চারদিকে বৃত্তাকারে শ্রোতা বা দর্শকেরা ভূমি-আসন গ্রহণ করে। ওপরে থাকে সামিয়ানা বা অন্য কোনো আচ্ছাদন। একটু দূরে থাকে গ্রীনরুম বা সাজঘব। আসবের একপাশে বসে বাজিয়ে এবং গায়কেরা। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, ডুগি তবলা, বাঁশি ও জুড়ি। আদিতে ছিল কেবল ঢোল ও কাঁসি। তার পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা ও মন্দিরা। আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গোপাল দাস [দাস গোপাল নামে পরিচিত], হরিমোহন কুণ্ডু, শরৎ দাস ও মোহম্মদ সূফীর আমলে ঐ সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। বাঁশির ব্যবহার হাল আমলের।

একটি গম্ভীরা পালা-গানের অনুষ্ঠানের কয়েকটি অংশ আছে। যেমন :

১. মুখপাদ। ২. বন্দনা। ৩. ডুয়েট বা দ্বৈতগান বা চারইয়ারী। ৪. পালাবন্দী গান। ৫. খবর বা রিপোর্ট।

১. **মুখপাদ** : এই অংশে এক একটি চরিত্র আসরে এসে গান গেয়ে তাদের নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে থাকে। এটির দুটি অংশ। প্রথমটিকে বলে **ধুয়া** এবং দ্বিতীয়টিকে বলে **চিতানি**। ধুয়া-অংশে আড়াই ফের গান। 'চিতানি' অংশে আছে দুই ফে'র গান। তেহাই—অর্থাৎ মান পর্যন্ত সব গান-ই হয়, অর্থাৎ ২/২১/২ সব ফেরাই হয়। তবলায়ও বিভিন্ন বোল ওঠে।

গম্ভীরা গানের অনুষঙ্গ হিসেবে আদিযুগে ছিল ঢোলক। মুখপাদের তিনজন ব্যক্তি শুদ্ধ একতালে গায়। চতুর্থজন পরে দাদরায় গায়। ধিন্, ধিন্ ধাগ, ধা তিন নাগ্, তার সঙ্গে রেলা ও তারপর তেহাই।

'মুখপাদের' পর বন্দনা, সেখানে খেমটা সুর বর্তমান।

বোল : ধেটে ধেনে তেনে/ তেটে ধেনে তেনে।

রেলা : ধাগে তেনে ঘেনে/ নাকো তেনে কেনে/ তাকো তেনে ঘেনে/ নাগো ধেনে ঘেনে।

তিনবার তেহাই : ধা তেনে ঘেনে/ নাগো ধেনে ঘেনে।

চারইয়ারী শুদ্ধ একতালা, খেমটা ও দাদরার : ধিন্ ধিন্ ধা, ধাগে তিন্ না/ কত্ তিন্ ধাগে, তেটে ধিন্ তেটে।

প্রায় যাট বছর আগে প্রয়াত ধনকৃষ্ণ অধিকারীর দল জংলা, একতালা ও দাদরায় বাজাতেন : ধা তেটে ধিন, ধাগে তেটে তেটে/ তা তেটে ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ ধা।

গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে অর্থাৎ একজনকে শিব সাজিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। ইংরেজ বাজারের বিখ্যাত বর্ষীয়ান গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মতে প্রায় ছ-সাত দশক আগেই এর প্রচলন। কারণও খুব চিত্তাকর্ষক।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাঙলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহ আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহম্মদ সূফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষ মালদহে না আসায় তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। মোহম্মদ সূফী তবুও শিবকে উপস্থিত করে যে গান গেয়েছিলেন তার কিয়দংশ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন শ্রীপণ্ডিত : 'হে দ্যাখ্, হো দ্যাখ্ কারে ডাকতে/ কেডা এল ভাইরে—/ ইনি কি

স্যার আশুতোষ? হাইকোর্টের জজ/ গায়ে মাখা কেন ছাইরে?'

এ-চিত্র চিত্তাকর্ষক হওয়ায় পরবর্তীকালে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন, তখন তিনি স্যার আশুতোষ নন, তিনি সর্বকর্মের হোতা—পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সরকারের প্রতিনিধি। সুতরাং শিবের চরিত্রকে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সূফী মাস্টারের অবদান অনস্বীকার্য। শিব এখন সামন্ততান্ত্রিক [feudal] চরিত্রের প্রতিভূ। সুতরাং রূপকার্থে শিবের এই ব্যবহার অন্য কোনো লোকনাট্যের মধ্যে দেখা না যাওযায় গম্ভীরা কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্য বৈশিষ্ট্যের তারিফ করতেই হয়।

গম্ভীরা পালাগানের আসরের চেহারা এইরকম : গম্ভীরা ঘরের দিকে মুখ করে গায়কেরা, পাত্র-পাত্রীরা থাকে। পাত্র-পাত্রীদের দক্ষিণদিকে থাকে যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী ও দোহারদের দল। গম্ভীরা ঘর না থাকলে অন্যত্র যেখানে গম্ভীরা গান হয়, সেখানে ঐ একই কাঠামোয় আসর বসে। আসরকে ঘিরে বৃত্তাকারে বসেন দর্শকেরা।

২. **বন্দনা** অংশে মহাদেব সেজে একজন আসে। পরিধানে বাঘছাল, ডান হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাঁ হাতে ডম্বরু। তাকে উদ্দেশ্য করে অন্য কয়েকটা চরিত্র বক্তব্য রাখে। মহাদেব এখানে রূপকার্থে উপস্থিত হন। প্রথম যুগে তিনি ছিলেন 'ফিউডাল লর্ড'। এখন তিনি সরকার। তাঁকে দেশের নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদনই সংলাপের মুখ্য বিষয়বস্তু। এখানে উভয়পক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। অন্য চরিত্রগুলির গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি পরনে ধুতি [মালকোঁচা করে]। কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে—এরা যেন দারিদ্রপীড়িত জনগণ। রূপকের অর্থ—সরকারের দরবারে সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। কিছুক্ষণ সংলাপ চলার পর শিব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে হন অন্তর্হিত।

শিবকে উপলক্ষ করে গান :

কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায় না অন্ন
হায় কি রে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী

টাকায় আটমণের ভাও চাউল হে
কুণ্ঠে [কোথায়] গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেও ভাও জুটে না
দু-বেলা প্যাটে তাও জুটে না
তোর নন্দী ভিরিঙ্গী বুড়হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পুজবো, কহেক হামরা, শিব হে।
বছব বছর আসিস কেন
দ্যাশ্চ লক্ষ্মীছাড়া শস্যশূন্য.. ।

যদিও শিব-বন্দনাই গম্ভীরার মুখ্য বন্দনা, তবুও অন্তত একজন গম্ভীরা কবির গানে কার্তিক-বন্দনা পাচ্ছি। বাংলা ১৩৪৪ সালে গোপাল দাস এই বন্দনা গানটি গেয়েছিলেন :

'লম্বা কোঁচা জুতা ফোতা [চাদর]
ছাই মাখা যার বাপ বে
নবাবীতে বাদশাদীতে
গণশার কাটা কাপ রে [গরিবের বিলাসিতা বা ঢঙ]
যার ঘর গৃহস্থী সব ফাঁকা
সেজেছে দেখ, কাঙাল বাঁকা
যার মা তারা, পাঁঠা প্যারা [মহিষ শাবক]
খেয়ে কবলো সাফ্‌রে
লম্বা কোঁচা...'

শিব-বন্দনার পর নানা বিষয়বস্তু নিয়ে গান তৈরি হয়। যেমন ভাষা সমস্যা, ইংরেজি শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি। হাল আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় রাজনীতির কথাও ধরা পড়ে এইসব বিষয়বস্তুতে।

বন্দনার পরবর্তী সব অনুষ্ঠানসূচীতে অভিনেতাদের মধ্যে একজন একেবারে ছিন্নবস্ত্রে থাকে। সে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুট করে কুশীলবেরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য।

গম্ভীরা গানে শিববন্দনা ও অন্যান্য গানগুলি লেখা, কিন্তু অন্যান্য সংলাপ যা মূল গানকে ব্যাখ্যা করে তা অভিনেতাবা তৎক্ষণাৎ [Extempore] তৈরি করে অনুষ্ঠানে। এখানেই তাদেব কৃতিত্ব।

গম্ভীরা গানে মহিলা শিল্পীর প্রবেশ ঘটেনি এখনও, পুরুষেরা মহিলা চরিত্রের বেশ ধারণ করে। এদিক থেকে গম্ভীরা এখনও সাবেকি ঢঙে চলেছে।

৩. **ডুয়েটে** বা দ্বৈত বিষয়বস্তুতে একজন পুরুষ ও একজন নারী চবিত্র থাকবেই। গম্ভীবা গানে 'চার-ইয়ারী' বর্তমান। চার ইযার বা বন্ধু, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে এখানকার পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চার। বৈঠকী ঢঙে চলে সংলাপ ও গান। এখানকার বোল একতালা। সূফী মাস্টারের আমলে ধনকৃষ্ণ অধিকারী এ-বোলে বাজাতেন।

৪. **গম্ভীরার ডুয়েট** [Duet] ও চার-ইয়ারী অংশে নাট্যের ভাগ গানের চেয়ে বেশি। বলা বাহুল্য এটিই লোকনাট্য। এর নাট্যিক চরিত্র আলোচনার ব্যাপারে নাটকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাই : নাটকের প্রধান অঙ্গ চারটি—কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ। লোকনাট্যেরও তাই। কেবল দৃশ্যপট সেখানে নেই। এর বৈশিষ্ট্য মূল যাত্রার [ইদানীং কালের যাত্রার নয়], কেবল দৃশ্যপট এখানে নেই। যাত্রার সঙ্গে এখানেই পার্থক্য। তাছাড়া নাটকের মধ্যে যে গতি [Tempo] বা action বর্তমান—তার বাহুল্য বীর ও রৌদ্ররসের বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে থাকে আবেগপূর্ণ সুদীর্ঘ সংলাপ বা বক্তৃতা, আর থাকে স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের জন্য ভাঁড়ামির চেষ্টা।

যাত্রার সঙ্গে গম্ভীরার দৃশ্যপটের অভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অমিল হল তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও রৌদ্ররস পরিবেষণের চেষ্টা। ভাঁড়ামো [Baffoonary] এখানেও লক্ষণীয় নয়, এখানকার রসিকতা সার্কাস বা যাত্রার ভাঁড়ামো নয়। অঙ্গ-ভঙ্গি [Gesticulation] ও বক্তব্যের [সংলাপ] মাধ্যমে রঙ্গরসিকতা এত তীব্র যে সত্য কথাটি রসিকতার শর্করার মোড়কে পরিবেষিত হয়। পরে চাবুকের মতো তা গায়ে লাগে। গম্ভীরার পাত্র-পাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়ানুগ সেই পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে।

গম্ভীরা গানের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী থাকে। সাধারণত দুই বা চারজন। দু-জনে হলে হয় 'ডুয়েট' [Duet], চারজন হলে হয় 'চার-

ইয়াব'। পালাবন্দী গম্ভীরার গান ছাড়া অন্য কোথাও পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চারের অধিক হয় না। এর মধ্যে একজন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বা স্পষ্টবক্তা বা উচিত বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। এ-ভূমিকাটি গ্রহণ করে দলের সর্বাপেক্ষা দক্ষ অভিনেতা। তার বক্তব্য ও রঙ্গ-পরিহাসেই গম্ভীরার নাট্যিক ভাবটি পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। কাহিনীর মধ্যে গতি বা Tempo-ও সৃষ্টি হয়। দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি ঐ সাধারণ বক্তাবই দিকে। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি পরিস্ফুটনে তার ভূমিকাই মুখ্য। তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে অনুষ্ঠানের মান।

গম্ভীরা গান আদিযুগে কেবল গানই ছিল, সুতরাং লোকসঙ্গীত হিসেবেই মাত্র গম্ভীরার মূল্যমান নিরূপিত হত। কিন্তু ইদানীংকালে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপও চলে, তারই মধ্যে গান। কখনও বিশিষ্ট কোনো এক পাত্রের মুখনিঃসৃত, কখনও বা সমবেত কণ্ঠে বা ধুয়ার [Refrain] মতো, সুতরাং লোকনাট্যের গুণসম্পন্ন এই গম্ভীরা গান।

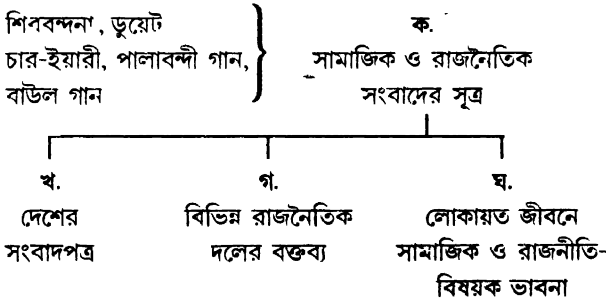
সাধারণত গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তৈরি হয়,—এখানে সকল দল ও মতের ত্রুটিগুলি সমালোচিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। লোকশিক্ষার মান ও সমাজচেতনার উদ্বোধন এই গানের উদ্দেশ্য —তবুও পৃথকভাবে দু-জন মুসলিম গম্ভীরা গান রচয়িতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তাঁরা হলেন—মোহাম্মদ সূফী রহমান [সূফী মাস্টার] ও সেখ সোলেমান [সোলেমান ডাক্তার]। ধর্মের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে গম্ভীরা গানের উপস্থিতি তাঁদেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য করে।

আদিতে সমাজের বা গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের [প্রভাবশালী ব্যক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য] ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হত। কারণ, সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। দূরবর্তী কোনো ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু গানে জায়গা করে নেয়। এ-ধারার প্রবর্তক উক্ত মুসলিম রচয়িতাগণ। কারণ, হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দীর বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এর প্রবর্তনে তাঁদের সুবিধে হয়েছিল।

এর ধারাই আজ বেগবতী হয়ে গম্ভীরা গান সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে বিলম্ব করেনি।

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে। সংলাপগুলি পৃথক লেখা হয় না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কতকটা কবিগানের মতো। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তৈরি করে পাত্র-পাত্রীরা। দলপতি বা অধিকারীর পরামর্শমতো বা নির্দেশমতো, কখনও বা নিজেরা আগেভাগে আলোচনা করে নিয়ে অভিনেতারা গানের আসরেই নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী সংলাপ তৈরি ও রঙ্গরস পরিবেষণ করে। এতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভাব বিকাশ ঘটে। বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন, তাঁর নামেই প্রধানত দলের নাম হয়। যেমন, ইংরেজ বাজারের মটর বা 'মটরাব গান' বা 'নিরুর গান'। অথচ, গান রচয়িতা হয়তো দেবনাথ রায় ওরফে হাবলা বা গোপীনাথ শেঠ। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বা মটরবাবুর মুদ্রাদোষ [mannerism] ও সংলাপের ঢঙ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সাগ্রহে গ্রহণ করে বলেই তাঁর অনুষ্ঠানেব আকর্ষণ।

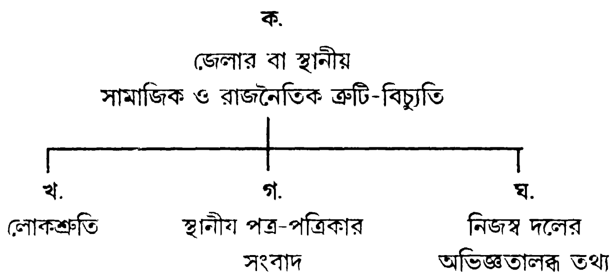
গম্ভীরা গানের আবেদন শেষপর্যন্ত দর্শক-শ্রোতাদের নিকট কেমন ভাবে পৌঁছায়, তা নিম্নলিখিত ছকের মধ্যে নিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে :



গম্ভীরা গানের রচয়িতার সাধারণ বক্তব্য [common] + গানের মূলসুর + শিল্পী বা পাত্র-পাত্রীর রস-রসিকতাযুক্ত উদাহরণ সমন্বয়ে সংলাপ যা তাৎক্ষণিক সৃষ্ট [ক্ষীণ কাঠামো আগে-ভাগে অবশ্য সৃষ্ট হয়]

মূল গান = সংলাপ + স্থানীয় লোকায়ত উদাহরণ + রস-রসিকতা।

সংবাদ বা রিপোর্ট :



অতএব, গম্ভীরা গান [গৌণ]; সংলাপ, ব্যাখ্যা, উদাহরণ + রস-রসিকতা [মুখ্য]। আজও খ্যাতনামা গম্ভীরা দলগুলি বিশেষ কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গান রচনার প্ররোচনায় রাজি হয় না। ফলত, সমালোচনা যে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তীব্র হয়, তারা প্রথমে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো স্থানে ইদানীংকালে দৈহিক নির্যাতনের খবরও মিলেছে। কিন্তু মটরবাবুর বা নিরুবাবুর দল সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে পালা গেয়ে চলেছেন এবং তাতে তাঁরা অধিকতর লোকপ্রিয় হচ্ছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা বা স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত, আজ সেগুলি বেশ কিছুটা স্তিমিত। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাপক সামাজিক বা রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে শিল্পীরা সমগ্র ব্যাপারটিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেন।

৫. গম্ভীরা গানের শেষ অংশ—খবর বা রিপোর্ট [Report]। অর্থাৎ একটা বিশেষ অঞ্চল বা শহরের [যে স্থানে এই অনুষ্ঠান হয়] নতুন খবরাখবর। ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, যেটি মাত্র দুটি চরিত্রেব সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটি বিশেষ মূল্যবান মাধ্যম এটি। পূর্ববর্তী বৎসরের পর্যালোচনা এর মধ্যে ধরা হয়।

গম্ভীরা প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বৎসরান্তে লোকসমাজ কর্তৃক বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা। এটি ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এইভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণী-পর্যালোচনাকে মনে করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সুরে গাওয়া হয় গম্ভীরা গান। মিলেমিশে বিভিন্ন। কিন্তু তবু একটা বিশিষ্ট সুর সে তৈরি করে নিয়েছে। ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, জংলা [বোলহীন মিশ্র সুর] এখানে বর্তমান। ইদানীংকালে হাল আমলের হিন্দী ও আধুনিক বাংলা গানের সুরও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তাতে কোনো কোনো দল নিন্দনীয় হচ্ছে, কারণ তা মূল গম্ভীরা গানের নির্ধারিত সুরের ব্যতিক্রম মাত্র।

আলকাপ, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনের সংমিশ্রণে গম্ভীরা সঙ্গীতের উদ্ভব; তবে আলকাপের প্রতিষ্ঠিত সুরের প্রভাবই তার উপরে সর্বাধিক। এই তথ্য মিলেছে আইহো নিবাসী প্রয়াত গম্ভীরা-কবি সতীশ গুপ্ত ও ইংরেজ বাজারের বর্ষীয়ান কবি-শিল্পী বিশ্বনাথ পণ্ডিতের কাছ থেকে।

মাত্র পাঁচ-ছয় দশক আগে এই বিশিষ্ট সুরের জন্ম। তার আগে গম্ভীরায কেবল শিবকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়া হত। তাতে সুরের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। উনিশ শতকের একেবারে শেষ ও বিশ দশকের প্রথম দশকে এক একটি গম্ভীরা পূজার থানে বহু দল মিলিত হত। গান প্রায়শ সমস্ত রাত ও পরের দিনের প্রথম অর্ধ চলত। যে দলের যে সুরটি উপভোগ্য হত, সেটি অন্যদল গ্রহণ করে গাইত পরবর্তী সময়ে। এখানে স্মরণীয় যে, আগে সুর পরে শব্দ বা কবিতার অংশ। ইংরেজ বাজার থানার অমৃতি গ্রামের লোহারাম খলিফার সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। লোহারামের সুরজ্ঞান ছিল অসাধারণ, তারই সঙ্গে ছিল সুরেলা গলা। তিনি মুখ্যত ছিলেন আলকাপ গায়ক। এক সময় ছিল যখন লোহারামের সুর ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাঁর গানের সুরই যে পরিপূর্ণভাবে গম্ভীরায় এসেছে তা নয়। অনেকেরই এসেছে, তবে লোহারামের অবদান বেশি মানতেই হবে। আসলে আলকাপেব সুরের উপরে ভিত্তি করেই মূলসুর জন্ম নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় তো বটেই, মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে অর্থাৎ কালিয়াচক, সুজাপুর, মানিকচক ও ইংরেজ বাজার থানায় বেশ কয়েকটি বিখ্যাত আলকাপ দল আছে। আলকাপের জন্মও বর্তমান গম্ভীরার সুরের পূর্বে, তাই আলকাপের সুর গম্ভীরা গ্রহণ করেছে। গম্ভীরার সুর আলকাপে যায়নি।

গম্ভীরা গান সাধারণত কীর্তন, জারি প্রভৃতি গোষ্ঠীসঙ্গীতের অন্তর্গত। এ-গানের লক্ষ্য—লোকশিক্ষা। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে এর মাধমে। যত সহজে এ-গান ব্যাপকভাবে সাধারণ

মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সেরকম অন্য কোনো মাধ্যম আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

এ-গানের গায়ক সম্পর্কে বলা চলে যে তথাকথিত অভিজাত গায়কেরা উদাসীন বলে প্রতিভাবান নায়ক এখানে মুষ্টিমেয়। ভাল কুশীলবও বিরল। আইহোর কবি প্রয়াত ইন্দ্রদমন শেঠ দুঃখ করে বলেছিলেন, বছর দশেক আগে—'গায়কের অভাবে গান গাওয়ানো হয় না। খাতার গান খাতায় লেখা থাকে। নতুন নতুন গায়কের জন্ম না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গম্ভীরা গাওয়ানোই হবে না'।

গম্ভীরা গানে অশ্লীলতা এসে পড়েছে বলে যে অভিযোগ অনেকে করে থাকে—তা অসত্য। নগরকেন্দ্রিক গুম্ফস্ফুরিত হাস্যকে এখানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মেঠো হাসি উপস্থিত সকল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে লেগে থাকে। দু-চারটি শব্দ বা সম্বোধন গ্রাম্য হতে পারে, কিন্তু তা কখনই অশ্লীল নয়।

এ-গানের পরিবেশেরও একটা মূল্য বর্তমান। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষ ধুলোপায়ে সাধারণ সুখ-দুঃখ, সমাজনীতি, লোকাচার, দেশাচারের কাহিনী এর মধ্যে পেয়ে থাকে, যা হয়ত নন্দনতত্ত্বের তৌলে নগরের তথাকথিত সভ্য মানুষের নিকট বিশেষ মূল্যবান নয়।

রচয়িতা ও শিল্পী : গম্ভীরা গানের আদিকালের রচয়িতাদের নাম পাওয়া যায় না; কারণ এগুলি লোকসঙ্গীত। নামহীন এ-গান। যে নামগুলি পাওয়া যায় সেগুলি সত্তর-আশি বছরের মধ্যেকার। উল্লেযোগ্য রচয়িতাদের মধ্যে আছে সাহাপুরেব হরিমোহন কুণ্ডু, ইংরেজ বাজারের মোহাম্মদ সূফী, মোহাম্মদ সোলেমান, গোবিন্দলাল শেঠ, মেরাজউদ্দিন, আবুল হোসেন, আকবর খলিফা, শরৎ পণ্ডিত [ভট্টাচার্য] প্রমুখ।

গম্ভীরা গানের ভাষা : মালদহ জেলায় বহু জাতির বাস। এর মধ্যে উপজাতিও কম নয়। বহু ভাষার মিশ্রণে একটা গ্রামের পাশাপাশি অনেকগুলি পরিবারের পৃথক পৃথক ভাষা প্রচলিত। বিহার সংলগ্ন হওয়ায় হিন্দী, খোট্টাইও এসেছে, মৈথিলীও আছে। রাজবংশী-পলিয়াদের ভাষার প্রভাব কিন্তু এখানে বেশি। মিশ্র ভাষা তাই এই জেলার কথ্য ভাষা। কথ্য ভাষায় মূলত বরিন্দ এলাকার ভাষা এবং রাজবংশী প্রভাবান্বিত। বিশিষ্ট সুরের টান এখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, করেছে—কর‍্যাছে, হয়ে—হয়্যা। দ্বিত্ব স্বরও লক্ষণীয়। যেমন, জুতা—জুত্তা, কবর—কব্বর, ড়-এর স্থলে

ঢ়-এর ব্যবহার, যেমন বুড়ো—বুঢ়া; ক-এর স্থলে খ, যেমন—নাকো—নাখো। নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহারও বর্তমান—যেমন পা—পাঁ বা পাঁও, বেশ—বেঁশ, ভেঁস।

এই ভাষায় এবং শব্দ-সম্ভারে যে লোকনাট্য গম্ভীরা সৃষ্টি হয় তার আবেদন এ জেলাবাসীর নিকট যত আকর্ষণীয়, তা অন্যত্র হবে না—এটা বলাই বাহুল্য। জেলার এই শব্দ-সম্ভার গম্ভীরা গান থেকে ইদানীংকালে প্রায় অন্তর্হিত। তবু কয়েকটি অতিরিক্ত শব্দ আমরা নিচে তুলে দিচ্ছি।

ল্যাহলা—বোকা, দূন—পরাজিত, মাকড়া—বানর, তেলপাট—মোসাহেবী কবা, আলকুটানে—অভিমানী, পশারহাট্টা—দশকর্ম ভাণ্ডারের মতো দোকান, তেলচাটা—আরশুলা, হালাকান—পরিশ্রান্ত, আলবেলি—বাহারে সাজ ইত্যাদি।

গম্ভীরার সঙ : নাটকীয় ভাব প্রকাশের সবাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বজনীন মাধ্যম হল সঙ। বিচিত্র পদক্ষেপ ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে একটা বিষয়কে দর্শক ও শ্রোতাদের নিকট উপস্থিত করা সঙের লক্ষ্য। গত কয়েক শতকের লোকসংস্কৃতির চিত্তবিনোদনের একটি বিশিষ্ট ধারাই হচ্ছে এই সঙ। গান ও ছড়ার মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তি ও সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি রঙ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে এই সঙেরা।

রোমক নাট্যরীতিতে সঙের ন্যায় অঙ্গভঙ্গিতে বোঝানোর ব্যবস্থা ছিল। ইতালির মুখোশ রঙ্গ-নাট্য [masked comedy]-র অনুরূপ অঙ্গভঙ্গিরই একটা রূপ আমাদের দেশের সঙ। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এই সঙের ঘটনা সংবাদপত্রেও ফলাও করে ছাপা হত এক সময়। সঙ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে এক সময় যাত্রার আসরে সঙের নাচ-গানের উল্লেখ পাওয়া যায় কোথাও কোথাও[৫]। ছবিও ছাপা হত বহু ভঙ্গির।

'সঙ' আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। প্রায় বেরোয় না ইদানীং কালে। আগে গম্ভীরা পূজার চতুর্থ দিনে সঙ বেরুতো। ইদানীং কালে কেবল ইংরেজ বাজারে প্রতি বছর ১৬ বৈশাখ সঙ বের করে রাম পণ্ডিতের দল।

প্রায় তিন দশক আগে মটর ইংরেজ বাজারে সঙ বের করেছিলেন। একটা ছাগলের গায়ে চাকা লাল ছাপ দিয়ে তাকে সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করান। উৎসুক জনতাকে বলতে থাকেন—'এই চক্‌রা বকরী সমস্ত বাঁদর খ্যায়াছে।' এর যে ইতিহাস তা এই রকম : ননী চক্রবর্তী নামে এক শিকারী মালদহের বানরকুলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেন বন্দুকের গুলিতে এবং সরকার

কর্তৃক পুরস্কৃতও হন। কারণ বানরকুল মালদহের শস্যাদি উদরসাৎ করছিল। এই ঘটনার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যাই থাকুক না কেন, নিরীহ শাখামৃগদের বর্বরোচিত নিধনে লোকসমাজ ব্যথিত হয়েছিল। এখানে চক্রবর্তী হলো চক্‌রা বকরী [ছাগল]।

সঙের মিছিল দু-ভাবে চিত্রিত হয়। প্রথম রূপটা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় রূপ 'নৌকার মিছিল'। এটি ইংরেজ বাজারে দেখা যায়।

বাঁশের বাখারীর উপরে কাপড় দিয়ে বড় নৌকার মতো করা হয়—তার নিচে উপরে ফাঁকা। অনেকগুলি চরিত্র থাকে। থাকে নর্তকী ও গায়কেরা। পাঁচ-ছয় [৫।৬] জন সেই নৌকা ঘাড়ে করে নিয়ে যায়। নৌকার গায়ে কাঠ দিয়ে তাল ঠোকে গায়কেরা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল ও করতাল, শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে এই সঙের মিছিল। রামকিঙ্কর পণ্ডিতের লেখা একটি সঙের গান এখানে উদ্ধৃত হল :

আমাদের এই ছোট তরী উজান-ভাঁটি যায়।
মনের আনন্দে নৌকা গড়িলাম রে—ওরে ভাই।
মালদা টাউনের খবর, জানাই সব জবর।
দয়া করে আপনারা শুনুন ভাই সবাই ।।

১. কাঠের তৈরি, কাঠের বৈঠা, কাঠের হাল হয় ভাই।
বাদাম তুলিয়া চলে, তালে তালে যায় ।।
২. পৌরসভা এই শহরে, উন্নতি করে।
যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে রাস্তা চলা দায় ।।
৩. দলাদলি মারামারি, চলে সদাই হুড়াহুড়ি।
দেখাইয়া বাহাদুরী, টাকা মেরে খায়।
৪. কহি সেনেটারী অফিসার, দ্যাখেন কি টাউন ঘুরে
বসে বসে অফিস ঘরে, ডুব দেয় নর্দমায়
৫. জেলায় সদর হাসপাতাল, হয়ে আছে মহাকাল।
রুগীরা হয় নাকাল, ঔষধ বিনে মারা যায় ।।
৬. সরকারী এলেকট্রিক সাপ্লাই, গুণের তাদের অন্ত নাই।
জ্যোৎস্নারাতে আলো জ্বালায়, আঁধারে নিভায়।
৭. চুরি করে গুণ্ডা চোর, আলোর দয়া এদের উপর।
সাথে পুলিশ যোগ দিয়ে, চুরি সে করায়।

৮. এই জেলার পুলিশ সুপার, করে অন্যায় ব্যবহার।
রেগে গিয়ে পুলিশেরে, লাথি চড় লাগায় ॥
৯. কম্পেনশেসন অফিসার, স্বয়ং গৌরাঙ্গ অবতার।
গভীর জলে করেন শিকার, ধরা ভীষণ দায় ॥
১০. সাপ্লাই অফিসের কথা, আছে বহু কীর্তি গড়া।
হলে পরে এদের দয়া, নিস্তার আব নাই ॥
১১. পোস্ট আপিস সৌখিন হয়ে থাকে উদাসীন।
বাড়ির পাশে একমাসে চিঠি পাওয়া যায়।
১২. টাউনেব ব্যবসায়ী যারা, হুজুগেতে মাতে তারা।
বাজেটের কথা শুনে, মালপত্রের দর বাড়ায় ॥

আবার গরুর গাড়ির উপর শিব-পার্বতী সেজেও সঙ বেরোতে দেখা যেত কখনও কখনও। শিবের উদ্দেশ্যে দুঃখ-দুর্দশার অনুযোগ-অভিযোগ উত্থিত হয়। এতে স্থানীয় এবং মূলত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রই তুলে ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে গম্ভীরার সঙের গান—রিপোর্ট বা খবব জাতীয় গানেরই একটা দৃশ্যসঙ্গীত।

পূর্ব বাংলা : গম্ভীরার অন্যরূপ—র‍্যাডক্লিফ রায়েদাদে দেশ বিভাগে মালদহ জেলার পাঁচটি থানা পূর্ববাঙলার [অধুনা বাঙলাদেশ] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ভোলাহাট-শিবগঞ্জে ব্যাপকভাবে গম্ভীরার প্রচলন ছিল। দেশ বিভাগের পরে সেখানে গম্ভীরা নামটি আছে বটে, কিন্তু রূপ বদলেছে। সেখানে শিব ইত্যাদি চরিত্র নেই। 'নানা' কথাটির মধ্যে মুসলিম গন্ধ সন্দেহ নেই, গম্ভীরার শিবকে স্মৃতিতে রেখে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে 'নানা' সম্বোধন করে থাকে মুসলিম গম্ভীরা কবিরা। কিন্তু পূর্ববঙ্গে গম্ভীরাব জনপ্রিয়তা লোকসমাজের নিকটে ব্যাপক বলে মূলত হিন্দু চরিত্রটি মুসলিম চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

'নানা' মালদহে শিব, কিন্তু পূর্ববঙ্গে গ্রামের এক বর্ষীয়ান চাষী বা মোড়ল। এই নানার চাপদাড়ি আছে। নানা [পিতামহ] ও তার লাতিন [নাতি বা পৌত্র] এই দুটি চরিত্র সেখানে স্থান পায়। 'ডুয়েট' জাতীয় এই লোকনাট্য। নানা ও তার নাতির সংলাপের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের অবস্থা বিবৃত হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি থাকে। মালদহ অঞ্চলের মত রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। রাজসাহী রেডিও কেন্দ্র থেকে গম্ভীরা ওয়াহেদ রহমানের

পরিচালনায় বহুদিন প্রচারিত হয়ে এসেছে। ইংরেজ বাজার থেকে বাঙলাদেশে চলে গেছেন কবি মোহাম্মদ সোলেমান।

বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ পূর্ববঙ্গের গম্ভীরায় হয়নি বলে তার মনোরঞ্জনের ক্ষমতা বা নাট্যিক ক্ষমতা গৌড়বঙ্গের মালদহের গম্ভীরা থেকে অনেক কম একথা স্বীকার করতেই হয়।

গম্ভীরা সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ :

ক. শিব-বন্দনা : রচয়িতা—সতীশচন্দ্র গুপ্ত

ঐ দ্যাখ ন্যাংটা বুড়া সংটা সাজ্যা ঢংটা কোর্‌্যা আছে বোস্যা।
বুড়া আস্ত খ্যাপা ভস্‌ম ল্যাপ্যা বাঘের ছালটা পড়ছে খোস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

১. বুড়া যাঁড়ে চোড়্যা এ্যালো দোর্‌্যা গম্ভীরাতে পূজা খ্যাতে।
ঐ দ্যাখ লদ্‌বোদ্যা ঐ বাঁসুয়া বলদ আসছে রে ভাই ক্যামন শুঁষ্যা ॥.....
আছে বোস্যা

২. বুড়ার মাথায় ল্যাপ্‌টা আলাদ ভ্যাঁপ্‌টা জটে সাঁপটা ফোঁস ফোঁসাছে।
আবার মাইয়্যা একটা তাইয়া ক্যামন, ঢেউ খ্যালাছে আচ্ছা রোস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৩. ধুৎত্তরী তোর ধুৎরার ফুল কি সখ কোর্‌্যা কেউ দ্যায়রে কানে।
[আবার] হরদম্ মুখে বম্ বম্ বুলী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে কোস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৪. আবার ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভরৎ ভরৎ শিঙ্গা ডুম্বরু বাজাছে বোস্যা।
ঐ দ্যাখ বোমকেশ জটাজুটজালে আকাশে যে পড়ছে হাঁস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৫. আবার কপাল ফুট্যা আগুন ছুট্যা সারা দুনিয়া
গাঁজায় দম কি দিচ্ছেরে কম, কল্‌কীর ধুয়া ফেল্‌ছে চুষ্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৬. ঐ দ্যাখ দুদিকে দুটা হুলুকমুখা সিদ্ধি ঘুঁটছে তালে তালে।
আবার পালে পালে কচনী-বুচনী, ভাঙ ধুৎরা খাওয়্যার ঘোঁস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৭. দ্যাখেক ঝলর-মলর ঝুলছে ভাস, হাসের মালা ভরা গলা।
বুড়া তাল বেতালে নৃত্য করে রামনামে হোয়্যাঁ বেহুঁস্যা ॥.....
আছে বোস্যা

৮. ভেবে সতীশ বলে পদতলে, ভক্তি বলে জুড়েক আসন।
বুড়ার এমনি শাসন, যমের ভাষণ আসে না এখানে পোষ্যা॥.....
আছে বোস্যা

খ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী কল্যাণ পর্ষৎ সম্বন্ধে গ্রাম্য মহিলাদ্বয় কর্তৃক গম্ভীরাসঙ্গীত। রচয়িতা : ইন্দ্রদমন শেঠ।

[ওটে দিদিটে] সমাজ কল্যাণ পর্ষদ খুললে সবকারে।
উন্নত নারীসমাজ, বড়লোটে কাজ, সরবি না বেকারে॥

১. গান্ধীজীর মহান উপদেশ, কুটির শিল্প এলোটে দেশে।
[মোদের] দিতে দীক্ষা, কর্মশিক্ষা, পাঠিয়্যাছে লেভী মাস্টারে॥
২. সেদিন বল্যা গেল একজনে, পল্লী নারী কি কি শেখাবে তায়।
[শিখবে] চরকা কাটা, কাপড় ছাঁটা, কল সেলাই দুদিন পরে॥
৩. হাতের কাজ সূচীশিল্প, শিখব টে কোন করব টে গল্প।
[মোরা] শিক্ষা হলে যাব চলে, আপন সোনার সংসারে॥
৪. মহিলাদের লেখাপড়া, বিদ্যা শিক্ষা কাজের গোরা।
বিদ্যা বিনা কাজ চলবে না, স্বাধীনদেশের মাঝারে॥
৫. ছেলেমেয়েরা সঙ্গে যাবে, দুধ, বিস্কুট, খাবার পাবে।
দিদিমুনিরা, চুমার গোরা, সোহাগ দিবে সবারে॥
৬. খেলার যোগ্য মেয়ে যত, খেল্‌না দোলনা শিখবে কত।
ব্যায়াম শিখবে, আনন্দ পাবে, সুখী হবে পুরস্কারে।
৭. নারী মঙ্গল শিশুসদন, বলব কি যত আয়োজন।
কোন শ্রীমতী হলে পোয়াতী, ধাত্রী ঘুরবে দুয়ারে॥
৮. পোয়াতীদের ঔষধ দিবে, স্বাস্থ্য কথা জিজ্ঞাসিবে।
ভূমিষ্ঠ হলে যাবে চলে, কাটতে লাড় ঐ আগারে॥
৯. দেখবে ডাক্তার সপ্তাহে দুদিন, লাগবে না ফি জানিস্‌ বহিন।
বাড়ি যাবে দেখে আসবে, ঔষধ দিবে সরকারে॥
১০. দায়িনী নয় ধাত্রীমাতা, প্রসব হলেই যায় সে তথা।
তারে ছোয় সবাই, ছুৎমার্গ নাই, নব যুবধর্ম প্রচারে॥
১১. উচ্চ শিক্ষা নারী যারা, উচ্চ আসন পাবে তারা।
কেঁউ চাকরি পাবে, কেউ মন্ত্রী হবে, টাকা পাবে অর্থ ভাণ্ডারে॥

১২. বেকার গেলেই মোরা সুখী, রাখব সুখী খোকা-খুকী।
আনন্দ করে ভাত কাপড়ে সুখী হব সংসারে।।
১৩. রাষ্ট্রে হবে নারীর আসন সার, প্রমাণ বাঙলার নাইডু কর্ণধার।
সেদিন বুলবুলীতে, বড় জনসভাতে, শুন্‌নু হিন্দী লেক্‌চারে।।
১৪. ইন্দ্রদমন ভেবে বলে পড় না বুড়ার চরণ তলে।
[তিনি] যুগাবতার, তায় অবতার, আনলে নারী মাঝারে।।

গ. চার-ইয়ারি [১৯৬৭] : রচয়িতা : গোপীনাথ শেঠ

১. অজয় মুখার্জি [পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী]	এবার ফসল ভাল হবে সবাই খাবে সে দিনের আর বেশি দেরি নাই।
২. জ্যোতি বসু [পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী]	কৃষক-শ্রমিক সুখে থাকুক এইটিই দেখতে চাই।
৩. জাহাঙ্গীর কবীর [পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী]	ভারত ক্রান্তিদলে যোগ দাও সকলে।
৪. জনৈক বাঙালি	তোদের দলতন্ত্রই হল সার / দেশবাসী শুধু করলে হাহাকার / অষ্টমাসে অষ্টরম্ভা যুক্তফ্রন্টের উপহার।

১. বাঙলা কংগ্রেস করেছে অশেষ
দেশবাসীকে বাঁচাবার।
২. কর্মচারিদের বেতন আমার মতন
কেউ ছিল কি বাড়াবার?
৩. কমিউনিস্টদের জ্বালায় মোদের মন্ত্রী থাকা দায়।
৪. দলে দলে করিস বিবাদ গদী রাখবার তরে,
এই গদীর মোহ ছেড়ে মোদের দেখবি কি প্রকারে।
দুর্নীতিমুক্ত করবি শাসন দূর হবে প্রবলের শোষণ
এই আশাতেই দেশবাসী তাড়িয়েছিল সব কংগ্রেসী
আজ আটমাস পরে সত্য করে বল্‌তো কিবা ফলল ফল্
খাদ্য সমস্যা দিনে দিনে হয় প্রবল।

১. দেশবাসীর সেবা ছাড়া আর করবো কিবা
এই পরিণত বয়সে।
২. মজুতদারী ধনতন্ত্র খতম কোরবোই শেষে।

৩. মোদের দলের সারাদেশে শান্তি আনিবে।

৪. চোদ্দ দলেরই চোদ্দ দশা
বাঙালির আর নাইকো ভরসা।
খেতে পাবো ভাল থাকবো নির্মূল হল সব আশা।
অর্থমন্ত্রী দাঁড়িয়ে শূন্য অর্থভাণ্ডার নিয়ে
রাইটার্স বিল্ডিং বিক্রি হবে সরকারি দেনার দায়ে।
কর্মচারিরা পাবে না বেতন বেড়ে হল যন্ত্রণা
ঘেরাও লুটপাটও হল পুলিশ গুলিও চালালো
খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য অনবদ্য—অনাহারে মরে দেশ।
এদের দ্বারা হবে না পাপের শেষ।

ঘ. **ডুয়েট** : রচয়িতা · গোবিন্দলাল শেঠ
[ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম পাশপোর্ট প্রবর্তনে]

১.
মিঞা। বিবিজান, বিবিজান ওরে মেরি জান
ছমাস থেক্যা তোকে না দেখ্যা
ধরে না হামার প্রাণ।

২.
মিঞা পাঠিয়া দিয়্যা পাকিস্তানে তোকে।
বিবি। একলা বেশ ছিল্যা তো মনের সুখে।
মিঞা। কেন অভিমান করিস মিছে আর।
বিবি। এত দেরি কেন আসতে তোমার।
মিঞা। তুই পারবি না বুঝতে পাশপোর্ট করতে।
[হয়েছি] হালাক্কান কত পেরেশান।

৩.
বিবি। কই দেখাও তোমার পাশপোর্ট
মিঞা। এই দ্যাখ কেমন সুন্দর তুলেছি ফটোক।
মিঞা। তারপর পাকিস্তানের খবর কেমন?
বিবি। সিন্ধী, পাঞ্জাবীদের হাতেই শাসন।
মিঞা। কেন বাঙালি যে বেশি সংখ্যায়।
বিবি। গুতাগুতি সদাই গদির আশায়

আরবী হরফে লেখ বাংলা ভাষা
[এখানে] পচ্ছ্যাদের আঁকারী বিধান।

৪.

মিঞা। এই পাশপোর্ট ভিসার ঠ্যালা।
বিবি। অনেকের মোদের মতো বিরহ জ্বালা।
মিঞা। কি ভারত কি পাকিস্তানবাসী।
বিবি। মুটে মজুর মধ্যবিত্ত চাষী।
মিঞা। এই পাশপোর্ট তাদের হয়েছে বিষফোট।
[সকলে] চাই অচিরে এর অবসান।

শব্দার্থ : বোস্যা—বসিয়া। ভষম—ভস্ম, ছাই। লদ্‌বোদ্যা—মোটাসোটা। বাঁসুয়া—বাহন। গুঁষ্যা—তেড়ে আসা। আলাদ—বিষধর সাপ। ভাঁসটা—শিবের হাতে-পায়ে যে-সব সাপ থাকে তারা স্বভাবত ঠাণ্ডা, কারো অনিষ্ট করে না। রোস্যা—জোরে, রোষের সঙ্গে। কচনী-বুচনী—সাঙ্গোপাঙ্গ। ওটে—ওরে। পচ্ছাদের—পশ্চিমিদের। আঁকারী—জবরদস্তি।

—

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য · 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [৩ সং] : পৃ. ১০৯।
২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' . পৃ. ৭৭০।
৩. হরিদাস পালিত · 'আদ্যের গম্ভীরা'।
৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।
৫. বিনয় ঘোষ · 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' : পৃ. ৪৮।
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্যে উপজাতির প্রভাব' · 'সাহিত্য মেলা', পৃ ১৪-১৫।
৭. ঐ : 'গম্ভীরা কত পুরানো'? ইনস্টিটিউট অব ফোক কালচার, মালদহ পুস্তিকা, ১৯৮১।
৮. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' : পৃ. ৬৫৫।
৯. দ্রষ্টব্য ৩নং পাদটীকার গ্রন্থ, পৃ. ১১।

□

গ্রামীণ লোকনাটক : লেটো

মহম্মদ আয়ুব হোসেন

'লেটোগান' বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার অন্যতম উপশাখা। একদা এই লেটোগান বঙ্গভূমির বর্ধমান-বীরভূম-হুগলী-হাওড়া-মেদিনীপুর-মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জুড়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। গ্রামে, গঞ্জে, মেলায়, পুকুরের প্রশস্ত পাড়ে, গোয়ালঘরের পাশে, ধান ঝাড়া হয় যে খামারে সেখানে মহা উৎসাহের সঙ্গে এই পালা-গানের অনুষ্ঠান হত। গাওনার পর, কিশোর-বালক-যুবা-রাখাল-মুনিষের মুখোমুখি এ-গানের দু-একটা কলি বা 'ছকে'র সংলাপ ফিরতো, এমনকি গ্রাম্য মুসলিম মেয়েদের একটি শ্রেণী মুসলিম বিয়ের গানের আসরে মেয়েলি সুরে দু-একটি গান যেমন গাইতো তেমনি হিন্দু সমাজের মুচি-বাগ্‌দি-বাউরীদের মেয়েরা মাঠ-পুকুরে নদী-বন্দরে মাছ-গুগলি ধরতে গিয়ে সুর করে এ-গান গাইতো। বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-হুগলী-নদীয়ার মুসলিম গ্রামগুলিতে এ-গানের দু-একজন শিল্পীকে এবং বেশির ভাগ গ্রামে একটা না একটা গানের দলকে খুঁজে পাওয়া যেত। সাধারণ গ্রাম্য মানুষেরা [হিন্দু-মুসলিম] এ-গান আগ্রহভরে শুনতো। আজ আর এর সেই জৌলুস নেই। মূল গানের ধারা হারিয়ে গিয়েছে। স্থানে স্থানে ক্ষীণ ধারায় 'আলকাপ', 'পঞ্চরসে' এর কিছু অবশিষ্ট আছে।

['লেটো' শব্দের ব্যাখ্যা] :

'লেটো' গান এই নাম গ্রাম বাঙলায় বহুল প্রচলিত। গ্রাম্য মানুষেরা কেউ বলেন 'লেটো' আবার কেউ বলেন 'লোটো'। লেটো শব্দের ভাব-অর্থ, আমি যা বুঝেছি—তা হল গ্রাম্য পরিবেশে হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতনাট্যের অভিনয়।

'নাটক' শব্দ সংস্কৃত 'নট' ধাতু থেকে আগত। নাটক শব্দের তদ্ভব রূপ 'নাটুয়া'। গ্রামবাঙলায় মুসলিম বিয়ের গানের মহিলা শিল্পীদের মেয়েলি গানে শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায় :

'ওরে নব নটুয়া,
বিয়ে করলে যাবে নব নটুয়া,
ঘোড়ায় চেপে যাবে নব নটুয়া।'

গ্রাম্য প্রবচনে। মহিলাকণ্ঠে। : 'থাক থাক কলা নেটে,
দিন পাইতো দুবো ঘেটে।'

এই তদ্ভব 'নাটুয়া' থেকেই 'লেটো' শব্দের উদ্ভব। নাটুয়া > লাটুয়া > লটুয়া > লটোআ > লেটো আ > লেটো। লেটো শব্দের মূল অর্থ হল 'নড়া চড়া' বা 'অঙ্গ-চালনা'। এই লেটোগানেও নড়াচড়া এবং অঙ্গচালনা করে অভিনয় করা হয়। তাই বলা যেতে পারে 'নাটক'-এর বিকৃত তদ্ভব রূপ 'লেটো'।[১]

[উদ্ভব ও বিকাশ] :

অতি প্রাচীনকালে যাযাবর গোপালক বা পশুপালকদেব একটা অংশ সূর্যের অয়ন গতি দেখে নদনদীর তীরে তীরে বসতি স্থাপন করে বিকাশ ঘটিয়েছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতার। বঙ্গভূমির অজয়-কুনুর-কোপাই ও নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় ঐ একইভাবে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বসতি স্থাপনের পর কৃষি ও তৎ-আনুষঙ্গিক কাজে ব্যাপৃত থাকলেও চিত্ত বিনোদনের জন্য তাদের একটা দল নৃত্যগীত ও অঙ্গভঙ্গি করে সাজসজ্জাসহ অভিনয় করতো। তাদের জীবনচর্যার ঘটনাবলী ছিল এ-সবের বিষয়বস্তু। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইসব নাটকর্ম ধীরে ধীরে পরিশীলিত হয়ে এক নবরূপ পরিগ্রহ করে।

ঋগ্বেদের কোনো কোনো সূক্তে নাটকেব বীজ আছে। অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডে এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটকল্প ব্রাত্যের দিগ্বিজয় যাত্রা প্রসঙ্গে কয়েকজন পার্শ্বচবের মধ্যে দুইজন বিশেষ পার্শ্বচর 'পুংশ্চলী' ও 'মাগধে'র উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে 'পুংশ্চলী' নারী এবং ''মাগধ'' পুরুষ। উক্ত অথর্ববেদে 'পুংশ্চলী' উৎপ্রেক্ষা আছে ইরা, ঊষা ও বিদ্যুৎ আর 'মাগধে'র উৎপ্রেক্ষা আছে হস, মন্ত্র, ও স্তনয়িত্নু ইত্যাদি। এ-থেকে জানা যায় যে পুংশ্চলী নৃত্য-গীত পটিয়সী নটী এবং মাগধ নট ও বাদ্যকার—গল্প কথক। এরা উভয়ে যুদ্ধাবসরে সম্রাটকল্প ব্রাত্যকে নৃত্য-গীত-অভিনয় দেখিয়ে মনোরঞ্জন করতো। অর্থাৎ এইসব নট-নটীরা তাদের অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য রাজদরবারে আশ্রয় পেয়েছিল।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গভূমিতে, গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য-মানুষদের মধ্যে এ-সবের অনুশীলন ও প্রচার হয়। মৌর্য রাজত্বকালে রাজপুরুষদের মধ্যে 'বিহার যাত্রা'র উল্লেখ আছে। ভেরী-ঘোষ সহকারে বিহার যাত্রা করা হত। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজপুরুষেরা কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে

বহির্গত হয়ে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যেত। এই যাত্রাকালে দলে থাকতো বাহনের জন্য রথ, হাতি, মালবাহী পশু, রন্ধনের জন্য রন্ধনকারী, রথের ঘোড়া, মালবাহী পশুর জন্য চালক ও খাদ্যদানকারী, থাকতো সেবক, মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের জন্য থাকতো নৃত্য-গীত পটিয়সী নারী ও পুরুষ, নট-নটী এবং মৃগয়ার সরঞ্জামাদি। এই দল যাত্রাপথে মাঝে মাঝে কোনো জনবহুল স্থানে শিবির স্থাপন করতো। সন্ধ্যায় তাদের উপযোগী নৃত্য-গীতের আসব বসতো। নট-নটীরা সাজসজ্জা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক অভিনয় করতো। সাধারণ প্রজাসহ রাজপুরুষগণ তা উপভোগ করতেন। সম্রাট অশোক এই 'বিহার যাত্রা'র পরিবর্তে 'ধর্মযাত্রা'র প্রবর্তন করলেও তার মধ্যে নৃত্য-গীতের ধারা বজায় ছিল। এ-প্রসঙ্গে অশোকের শিলালিপির থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হল : 'But now [twelveth year of his coronation] in consequence of the practice of Dharma on the part of the king Devanampriya Priyadarshin, the sound of drums has become the sound of Dharma, showing the people representations of aerial chariots, representations elephants, masser of fire and other divine figures'.[২]

এখানে উড়ন্ত রথ, হাতির মিছিল, আগুনের খেলা এবং দিব্যরূপ দেখানো হত। এই দিব্যরূপ ছিল বিচিত্র সজ্জার নটভঙ্গি। বৌদ্ধদেবতাদের কার্যকলাপ নটভঙ্গির মধ্য দিয়ে দেখানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়, সাধারণ মানুষকে এ-সব দেখানো হত।

জনসাধারণের মধ্যেও এই গ্রাম্য নাট্যরীতির প্রচলন ছিল বলেই এই নটভঙ্গি দেখানো হত। তারপরও এই গ্রাম্য নাট্যরীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমপর্যায়ে চলে এসেছে। হজরত মহম্মদের [তাঁর ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক] ইসলাম ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা এদেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে বৌদ্ধদের মধ্যে ইসলামধর্মের প্রচার ঘটেছিল। যদিও ইসলামধর্মে নৃত্যগীত অভিনয় নিষিদ্ধ, তবু নব-ধর্মগ্রহণকারী এদেশের মানুষরা স্বদেশের গ্রাম্য নাট্যরীতিকে পরিত্যাগ না করে নিজেদের মধ্যে সজীব রেখে লালিত করেছিল। এ-প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য : 'দু-হাজার আড়াই হাজার বছর ধরে যে বিশিষ্ট নাট্যরীতি আমাদের দেশে সাধারণ জনগণের—রাজ-পণ্ডিত, ধনীর নয়—চিত্তবিনোদন করে এসেছে তা

কালবশে ক্ষীণধারা ও লুপ্তপ্রায় হয়েও অদ্যাবধি প্রধানত মুসলমান নাটুয়াদেব দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে। এই হল বর্ধমান-বীরভূম-হুগলী জেলার শিক্ষিত জননিন্দিত 'নেটো' বা 'লেটো'। 'নেটো'র গান বা নাচ—যাই বলুন—এই হল প্রাচীন ভারতবর্ষের নাটকের—অর্থাৎ নটকর্মের—সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচিত নাটকের নয়—সাক্ষাৎ বংশধর, তবে কালান্তর ক্রমে যথোপযুক্ত রূপান্তর প্রাপ্ত'।[৩]

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই প্রাচীন গ্রাম্য নাট্যরীতি তথা 'নেটোগান' বর্তমান শতাব্দীর পাঁচের দশক পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চালু ছিল। তাবপর গ্রামস্তরে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে এর ক্রমাবনতি ঘটে। জমিদারী প্রথা বিলোপও এর অন্যতম কারণ। বর্তমানে বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদে ক্ষীণভাবে এর প্রচলন রয়েছে।

[লেটোগানের বায়না] :

কয়েক দশক আগে এবং বর্তমানেও লেটোগানের গাওনার জন্য যেখানে গান হবে, সেখানকার উৎসাহী ব্যক্তি লেটোর দলের পরিচালক, ম্যানেজার প্রমুখের সঙ্গে ক-রাত গান হবে, তা বলে প্রতিরাতে গানের দক্ষিণা, ইত্যাদি ঠিক করে নিয়ে কোন্ তারিখে, কোন্ স্থানে, কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে সব বলে দিয়ে অগ্রিম কিছু বায়নাস্বরূপ টাকা দিয়ে যায়। তখন এই দলের কাছে ঐ একই দিনে গাওনার জন্য অন্য কোনো লোক এলে আব বায়না নেয় না। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ঐ লেটোগানের দল সেখানে হাজির হযে গাওনা করে। কয়েক দশক আগেও পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বাঁকুড়াতে ভালো ভালো লেটো গানের দল ছিল।

[অনুষ্ঠানের সময়] :

লেটোগানের অনুষ্ঠানের সময়কে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন মেলায় লেটোর অনুষ্ঠান হত বা আজো হয়। এদেশের মেলা ইত্যাদি শীতের সময় বেশি বসে। আর গ্রাম্য মেলায় চলে এই গান।

দ্বিতীয়ত লেটোগানের মূল অনুষ্ঠান বা অভিনয় শুরু হয় সন্ধ্যার পর—একটু রাত হলে। গান চলে ভোর পর্যন্ত। পূর্বে এই গান চলতো সারারাত এবং পরের দিনের বিকাল পর্যন্ত। তখন গান চলতো পাল্লা দিয়ে। বর্তমানে রাতেই এ গান হয়। দিনে খুব একটা হয় না।

[অনুষ্ঠান] :
পূর্বে ছোট বড় মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল লেটোগান। যে-কোনো মেলা বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে একবার বসে। কেটে নেওয়া ধানের জমিতে মেলা বসাতেন স্থানীয় গ্রাম্য জমিদারগণ। কোনো বৈষ্ণব সাধক বা পীরের স্মরণোৎসব উপলক্ষেও মেলা বসতো বা আজও বসে। জমিদারদের বসানো অনেক শখের মেলা জমিদারীপ্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে। আগের এইসব মেলাতে তোড়জোড় করে লেটোগান হত। প্রথমত, মেলাতলার মধ্যস্থলে হাজার পাঁচ-ছয় লোক বসতে পারে এমন বড় একটা সুন্দর শামিয়ানা টাঙানো হত। শামিয়ানার মধ্যস্থলটি কোদাল দিয়ে চেঁচে-ছুলে পরিষ্কার করে দেওয়া হত। এটা হত গানের আসর। তারপর তার ওপর চট পেতে দেওয়া হত। আসরকে চারদিকে ঘিরে বসতো দর্শক-শ্রোতার দল। তারা আসতো আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। আসরের সামান্য দূরে শামিয়ানার নিচে রূপোর তৈরি দু-তিনটে মেডেল [পদক] ঝুলিয়ে দিতেন জমিদারবাবু। সেই সঙ্গে আসরের ওপরে চারদিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হত এক সের ওজনের রসালো 'কাংনী জিলাপি'। পাল্লা দেওয়া লেটোগানের দু-দলের যে দল জিতবে তারা পাবে মেডেল। যাদের হার হবে তারা পাবে 'কাংনী জিলাপি'। আসরের ঠিক ওপরে এবং চারপাশে জ্বালানো হত পেট্রোম্যাক্স আলো।

আসরের সামান্য দূরে, মেঠো জমির ওপর বাঁশ ও আঁটি-খড় দিয়ে তৈরি করা হত অস্থায়ী সাজঘর। এই ঘরের দু-ধারে থাকতো দু-দল লেটো-শিল্পী। কিংবা দুই দল লেটোশিল্পীদের জন্য দুটো আলাদা অস্থায়ী ঘর তৈরি করে দিত কর্তৃপক্ষ। আসরে দর্শকদের গা-ঘেঁষে অর্ধচন্দ্রাকারে বসতো যন্ত্রশিল্পীরা। আসর এবং অস্থায়ী ঘরের মধ্যে একটা সরু পথ রাখা হত, যাতে লেটোদলের কুশীলবেরা এই পথ দিয়ে অস্থায়ী ঘর থেকে আসরে যেতো ও ফিরে আসতো। তারপর শুরু হত মূল অনুষ্ঠান।

[কুশীলবদের নাম] :
লেটোগানের দলে পূর্বে যেসব কুশীলব অভিনয় করতো এবং বর্তমানে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের একটা করে নাম আছে। যেসব কিশোর যুবা শাড়ি পরে মেয়ে সেজে আসরে এসে বন্দনা গান সহ অন্যান্য যৌথ ও একক গান গায় তাদের নাম 'সখী', 'বাই' ও 'ছোকরা'। দলে ভাঁড়

ধরনের একজন হাস্যরসের তুফান তুলে অভিনয় করে। অভিনয়কালে তার চলাফেরা এমনকি তাকে দেখলেই দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে। এই শ্রেণীর অভিনেতার নাম 'সংদার' বা 'সঙ্গাল'। দলে এক একটা কিশোরকে ট্রেনিং দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হত যে সে কিশোর বা কিশোরী সেজে অভিনয়কালে এমন এমন সংলাপ বলতো তা যেন হুল ফোটানোর মতো. এই শ্রেণীর কিশোর অভিনেতাকে বলা হয় 'বেঙাচি'। এই বেঙাচিরা পরবর্তীকালে ভাল লেটো শিল্পী হত, হত সংদার। বর্তমানে লেটো দলে আর বেঙাচি নেই। লেটোগানের শেষে যে বড় পালা হয়, তার মধ্যে একজন 'বিবেক' থাকে। সংকট বা বিপদকালে সে এসে বিবেকের গান গায়।

লেটোগানের দলের কোনো কোনো বিশেষ শিল্পী মেয়ে সেজে |'বাই'| এমনভাবে নাচ-গান-অভিনয়নৈপুণ্য দেখাত যে, সে দর্শক-শ্রোতার কাছে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সংদার ও একক পুরুষ বা ছক অভিনয়ের ভূমিকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। কেউ কেউ রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি এবং খলের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। লেটোর দলগুলি গাওনায় যাবার সময় দলের সুনাম বৃদ্ধির জন্য ঐসব প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের বিশেষ মজুরি দিয়ে অস্থায়ীভাবে নিয়ে আসে। গাওনায় আসার পূর্বে ঐ লেটো দল কর্তৃপক্ষদের বলে দেয়, তাদের দলে অমুক স্থানের অমুক শিল্পী গাওনা করতে আসবে। কর্তৃপক্ষ গ্রামে এই কথা প্রচার করে। অস্থায়ীভাবে আগত শিল্পীদের বলা হত 'আসামী'। প্রতি দলে লোকশিল্পীদের সাজসজ্জা করানোর জন্য থাকে 'পেন্টার'। এছাড়া এ-দলে থাকে 'আগলদার', 'ম্যানেজার' এবং গানের 'মাস্টার'। দলের মাস্টারকে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকে।

[পোশাক] :

লেটোদলের শিল্পীদের সাজসজ্জার জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের পোশাক। এইসব পোশাকগুলি হল শাড়ি, ধুতি, জামা, ব্লাউজ, সায়া, রাজা, রানী, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সেনাপতির পোশাক। রয়েল ড্রেস. নকল চুল, নকল স্তন, নকল ঢাল-তলোয়ার, খাঁড়া, খঞ্জর, মুকুট, পাগড়ি, তীর-ধনুক, বর্শা, লাঠি. বিবিধ প্রকারের রং, নকল চুড়ি, হার, নথ, নোলক, সিঁথে পাটি, বাজু, নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের নকল গহনা। স্নো, পাউডার, রুজ, হিমানী, টিপ, সিঁদুর. আলতা, বিবিধ জন্তু ও রাক্ষস ইত্যাদির

মুখোস সাজসজ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়। এইসব সাজপোশাকের কোনো কোনোটি কিনে আনা হয় বা কোনো দল ভাড়া করে আনে।

[বাদ্যযন্ত্র] :

লেটোগান ও অভিনয়ের জন্য অনুষঙ্গরূপে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হল হাবমোনিয়াম, বাঁয়াতবলা, ডুগি, সাইড-ড্রাম, জুড়ি, বড় এবং ছোট ঝাঁঝ ডুবকি, ফ্লুটবাঁশি, বাঁশের বাঁশি, বঙ্গ, হাতঢোল বা ঢোলক, বেহালা, সারিন্দা, কর্নেট-করতাল, খঞ্জনী এবং ঘুঙুর ইত্যাদি। এই বাজনদারদের নামও আছে, যথা তবলচি, বাঁশিদার জুড়িদার, ঢোলকবাদক, হারমোনিবাদক, ফ্লুটওয়ালা ও কর্নেটওয়ালা প্রমুখ।

[লেটোগানের কুশীলব] :

লেটোগানের কুশীলবদের সকলেই বঙ্গভূমিব মাটি ঘেঁষা মানুষ। চাষী, মজদুর, রাখাল, ক্বচিৎ ভদ্র ঘরের দু-একজন। এই শিল্পীদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ নিবক্ষর, কিন্তু নাচে গানে তারা সুপটু। এদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলিম। তবে ইদানিংকালে হিন্দু সমাজের বহু ছেলে এ-গানের শিল্পী হচ্ছে। এখন মুচি, বাগদি, ডোম, বাউরি, কোটাল ও ক্বচিৎ দু-একজন আদিবাসী সাঁওতাল এই দলে শিল্পীরূপে কাজ করে থাকে।

দিনের বেলায় এরা কেউ রাখাল, কেউ চাষী-মজুর, কেউ মাটিকাটা-মজুর ইত্যাদির কাজ করে এবং কাজ শেষে সন্ধ্যারাতে মাস্টার-ম্যানেজারসহ নিজেদেব ডেরায় অভিনয় ও গান শিক্ষার অনুশীলন করে। অনুশীলন চলে, বারোয়ারী দলিজে, গোয়ালঘরের সামনের পড়চালীতে, খামার বাড়িতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেটো অনুরাগী মুসলিম চাষী-ভদ্রজনের পরিত্যক্ত ঘরে। লেটোগানের মাস্টার সুরসহ গান ও অভিনয় কেমন করে গাইতে ও করতে হবে তা দেখিয়ে দেন।

এই শিল্পীরা কাজের জন্য মাঠে গিয়ে গরু-ছাগল চরানো এবং অন্যকাজের ফাঁকে গান মুখস্থ ও অভিনয় অনুশীলন করে। বিশেষ করে রাখাল শিল্পীরা খোলামাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে রাতে শেখা গান ও ছকের সংলাপের অভিনয় অনুশীলন করে থাকে। এইভাবে খোলামাঠে নীল আকাশের নিচে সূর্যালোকে চলতো তাদের গান ও অভিনয় শিক্ষার অনুশীলন। এখন আর এভাবে অনুশীলন হয় না।

মুসলিম সমাজের দু-একজন অর্ধ-শিক্ষিত রুচিশীল যুবা ও প্রৌঢ় লেটোগানের অনুরাগে এইসব শিল্পীদের নিয়ে দল গঠন করে, আর খরচও করে। দলের অনুশীলন কাজে মাস্টারের মজুরী ও খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা সেই করে। আবার গাওনার সময় দলের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে ও মেলায় যায়, কিংবা প্রতিনিধি করে কাউকে পাঠায়। তখনকার দিনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মুসলিম যুবা কিংবা ম্যাট্রিক ফেল যুবক চাষাবাদ করতে চাইতো না। চাকরিও পেতো না। তারা তখন শখ করে লেটোর দলে এসে রাজা, রাজপুত্র, জমিদার ও অন্যান্য ভালো ভালো ভূমিকা অভিনয় করতো। লেটোগানের কুশীলবেরা আসলে গ্রামবাঙলার মাটির মানুষ।

[আসর ও তার পরিচালনা] :

লেটোগানের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে গান শুরুর প্রাক্-প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। এখন আসরে কিভাবে গাওনা হয়, তার পরিচালনার কথা বলবো। লেটোগানের শিল্পী, মাস্টার, পরিচালক সকলের মধ্যে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। সেই অস্থায়ী সাজঘরে শিল্পীরা জমায়েত হলে, প্রথমে হুইসিল বাজিয়ে একটা সংকেত দেওয়া হয়। শিল্পীদের কেউ বাইরে থাকলে চলে আসে সাজঘরে। তারপর কয়েক মিনিট পর দ্বিতীয় সংকেতের হুইসিল বাজানো হয়। শুরু হয় সাজসজ্জা। পেন্টার, মাস্টার ও শিল্পীরা সাজগোজ শুরু করে। এই সময় চা-বিস্কুট পান বিড়ি ইত্যাদি খেয়ে নেয় কেউ কেউ। সাজসজ্জা শেষ হলে দেওয়া হয় তৃতীয় সংকেতের হুইসিল। এই সময় বাদ্যকারগণ নিজ নিজ যন্ত্র নিয়ে চলে যায় আসরে। দর্শকদের গা-ঘেঁষে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বসে পড়ে তারা। গুছিয়ে বসার পর পরিচালকের সংকেত অনুসারে এই বাদ্যযন্ত্র বাদকগণ এক সঙ্গে কনসার্ট বাজায়। সাজঘবে একজন থাকে—যার সঙ্গে পরিচালক এবং মাস্টার আলোচনা করে গানের 'ছক' সাজায় : তারপর পরিচালক আবার হুইসেল বাজায়। সাজঘরে থেকে কুশীলবেরা এক একে আসরে এসে শুরু করে গান।

প্রথমে আসে চারজন 'সখী' বর্গাকারে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে দর্শকদের প্রণাম করে তারপর শুরু করে নেচে নেচে বন্দনা গায়।

সরস্বতী বন্দনা :

১. [*তাল একতাল ভৈরবী*]

প্রভাতে কুসুম ডালা করে।

এনেছি তোমার তরে ॥
মন্দিরে জাগো দেবতা,
ঘুমাও না বারে বারে ॥
পূজায় যদি হয়ে থাকে ভুল,
তবে কেন হে দেবতা, নিদ্রায় মগন
হে পাষাণ দিলে না দেখা
আমাব অশ্রুনীবে ॥

২. **[আল্লা বন্দনা ॥ তাল : একতাল ভৈরবী]**
মব্ফ্ [মহব্বত] কর আল্লাতালা
আসিয়া আসরে ॥
রসুলুল্লা পাক পক্কাতন
সবার খাতিরে ॥
আলীয়া [আউলিয়া], আম্বিয়া আদম,
তাঁদের কাছে এই নিবেদন,
দিবেন আমায় রাঙা চরণ,
এই অধমের শিরে ॥
ফতেমা জননী মাতা
এমন মাতা পাবে কোথা,
আল্লা বলেছে মাগো
সে যে নিরাকার।

সখীদের বন্দনা গান শেষ হলে তারা সাজঘরে ফিরে যায়। পরিচালক হুইসেল বাজালে আসরে আসে একজন 'বাই'। নেচে নেচে এককভাবে সে গান গায়। এই শ্রেণীর একটি গান :

সে কেন আমারে মজাইল সই।
আমি যে তার বিয়ে করা বৌ যে না হই ॥
আমি লো সই পর নারী,
আমি থাকি পরের বাড়ি,
বাঁশীর সুরে সে কে ডাকে মোরে সই ॥*

* এই গানটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বয়ঃসন্ধিকালের রচনা— এমন কথা লেটো শিল্পীরা আমাকে জানিয়েছেন। —লেখক

গান শেষে 'বাই'রা সাজঘরে চলে যায়। পরিচালক আবার হুইসিল বাজালে আসরে চলে আসে ডুয়েট গানের শিল্পী। এরা একজন নারী একজন পুরুষ সেজে আসরে এসে শুরু করে গান :

দ্বৈতকণ্ঠে : ওলো, বাঙলা দেশের রঙলা ছবি আমরা দুই জনা ॥ ধুয়া
স্ত্রী : কাঁধে বাঁক্ ছাদন দড়ি তাও তো তোমার ঘুচল না ॥
দ্বৈতকণ্ঠে : ওলো, বাঙলা দেশের রঙলা ছবি আমরা দুই জনা।
স্ত্রী : তোর কপালে তেঁতুল গুলে,
আমি যাবো কাশী চলে,
পুং : শালীকে ধরবো গিয়ে
হাওড়ার পুলে,
যেতে দিব না ॥
দ্বৈতকণ্ঠে : ওলো, বাঙলা দেশের রঙলা ছবি আমরা দুই জনা ॥
স্ত্রী : হ্যাদেরে গয়লা বেটা,
তোর কপালে মারবো ঝাঁটা,
পুং : আমি লো তোর ধর্মের পাঁটা
বলি দিও না ॥
দ্বৈতকণ্ঠে : বাঙলা দেশের রঙলা ছবি আমরা দুই জনা ॥

পরিচালকের সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে এরপর আসরে আসে 'একক' গায়ক। একজন পুরুষ বিচিত্র সজ্জায় সেজে এসে নেচে নেচে একক গান ধরে :

আমি করবো না আর বিয়ে ॥ ধুয়া
আমার বিয়ের শখ মিটেছে
দাদার বিয়ে দিয়ে।
আমি করবো না আর বিয়ে ॥
একালকার যত নারী,
মুখ লয় সব তৈলো হাঁড়ি

[উপরের এই কলিটা গাওয়ার পর শিল্পী দর্শকদের দিয়ে চেয়ে এই সংলাপ বলবে : 'কি বলছে?']

[আবার] আলতা সিঁদুর পরছে তারা
বাক্‌সো বাঁধা দিয়ে ॥
দাদারা সব সইতে পারে,
একটা ছাড়া দশটা করে,

আমি বাবা রোগা ছাগল,
পালাই বাগান দিয়ে ॥
বিয়ে করে কত মজা,
জানে সেই দাদা শালা,
কেমন বক্‌শিশ পাচ্ছে দাদা
ঝাঁটা পিটা দিয়ে ॥*

[শিল্পীর সাজঘর গমন]

তারপর যথারীতি বাঁশির সংকেত। এরপর শুরু 'ছক' বা 'সং'। ছক বা সং হাস্যরসযুক্ত অতি ক্ষুদ্র নাটক। নিচে একটি ছোট 'ছক' উদ্ধৃত হলো।

এক. সতী

[পাত্র-পাত্রী : স্বামী, স্ত্রী, স্ত্রীর কয়েকজন প্রেমিক ও ভ্রষ্ট কাজের দূতী]

[এক যুবতী নারীর স্বামী বিদেশে গিয়েছে কাজ করতে। অনেকদিন আসেনি। তার অনুপস্থিতিতে ঐ নারী পাড়ার কিছু ভ্রষ্ট যুবকদের নিয়ে প্রতি রাতে কেলি করে।

স্থান : ঐ নারীর বাড়ি, নারীটি সেজে-গুজে বসে গ্লাসে মদ ঢালছে, যুবকরা খাচ্ছে। যুবকদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সে বারবার মেয়েটির গায়ে নিজের গা লাগাচ্ছে আর বলছে আমার খুব নেশা হয়েছে। এদিকে রাতে তার স্বামী এসেছে, এসে খিল আঁটা বার দুয়ারে ডাকছে।]

স্বামী : ও গো বাড়িতে আছো, দুয়ার খোলো।

স্ত্রী : কে গো তুমি এত রাতে, আমার কর্তা বাড়ি নাই।

স্বামী : আমিই গো তোমার কর্তা। চাকরি করে বাড়ি এলাম।

স্ত্রী : ও মা তাই নাকি। তা দাঁড়াও দরজায় কুলুপ দিয়া আছে। ছুরান কাটি আর আলোটা আনি, ভালো করে দেখবো, তারপর ঢুকতে দিব।

[স্ত্রী তখন যুবকদের বলছে, ও ভাই তোমরা পালাও বার দরজায় আমার স্বামী এসেছে।]

এই কথা শুনে সেই ছোকরাটা বলছে : বাবারে আমার নেশা ছুটে গেছে। স্ত্রী যুবকদের বলল, আমি একটু দুয়ার খুলতে দেরি করবো, তোমরা পাঁচিল টপকিয়ে পালাবে।

[আলো আর ছুরান কাটি হাতে স্ত্রী এসে কুলুপ খুলছে।]

---

* এটিও কবি কাজী নজরুলের ইসলামের রচনা,—মনে করেন শিল্পীরা।

স্ত্রী : কুলুপটা খুলতে চাইছে না। আঃ মল যা।

কুলুপ খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল পেতে বলছে

: কই কি এনেছো দাও।

স্বামী : হ্যালো খান্‌কি, আমি সেই কখন থেকে দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছি, আব তুই নাংদের নিয়ে মজলিস বসিয়ে এখন বলছিস্ কি এনেছো দাও।

[দু-ঘা মার]

স্ত্রী : ও গো আমি একা থাকি। আমাকে একা পেয়ে চোরেবা এসে আমাব উসারায় বসে মদ খায়। আমি তার কি করবো।

স্বামী : যা তু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। এই বলে বাড়ি থেকে বার করে দিল।

[স্ত্রী তখন বারদরজার পাশে বসে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে]

স্ত্রী : ও মাগো আমাকে বাত দুপুরে তাড়িয়ে দিলে গো।

: ও মাগো, আমার কি হবে গো।

এই সময় একজন মেয়ে এসে দেখে সে কাঁদছে, সে তখন আস্তে আস্তে বলছে : অমুকবাবু এই টাকা দিয়েছে, একবার তার কাছে যেতে হবে।

স্ত্রী : আমার স্বামী এসেছে, বাড়ির বার করে দিয়েছে। আমি কাঁদছি, কিভাবে যাবো—

দূতী : আমি তুর হয়ে কাঁদবো, কাজ সারা হলে তুই এসে কাঁদবি।

[দূতী কাঁদতে বসল, স্ত্রী চলে গেল সেই বাবুর বাড়ি]

স্বামী : কাঁদনের স্বরটা কেমন আলাদা লাগছে। তা হবে কেঁদে কেঁদে মাগির গলা খারাপ হয়ে গেছে। [একথা বলছে বাড়ির মধ্যে থেকে] মাগি পাক্কা ঢেমুন, ওর নাকটা কেটে দিই। [তারপর ছুরি দিয়ে ঐ কান্নারত দূতীর নাকটা কেটে দিল ও বাড়ির ভেতরে চলে গেল।] যেমন কর্ম তেমনি ফল।

[কিছুক্ষণ পর বাবুর বাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে দেখে দূতীর নাক কাটা। কি আর হবে, নাক কাটা নিয়েই সে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। স্ত্রী আবার কাঁদতে বসল।]

স্ত্রী : ও মাগো বিনা দোষে আমার নাক কেটে দিলে গো। নাকে আমার রক্ত পড়ল গো। আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, তাহলে আমার কাটা নাক যেন জুড়া লেগে যায় গো।

[স্বামী একথা শুনে বাইরে এসে দর্শকদেব উদ্দেশ্য করে বলছে]

স্বামী : খান্‌কি মাগি, সে বলে কিনা, তার কাটা নাক জুড়া লেগে গিয়েছে।

স্ত্রী : ও মড়িপোড়া মিন্‌সে আমার নাকে হাত দিয়ে দেখ রে।

[স্বামী তখন স্ত্রীর নাকে হাত দিয়ে দেখে কাটা নাক জুড়া লেগে গেছে, কাটার কোন চিহ্ন নাই। নাকে হাত দিয়ে ধরে টেনে টেনে দেখতে থাকে।]

স্বামী : হ্যাঁ মশায় সতীই বটে, কাটা নাক জুড়া লেগে গিয়েছে। ঘাট হয়েছে আমার, চ তু ঘরে চ।

[সমাপ্ত]

লেটোগানের এই শ্রেণীর প্রচুর 'ছক' গ্রাম-বাঙলার প্রবীণ লেটো-শিল্পীদের কণ্ঠে আছে। আমি 'বৌ-এর বিয়ে', 'আজব বিয়ে', 'অপূর্ব বিচার' এবং 'জেলে-জেলেনী' ইত্যাদি কিছু 'ছক' সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে 'বৌ-এর বিয়ে', 'আজব বিয়ে' এবং 'জেলে-জেলেনী'-ছকগুলি কবি কাজী নজরুল ইসলামের বয়ঃসন্ধিকালের রচনা বলে প্রবীণ লেটো-শিল্পীরা মনে করে থাকেন। এর মধ্যে জেলে-জেলেনীর ছকে, এক জেলের বারমাসের দুঃখেব কাহিনী সকরুণভাবে বর্ণিত আছে।

লেটোর অনেক আসরেই বড়পালা অভিনীত হতো। এই পালাগুলি বেশ বড়। এক একটা পালা প্রায় ৪০/৫০ পৃষ্ঠার। যেমন : 'হারেস সদাগর-পাণ্ডব রাজা ও দিল্লীর বাদশা', 'রাধাবিনোদ', 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'অজয়-বিজয়', 'জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা, 'রত্নমালা', 'কপালকুণ্ডলা', 'দস্যু বাহারাম', 'মাটিব মা ছোপাবই', 'কার পাপে', 'শয়তানের চর' ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছুদিন আগে সংগৃহীত। পালাটির নাম **'হরিদাসী মেথরাণী'**।

হরিদাসী মেথরাণী

[প্রথম দৃশ্য]

[দেশের রাজা দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে।]

রাজা : দূ-রে ঐ—কাল নিশা ধীরে ধীরে নেমে আসে। আশায় রচিত সংসার। মানবের কাননে ঐ—ঐ যেন দিগন্তের বুক হতে ছুটে আসে ঘন

কৃষ্ণ মেঘমালা, সাথে লয়ে বজ্রের বজ্রনাদ, পলকে করিতে নাশ। [দূরে অট্টহাসির শব্দ] একি! কাব? কার? এই অট্টহাসি? তবে কি আমায় গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে সর্বনাশা সর্বনাশ। না না না তোমার ঐ অট্টহাসিতে আমি কম্পিত নই। জেনে রেখো আমি মহারাজা। আমি ইচ্ছা করলে.....

[বান্দার প্রবেশ]

বান্দা : মহারাজ, মহারাজ, পেয়েছি, পেয়েছি, অতি সুন্দর জিনিশ।

রাজা : কি জিনিশ? বান্দা।

বান্দা : মদিরা, মহারাজ, মদিরা। যদি এক পাত্র খান, তাহলে হাতে স্বর্গ দেখবেন.....

রাজা : তা হলে নিয়ে আয় মদিরা, সঙ্গে নিয়ে আয় বাইজী।

[বাইজীর প্রবেশ]

বাইজী : [পাত্র হাতে রাজাকে মদিরা দান] পান করুন মহারাজ।

রাজা : [মদিরা পান] এখন তোমার নাচ ও গান হোক।

বাইজী : [নাচ ও গান]

সেলাম সেলাম রাজা তোমায় সেলাম।
মিনতি সুরে জানাই তোমায় প্রণাম ॥
উহুঁ উহুঁ তাকাও না, ও চোখ বাঁকাও না গো
অমন করে চোখ তুমি বাঁকাও না গো
তোমার মুখের হাসি, গলায় ফাঁসি
পরাণ গেলরে রাজা মলাম মলাম ॥

রাজা : বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। বাইজী, তোমার নাচে গানে আমি মুগ্ধ ধর ইনাম। [এই বলে রাজা বাইজীকে দিলেন তার গলার হার]

[ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান]

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[গ্রাম্য পথ, চলেছে এক বুড়ি, হাতে জপমালা।]

বুড়ি : গুরু, গোপাল, গোবিন্দ, গদাধর, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। [পথিমধ্যে কিছু দেখে] ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ দেখছো লোকের ছেলেদেব কাণ্ড পথের মাঝখানে পায়খানা ফিরেছে। ওমা এখন কি করে বাড়ি যাই। ঐ দেখ আবার পথের উপর আখের চিবে ফেলে রেখেছে। গুরু গোপাল গোবিন্দ গদাধর হরে

কৃষ্ণ..... [পরনের কাপড়টি বাঁ হাতে জানুর উপর তুলে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে বাড়িতে গমন।]

: বলি কই গো বৌমা ও বৌমা। বলি কোথায় গেলে গা, ডাকলে সাড়া দিতে কি ঘেন্না হয়?

[হরিদাসীর প্রবেশ]

হরিদাসী : না মা না তুমি অমন করে বোল না। আমি রান্নাঘরে ছিলাম, উনুনে ছাই.....।

বুড়ি : আ-হা-হা মরণ আমার! বলি কথা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়। পাড়ার সতীনবা আমায় দোষ দেয়, বলে বৌ দেখতে পারে না, ওলো, সতীনরা বৌ দেখবো কি করে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা কুটো ভেঙ্গে দুটো করে না, গালে গুড় দিযে চাটবো?

হবিদাসী : না মা না এই যাচ্ছি.....

বুড়ি : আ-হা-হা মরণ আমার, কথা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়, হ্যাঁলো বড়লোকের মেয়ে, তোর মা বাবা কি কিছু শিখায় নি?

হরি : মা, আমি এখনি যাচ্ছি, মা গো তোমার দুটি পায়ে ধরে বলছি, তুমি অমন করো বলো না।

বুড়ি : আ-হা-হা ভাজা মাছ বেশ উলটিয়ে খেতে পার। আর কোন কাজ বললে কেন মনে থাকে না। যাও তাড়াতাড়ি কাপড়গুলো পরিষ্কার করে নিয়ে এস। যত মরণ আমার। গুরু, গোপাল, গোবিন্দ, গদাধর, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ..... দেখি পূজার সময় হয়েছে এখন মন্দিরের দিকে যাই। [সাজি হাতে প্রস্থান, দূরে শোনা যাচ্ছে গুরু, গোপাল, গোবিন্দ, গদাধর হরেকষ্ণ.....।]

হরি : ভগবান তুমি আমায় তুলে নাও প্রভু, আর আমি সহ্য করতে পারছি না। [কাপড় লইয়া প্রস্থান]

[দৃশ্যান্তর]

[শহর কলিকাতা। রাজপথ ধরে চলেছে এক যুবক নাম তার পটল। সে হরিদাসী মেথরাণীর স্বামী।]

পটল : দেখতে দেখতে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। কিন্তু বাড়ি থেকে কোন চিঠিপত্র পেলাম না। না জানি তারা কেমন আছে? বৌটার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না? না-না মা তো আমার ভালো, নিশ্চয় বৌ-কে দেখবে।

কোলকাতায় আসার দিনে বৌ আমাব কাছে দাবি করে বলেছিল, 'ওগো সোয়ামী আমার জন্য বাস তেল, বাস সাবান, হাতের চুড়ি নিয়ে এসো'। ঠিক আছে সমস্ত কিছু কিনে নিয়ে যাবো, তাইতো দশটা বেজে গেল, আমাকে কাজে যেতে হবে। [গুনগুন সুরে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

[দৃশ্যান্তর]

[পুকুর ঘাট। হরিদাসী সেখানে কাপড় কাচ্‌ছে, আব মনেব দুঃখে বেদনা ভরা গান গাইছে।]

হরিদাসী : হৃদয় কাহারে যেন চেয়েছিল, চেয়েছিল।
কোথা সে, কোথা সে, কোথা সে?
তাব লাগি প্রাণ আমার কেঁদেছিল, কেঁদেছিল ।।
কোথা সে, কোথা সে, কোথা সে?
আপন মনে ক্ষণে ক্ষণে বারে বারে,
সুর মম নিতে চায় তারই তরে,
ব্যথায় আকাশ ভরা ছেয়েছিল ছেয়েছিল ।।
কোথা সে কোথা সে কোথা সে?

তাইতো রায়বাঘিনী শাশুড়ি আছে বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকলে হাঁ করে তেড়ে আসবে। না চলি।

[প্রস্থান]

[বুড়ির বাড়ি। সাজি হাতে বুড়ির প্রবেশ]

বুড়ি : গুরু, গোপাল, গোবিন্দ, গদাধর, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ.... বৌ-টা ঘাটে কাপড় নিয়ে গেল, কিন্তু এখনও ফিরল না। কি জানি বাছা দিন সময় এখন খুব খারাপ। আবার পালিয়ে গেল না তো? দেখি একটু পা বাড়িয়ে [দু-পা এগিয়ে] বৌ-মা ও বৌ-মা।

হরিদাসী : যা সব্বনাশ হয়েছে। আজ আমায় আস্ত গিলে খাবে। এই যে আমি এসে পড়েছি মা। বল মা বল, কি বলতে চাও?

বুড়ি : কি আর বলব? মাথা আর মুণ্ডু। বলি তোমার আক্কেল কবে হবে গা, কাপড় পরিষ্কার করতে কি সারা দিন লাগে? এত বলেও লজ্জা নাই। তা উনুনের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে কেনে? কই কাপড় দেখি কেমন হয়েছে। ও মা, কেমন করে কেচেছো? যেখানকার দাগ সেইখানেই আছে। [বুড়ি কাপড়টা বৌ-এর হাত হতে নিয়ে খুলে খুলে দেখে।] ওমা, করেছ

কি? কাপড়গুলো সব ফাটিয়ে ফেলেছো। এই তো কদিনের কাপড়, এর মধ্যে অচল করে দিলে, এত টাকা কোথায় পাবো।

হরি : না মা ঐ কাপড়টা পনের মাস হয়ে গেল।

বুড়ি : চুপ্, উনুনমুখী চুপ্, আমার মুখের উপর মুখ দিয়া? পাড়ার সতীনরা বলে বৌ দেখতে পারে না। হ্যাঁলো কি করে দেখবো? আ-হা-হা বলি সতীনদের আবার হাসি দেখ, দেখলে অঙ্গ জ্বলে যায়। এই বেলা বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে কুলক্ষ্মী।

হরি : মা, তুমি অমন করে বলতে পারলে? দেখ মা ধৈর্যের একটা শেষ আছে। ধৈর্যের বাঁধ আমি আর ধরে রাখতে পারছি না।

বুড়ি : তুই কি করবি? আমাকে মারবি? কেনে লো গুমটামুখী, খেমটামুখী, টুমটামুখী, বিষ্টুমুখী, জোলামুখী, তাঁতীমুখী, উটকপালী, চিরলদাঁতি, খড়মপায়ী, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি হতে। [বুড়ি হরিদাসীর গালে চড় মারল, তারপর মাথার চুল ধরে মারতে লাগল।]

হরি : ও মাগো, মলাম গো, বাঁচাও গো, আর বাঁচিনা, প্রাণ আমার যায় গো, কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও।

[রতনের প্রবেশ]

রতন : মামী ও মামী কই গো বাড়িতে আছো।

বুড়ি : বলি কে ডাকে রে, মামী মামী করে। দেখি কোন পুরুষের ভাগ্না? এই তুই আবার কে রে?

রতন : আমায় চিন্তে পারছো না মামী?

বুড়ি : আ-হা-হা মরণ আমার, সাত পুরুষের ভাগ্নার ছাঁচ নাই, আর ভাগ্না হতে আসিস্ না বেরিয়ে যা, অনামুখো ছোঁড়া।

রতন : বেরিয়ে যাচ্ছি মামী কিন্তু জেনে রেখো মামী, আমার কাছে তোমায় আসতেই হবে। [প্রস্থান]

বুড়ি : ও বাবা, শোন শোন, তুই বাবা রাগ করে পালিয়ে যাবি? [হরির দিকে চেয়ে] হ্যাঁলো আটকুড়ির বিটি এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? বেরিয়ে যা। [গলাধাক্কা দিয়ে হরিকে তাড়িয়ে দিল বুড়ি]

হরি : [কাঁদতে কাঁদতে হরিদাসীর বাইরে আসা] হায় ভগবান এখন আমি কি করি? বল, বল গো প্রভু এখন কোন পথ অবলম্বন করবো। আমি নারী দুর্বলা, কতক্ষণ পাষাণে বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবো। তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও প্রভু।

[গান]

পথ বলে দাও, পথ বলে দাও, পথ বলে দাও প্রভু।
একাকিনী পথ চলেছি, পথে নামি নাই কভু ।।
পাষাণে বুক বেঁধে যাবো,
পথে পথে স্বামী খুঁজবো,
স্বামী পেলে তোমার কাছে প্রণতি করবো প্রভু ।।

[প্রস্থান]

[দৃশ্যান্তর]

[কথা বলতে বলতে বুড়ি ও রতনের প্রবেশ]

রতন : হ্যাঁ গো মামী, বলি বৌদিকে তাড়িয়ে কেমন আছো?

বুড়ি : আর বলিস নি বাবা দুঃখের কথা। ছেলেটা এসে গেলে কি বলব তাই ভাবছি। এখন কি করি বলতো রতন?

রতন : মামী, আমি আর কি বলবো? এখানে বলার কিছু নেই, তবে যেটুকু সত্য সেটা আমি বলবো।

বুড়ি : কি? তুই সত্যিই বলবি? তাহলে আমি যে ধরা পড়ে যাবো। হেই বাবা, সোনা আমার, মানিক আমার, তুই যদি একটা মিথ্যা কথা বলিস তাহলে আমার মায়ের দেওয়া এক গাছা হার আছে তোকে একেবারে দিয়ে দেব।

রতন : ঠিক দেবে তো মামী? যদি দাও তাহলে একটা কোন, একশটা মিথ্যা বলতে আমি রাজি আছি। বল মামী কি বলতে হবে।

বুড়ি : তা হলে চল্ বাবা ভিতরে গিয়ে একটু যুক্তি করি।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দৃশ্যান্তর]

[গান গাইতে গাইতে পটলের প্রবেশ।
কলিকাতা থেকে সে বাড়ি যাবে।]

পটল : বহু দিনের পরে, ফিরে যাচ্ছি ঘরে।
পথে হল দেরি, আহা মরি গো,
দশটার গাড়ি ফেল করে ।।
আমি কোলকাতায় চাকরি করি,
মতিশীল বাবুর বাড়ি,
আমি করি সরকারী,

আমায় রাস্তায় ঘাটে দেখতে পেলে বাবুরা সব যায় সরে ॥
যাঃ! দশটার গাড়ি তো পেলাম না, পরেরটায় যাবো।

[প্রস্থান]

[দৃশ্যান্তর]

[বুড়ি ও রতনের প্রবেশ]

রতন : হ্যাঁ গো মামী হার গাছাটা ঠিক দেবে তো? দেখো যেন ফাঁকি দিও না।

বুড়ি : না বাবা না আমি সে রকম মেয়েই নই। আমার নাম সরলা দাসী, অপর কাঁদায়ে, নিজে হাসি।

[দরজার কাছে পটলের প্রবেশ]

পটল : মা, মা গো, ও মা।

বুড়ি : ও বাপ রতন, আমার পটল এসেছে, এখন কি করি?

রতন : তুমি গিয়ে ডেকে আন।

বুড়ি : আমি রান্না ঘরে আছি। তুই যা বাবা, আদর করে তোর দাদাকে ডেকে আন। যা বাবা যা।

পটল : মা গো, ও মা, কি ব্যাপার? বাড়িতে কি কেউ নেই নাকি?

রতন : দাদা নমস্কার, কেমন আছো? বেশ ভাল ছিলে তো।

পটল : হ্যাঁ রে হ্যাঁ ভাল ছিলাম। তুই কখন এসেছিস্? মা কোথায়? তোর বৌদি কোথায়?

রতন : মা রা-ন্না ঘ-রে, আর বৌদি....

পটল : থামলি কেন, বল তোর বৌদি কোথায়?

[রতনের ঘরে গমন]

রতন : ও মামী সর্বনাশ হয়েছে, এই বার কি হবে?

বুড়ি : কি হলো বাবা রতন?

রতন : বৌদি নাই ঘরে, এইবার কি হয় দেখ? এই বার তুমি বৌ কোথায় পাবে?

বুড়ি : তুই যা বাবা, ছেলে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, পটলকে ডেকে নিয়ে আয় বাবা।

রতন : দাদা তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো।

পটল : আমি কলকাতা যাবার সময় তোর বৌদির কাছে শপথ করে গিয়েছিলাম, যখন কলকাতা হতে ফিরে এসে দরজায় ডাক দিলে, তুমি আমায়

হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাবে। তাই আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, তোর বৌদি যদি আজ আমার হাত ধরে না নিয়ে যায়, তা হলে আমি বাড়ি যাব না, ফিরে চলে যাবো কলকাতা। তোর বৌদিকে পাঠিয়ে দে।

রতন : ও মামী, কই গো [মনে মনে, 'এইবার মজা লেগে গেল।']

বুড়ি : কি হলো রে, কি হলো?

রতন : বৌদিকে পাঠিয়ে দাও নইলে, দাদা বাড়ি আসবে না, দরজা হতে ঘুরে চলে যাবে কলকাতা।

বুড়ি : কই দেখি, ছেলে কেন আসবে না, বলি আমার পেটের ছেলে আমার কথা শুনবে না? দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছি, আর আমাকে দেখা না করে পালিয়ে যাবে, আমার কি কোন দাম নাই। আমার থেকে বৌ-এর দাম বেশি হলো? দেখি, পটল ও পটল, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ভিতরে আয়।

পটল : না মা না, তোমার বৌমাকে পাঠিয়ে না দিলে, আমি বাড়ি যাব না, কারণ আমি তার কাছে শপথ করেছি, সে আমার হাত ধরে নিয়ে না গেলে আমি যাব না, তাহলে আমি চলি মা [গমনোদ্যত]।

বুড়ি : শোন বাবা শোন, পালিয়ে যাস্ না। বৌমা ঘরে শুয়ে আছে, ডাক্তার বিছানা হতে উঠতে নিষেধ করেছে, তাই আসতে পারছে না।

পটল : আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বৌ যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি যাব না, আর এই জন্মভূমিকে ও তোমার দুটি চরণকে চিরদিনের মত প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি।

বুড়ি : না বাবা না, তুই অমন করে পালিয়ে যাস্ না। আমি বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [বুড়ির বাড়িতে প্রবেশ।]

বুড়ি : রতন ও রতন তুই একবার মেয়ে সেজে ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে আয় বাবা। সোনা আমার, চাঁদ আমার, মানিক আমার, আমার সেই হারখানা তুকে দিব। যা বাবা যা।

রতন : তাহলে কেমন করে মেয়ে সাজিয়ে দেবে দাও। দেখো মামী, যেন ধরা না পড়ে যাই। আর যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে পুরোন আচার বার করে ছাড়বো।

বুড়ি : না বাবা না। আয় তোকে শাড়ি পরিয়ে দিই। [শাড়ি, পরিয়ে মেয়ে সাজানো]

[রতনের মেয়ে সেজে পটলের কাছে গমন]

রতন [মেয়ে বেশে] : প্রিয়তম এসো, এসো, তুমি না এলে আমার জীবনে কোন শান্তি নাই। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো।

পটল : কোলকাতা যাবার সময় তুমি বলেছিলে বাস তেলের জন্য। আমি জবাকুসুম তেল এনেছি। যদি তোমার মাথায় চুল না থাকে তাহলে মাথা নেড়া করে তোমায় তাড়িয়ে দেব।

[রতনের বাড়িতে ফিরে যাওয়া।]

রতন : ও মামী, এইবার কি হয় দেখ। আমি আর যাবো না।

বুড়ি : কি হলো রে?

রতন : পটলদার কাছে গেলাম, সে বলছে, 'চুল যদি না থাকে মাথা নেড়া করে ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দেব'। আমি আর যাব না।

বুড়ি : হেই বাবা রতন, তোর দুটি হাতে ধরে বলছি বাবা, তুই আমাকে বাঁচা। আয় বাবা তোর চুল বেঁধে দিই। [গামছা নিয়ে মাথায় চুল করে দিল। তার উপর ধাক্কা দিয়ে।] ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, অমন টিংনি মেয়ে দেখিনি। এখনো পর্যন্ত চুল বাঁধতে পারে না। যত মরণ আমার যা-যা-যা।

[মেয়েবেশী রতন] : মামী হারগাছটা দেবে তো? [বুড়ি ঘাড় নেড়ে জানাল।] প্রাণসখা বাড়ি এনো।

পটল : সাবান আর চুড়ি আনতে বলেছিলে। আমি এনেছি। হাত যদি খালি থাকে, তাহলে মেরে হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।

[রতনের বাড়িতে প্রবেশ।]

রতন : ও মামী, মামী গো, এইবার বুঝি জীবন যায়।

বুড়ি : কি হয়েছে, বাবা? তাড়াতাড়ি বল।

রতন : পটলদা বলছে, 'হাতে যদি চুড়ি না থাকে তো হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব'।

বুড়ি : আরে আমি থাকতে তোর এত ভয় কিসের? [বুড়ি রতনের দুই হাতে দু গাছা করে চুড়ি পরিয়ে দিল।]

রতন : কই গো প্রাণপতি, তুমি থাকতে আমার এই দূরগতি। এইবার যদি না এসো তাহলে আমি বিষ খেয়ে মরবো।

পটল : বহু দিন তোমার মুখে গান শুনিনি। তুমি একখানি গান শোনাতে শোনাতে আমার হাত ধরে নিয়ে চল।

রতন : [পটলের হাত ধরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে।]

তুমি এসো হে প্রাণসখা, পর ফুলহার।

বিনি সুতে গাঁথা মালা অতি চমৎকার ।।
ধর ধর মালা ধর, আমার মালা গলে ধর,
হয়ো না শ্যাম নটবর, নটবর মল্লিকার ।।

পটল : আচ্ছা বৌ, তুমি ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছো কেন? ঘোমটা খুলে কথা বল।

রতন : আমি ঘোমটা খুলবো না। আর মুখও দেখাবো না।

পটল : কেন? অনেক দিন আসিনি বলে অভিমান করেছো? বল বল তোমার কি হয়েছে? তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।

রতন : আমি কোন দিন কাউকে মুখ দেখাব না।

পটল : তাহলে আমি জোর করে মুখ দেখবো। [জোর করে ঘোমটা খোলা।] একি! একি! রতন! শয়তান, আমার সঙ্গে দাগাবাজী। তোকে আমি মেরে নাড়ু বানাব।

রতন : ও মামী, মামী গো, পটলদা আমাকে মেরে নাড়ু বানাবে গো।

বুড়ি : কি হলো—কিরে রতন?

পটল : মা, তুমি রতনকে বৌ সাজিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছো। মা হয়ে ছেলের সাথে ছলচাতুরি।

বুড়ি : কি? এত দূর আস্পর্দ্ধা তোর রতন। ওরে মুখপোড়া ছোঁড়া, তোর এত সাহস, তুকে কি বলি, তোর মরণ হয় না। তোর বুকে বাঁশ চাপে না, তুই কবে মরবি। হে ভগবান রতনের মরণ দাও। বলি মরণ হয় না মরবি কবে; তুই মলে গাঁয়ের আপদ যাবে।

রতন : মামী হুশিয়ার, তুমি যা করেছো, জগতে কোন মা তা পারে না। মা নও তুমি রাক্ষসী। ভগবান যদি তোমার মাথায় বাজ ফেলে দিত তাহলে পাড়ার লোক আনন্দ পেতো। এই বয়সে যদি এত ছলাকলা, না জানি বয়সকালে তুমি কত কলা দেখিয়েছো। প্রণাম মামী তোমার পায়ে প্রণাম।

বুড়ি : ওরে হতভাগা, কুকুরের বাচ্চা, তোর এত বাড়। আমার ছেলেকে নিয়ে অভিনয়। তাহলে শোন পটল আমি চুপ থাকবো না। মুখপোড়া বাঁদরের বাচ্চা, আমার ভাল বৌকে তাড়িয়ে দিল। দিনরাত বৌটার সাথে গুজুর, গুজুর, ফুসুর, ফুসুর করে কি কানভাঙানি দিলে। আর বৌমা আমার উপরে একেবারে বিষ হয়ে গেল। ওরে হতভাগা নেউলের বাচ্চা বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। [রতনের দুই গালে চড় মারল।]

পটল : মা, তুমি কি করছ? মা না হয়ে যদি তুমি সৎ মা হতে, তাহলে বই-এর পাতায় লেখা থাকতো তোমার নাম।

রতন : মামী, যখন তুমি আমাকে মারতে পারলে, তখন আর আমি কোন কথা লুকিয়ে রাখবো না। সব বলে দেব। দাদা কান দিয়ে শোন। বৌদির কোন দোষ নাই। যত দোষ মামীর। কত রকমের গালাগালি, কত রকমের মারধোর, এমনকি চুল ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে মার। সে মার চোখে দেখা যায় না। মারতে মারতে বাড়ির বাইরে দিয়ে এলো। আর বললে যদি কোনদিন এই বাড়িতে পা দিস্ তো তোর জোড়া ভাই-এর মাথা খাস্।

বুড়ি : এত বড় মিথ্যা কথা, রতন তোকে সাপে খায় না রে; তোকে সাপে খাক। আর তোর মাথায় কড় কড়ে বাজ পড়ুক।

পটল : মা তুমি থাম। তোমার পায়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছি। পরান খুলে অভিশাপ দাও। আর যেন আমাকে তোমার মত মায়ের কাছে ফিরে আসতে না হয়। [প্রস্থানোদ্যত]

বুড়ি : পটল, পটল, শোন বাবা শোন।

পটল : না, মা—না, আর কোন দিন শুনবো না। এই দুঃখের জীবনে কাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো। আর কার আশায় বুক বাঁধবো। তোমার বাড়িতে তুমি থাক। তবে চলি মা। [প্রস্থান]

রতন : আমিও চলি মামী, তুমি চ্যাং মুড়ী কানির মত ভিটেতে বসে মাছ মার। পেন্নাম মামী পেন্নাম।

বুড়ি : একি করলে ঠাকুর! একটার পর একটা, সব কেড়ে নিলে। এখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো। প্রভু সন্তানহারা মা হয়ে কেমন করে থাকবো। আমি যে মা, তাই মায়ের পরান বার বার ডুকরে কেঁদে উঠছে। আমি বহু কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছি। তুই আমার দৃষ্টি। তোকে হারিয়ে আমি যে অন্ধকার দেখছি। ফিরে আয় বাবা, আমার বুকে ফিরে আয়। [প্রস্থান]

[হরিদাসী বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে অনেক দূরে।
চলেছে রাজপথ ধরে।]

হরিদাসী : সোয়ামীহারা, ঘরহারা মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে তোমার পথের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি প্রভু। তুমি বলে দাও কোথায় আমার সোয়ামীকে পাবো। ওগো ঠাকুর সারাজীবন ধরে তোমার দুটি চরণ

চোখের জল দিয়ে ধুয়ে আসছি, তোমার কি দয়া হয় না এ দাসীর উপর। বল ওগো ঠাকুর কতদিনে আমার সোয়ামীর দেখা পাবো। তুমি তো সকল মানুষের চোখের জল ভালবাসো। আর আমি মেথরাণী বলে কি আমার চোখের জলকে ঘৃণা কর। তাই যদি হয় আমার বলার কিছু নেই। আমি ভাগ্য বলে মেনে নেব এই কথাকে।

আমার চোখের জলে তোমার পূজা, নাও পূজা ঠাকুর।
তোমার চরণ ধোয়াই চোখের জলে, মন বেদনায় ভরপুর।
আমি যে মেথরের মেয়ে,
ভাল জান তুমি মোর চেয়ে,
আমার চোখের এ জল তুমি কি ঘৃণা কর ঠাকুর ॥
কোথায় গেলে সোয়ামী পাবো,
বল ঠাকুর সেথায় যাবো,
তারে দিয়ে আমার মনের সকল বেদনা কর দূর ॥

নেপথ্যে : হরি, তুই সারা জীবন যাকে ভালবাসিস্, তাকে খোঁজ কর, তোর সম্মুখেই সে আছে। শিব, শম্ভু।

হরি : কই, কই, আমার সেই ধ্যানের দেবতা? [জানু গেড়ে বসে করজোড়ে মিনতির সুরে।]

ঠাকুর, বকুলের মত করে ঝরে পড়ে মোর চোখের জল।
এই চোখের জলেই পূজেছি তোমার চরণ তল ॥
এই জলে পূজে পেয়েছি অভয়,
সোয়ামী দিয়ে প্রাণ কর শুভময়,
সোয়ামীরে পেলে, ঘুচিবে আমার বেদনার আঁখিজল ॥

[তারপর গড় হইয়া প্রণাম। এদিকে পটল চুপি চুপি এসে হরির পিছনে দাঁড়াল। হরি পিছন ফিরিয়া পটলকে দেখতে পেয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে বুকে চেপে ধরল।]

হরি : সোয়ামী...।

পটল : হরি, ওরে আমার হরি, আমার হরিদাসী।

[রাজা ও তাঁর চাকর ভুজঙ্গের প্রবেশ]

রাজা : কার ঐ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। দেখে আয় তো ভজা।

ভুজঙ্গ : যাচ্ছি, হুজুর, যাচ্ছি। [কিছু দূর গিয়ে কপালে বাঁ হাতটা ঠেকিয়ে দেখে।] মহারাজ মন্দিরের সামনে একজন যুবক আর একজন যুবতী। মনে হয় তারা গোপনে প্রেমালাপ করছে।

রাজা : আমার এই পবিত্র মন্দিরের সামনে প্রেমালাপ। দেখি। [এগিয়ে] ঐ : মন্দিরের দ্বারদেশে কে দাঁড়িয়ে?

হরি ও পটল : [দুজনে একই সুরে] হুজুর আমরা খুব গরীব মানুষ, ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। আর কখনও আসবো না।

রাজা : [মনে মনে] মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, মনে হয় ওদের ঘর বাড়ি নাই। [প্রকাশ্যে] এই তোরা কোন বর্ণের?

পটল : বর্ণটর্ণ বুঝি না বাবা।

রাজা : চুপ, বাবা নয়, আমি মহারাজ।

পটল : আপনি মহারাজা। প্রণাম হই। [উভয়ে প্রণাম করল] মহারাজা, আমি মেথর, আর ও আমার মেথরাণী। আমি এখন সর্বহারা, ছন্নছাড়া, জীবন নিয়ে পথে পথে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মহারাজ আমার কোন অপরাধ নেবেন না। আমি আমার মেথরাণীকে নিয়ে এখনি চলে যাচ্ছি। [জোড়হাত করে দাঁড়াল।]

রাজা : তাহলে ওটা তোমার বৌ। তুমি এখন কোথায় যেতে চাচ্ছ? তোমার কি কোন বাড়িঘর ঠিক করা আছে?

পটল : না হুজুর, এখানে ঠিক করা কিছুই নাই। যে দিকে ভগবান আমাদের নিয়ে যাবে, সেই দিকে আমরা দুজনা চলে যাবো।

রাজা : ভজা, আমার ওখানে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

ভুজঙ্গ : সে কথা আর বলতে মহারাজ। এত সুন্দর বৌটা কোথা গিয়ে মরবে। তার চেয়ে একটু জায়গা দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিন। আপনার তো বহু পায়খানা আছে, দুজনকেই কাজে লাগিয়ে দিন। আহা বেচারা গরীব মানুষ।

রাজা : শোন, আমি যদি তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাই, তোমরা যেতে রাজি আছ? যদি রাজি থাক তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার। আচ্ছা তোমার নামটা কি?

পটল : আমার নাম পটল মেথর। মহারাজ আমাদের কোন আপত্তি নাই, দয়া করে যদি নিয়ে যান।

রাজা : ভজা, তুই ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যা। আর একটা ঘর দেখিয়ে দে এবং থাকার সব ব্যবস্থা করে দে, কোন অসুবিধা যেন না হয়।

ভজা : দেখ্ছো পটল ভায়া, দেখ্ছো আমাদের মহারাজার গুণ।

পটল : সত্যি মহারাজ দেবতা তুল্য।

ভজা : রাজামশায় যা বলবেন, তুমি তা পালন করে যাবে, দেখবে একদিন তুমি পাকা বাড়ি বানিয়ে ফেলবে এবং কত জনা তোমার তোযামদ করবে। বুঝলে ভায়া বুঝলে। এস ভায়া এস, তোমাকে ঘর দেখিয়ে দিই। [প্রস্থান]

হরি : সোয়ামী, তুমি এখান থেকে পালিয়ে চল। আমার মন যেন কু গাইছে। আমার মনে হয়, এত সুখ আমাদের সহ্য হবে না। সারাজীবন ধরে দুঃখের বোঝা মাথায় কোরে বয়ে বেড়াচ্ছি। এরপরে হয়তো কষ্টের শেষ থাকবে না। সোয়ামী তুমি এখান থেকে পালিয়ে চল।

পটল : আরে না-না, ভগবান কখন কোন দিকে ভাগ্য ফিরিয়ে দেয় কেউ বলতে পারে না। রাজাটা সত্যিই ভাল লোক। আর ভজাও তো বেশ ভাল লোক। ও বেচারী আমার মত গরীব। তাই গরীব হয়ে গরীবের ব্যথা বোঝে।

হরি : তবে চল, ভগবানের উপর নির্ভর করে। [উভয়ের প্রস্থান]

[রাজার প্রবেশ]

রাজা : দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই রাজকার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মনের মধ্যে কখন দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ি নাই। তবে কেন আমার মধ্যে এত চিন্তা? যতই চিন্তা করিব না ভাবিতেছি, ততই যেন চিন্তার অতলে তলিয়ে যাইতেছি। এখন আমি কি করি? কোন পথ অবলম্বন করিয়া নিজেকে ধাবিত করি।

[ভুজঙ্গের প্রবেশ]

ভুজঙ্গ : আহা কি সুন্দর, কি মধুর কণ্ঠ, যা কখনও ভোলা যায় না। যেমন সুর, তেমনি তাল দিয়ে গান গাইছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন পাগল হয়ে যাবো।

রাজা : কি ভজা, তুই পাগল হয়ে যাবি কেন? তোর তো আর এক নাম কাল ভুজঙ্গ। কাউকে দংশন করিস্ নি তো?

ভুজঙ্গ : দংশন আমি করি নি। তবে তার গানের সুর আমায় দংশন করেছে।

রাজা : কার সেই সুললিত কণ্ঠস্বর তুকে পাগল বানিয়েছে?

ভুজঙ্গ : মহারাজ, সে শুধু সুর শুনিয়ে পাগল করেনি, আমায় গানের সুর দিয়ে খুন করেছে, তার রূপও আমাকে খুন করেছে। সে হরিদাসী।

রাজা : হরিদাসী কি ভাল গান গাইতে পারে?

ভুজঙ্গ : আমার যদি শত মুখ থাকতো, তাহলে শত মুখে তার প্রশংসা করতাম। যে দিন কাজ করতে আসবে, সেই দিন আপনাকে দেখাব, কি তার রূপ।

রাজা : ভজা, তুই পটল আর হরিকে ডেকে নিয়ে আয়। বলে দিবি, মহারাজের আদেশ। এখনি যেতে হবে। পোযাক পরে একটু তৈরি হয়ে আসতে বল, কেমন। [প্রস্থান]

ভুজঙ্গ : হরি হরি করি, হরি ভুলিতে না পারি,
কেমনে ভুলিব তোমারে।
যে দিকেতে চাই, হরিরূপ দেখ্‌তে পায়।
হরি আছো তুমি মোর অন্তরে ॥
হরি তোমাকে ভুলিতে নারি,
ভুলিতে কি তোমা পারি
সুরের ছুরিতে হৃদি হলো খুন,
রূপের অনলে পুড়ে মরি ॥

[প্রস্থান]

[পটলের বাড়ি। উঠানে বসিয়া পটল ও হরি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।]

পটল : আচ্ছা হরি, কেন তুমি মিথ্যা সন্দেহের আগুনে নিজেকে পোড়াচ্ছ। ভুজঙ্গ তো খুব ভাল লোক।

হরি : তুমি জান না সোয়ামী। আমার মনে হয় ও ভজা নয় ও কাল ভুজঙ্গ। একটু ফাঁক পেলেই দংশন করবে।

পটল : আঃ! কি বল হরি! শোন হরি, তুমি আর লাজুকলতা ফুলের কলির মত মুখ বুজে থেকো না। তুমি চট পট কথা বলতে শেখ। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন করে, তালে তাল মিলিয়ে চলতে শেখ, কেমন।

হরি : আচ্ছা তাই হবে গো, তাই হবে।

পটল : আচ্ছা হরি তোমার মুখে অনেক দিন গান শুনিনি, একখানা গান নেচে নেচে গাও দেখি, শুনি।

হরি : কি গান?

পটল : যা তোমার খুশী।

হরি :

শিউলি আমার প্রাণের সখা
তোমায় আমার লেগেছে ভাল।
তুমি যে ভাই আমারি মত,
ক্ষণেক রাতে প্রদীপ জ্বালো।
তুমি আমি একই রাতে,
জেগেছিলাম প্রেমের আশে,
শুনেছিলাম কোকিলের গীত
দেখেছিলাম চাঁদেরি আলো।

[নাচ গানের সময় ভুজঙ্গের প্রবেশ]

পটল : অপূর্ব, অপূর্ব তোমার....

ভুজঙ্গ : সত্যিই অপূর্ব তোমার গান [সকলের মুখে হাসি।]

পটল : ভজাদা কি মনে করে?

ভুজঙ্গ : আরে ভায়া তোমার ভাগ্য ফিরেছে। স্বয়ং রাজা মহাশয় আদেশ করেছেন, এখনি দরবারে যেতে হবে।

হরি : তাহলে আমরা একটু তৈরি হয়ে নিই। [দুজনে পোষাক পাল্‌টে দরবারের পথে গমন।]

[প্রস্থান]

[দৃশ্যান্তর]

[রাজদরবার। রাজা স্বয়ং সিংহাসনে বসে।]

রাজা : জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মা বসুন্ধরার বুকে জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছি। আর সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছি বলে, মা গো মা তোমারে জানাই শতশত প্রণাম।

[ভুজঙ্গ, পটল ও হরির প্রবেশ]

পটল : জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। হুজুর আমাদের কেন ডাক দিয়েছেন?

রাজা : অনেকদিন তোমাদের মুখে কিছু শুনিনি, তাই মনের মধ্যে একটু কৌতূহল দেখা দিল, সেইজন্য তোমাদের ডাক দিয়েছি। আচ্ছা তোমরা কেমন আছো? কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো?

পটল : মহারাজ দেবতুল্য। না হুজুর আমাদের কোনরকম অসুবিধা হয়নি।

রাজা : আচ্ছা হরি শুনি তুমি নাকি খুব ভাল গাইতে পার, নাচতে পার।

হরি : মহারাজ, আমি [লজ্জাবনত].....

রাজা : লজ্জা, আরে লজ্জা কিসের। লজ্জা ঐ মানুষদের যারা নাচতে গাইতে জানে না। আমার নাচমহলের নর্তকীরা দরবারে এসে নাচে গানে দরবারকে মুখরিত করে তোলে। আর নিয়ে যায় মোটা বক্‌শিস। তুমি যদি সেরূপ.....

হরি : মহারাজ, আমি কেমন করে.....

রাজা : কি ভয় হচ্ছে?

হরি : হ্যাঁ মহারাজ, আমার ভয় হয়। আপনার পবিত্র দরবারের উপর আমার পায়ের ছাপ ফেলে অপবিত্র করতে চাই না। আমি—আমি কোন কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিতে পারব না।

রাজা : কেন কেন তুমি পারবে না? তুমি যদি না পার, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

হরি : না মহারাজ, আমার জন্য কিছু ভাবিনি। আমার ভাবনা শুধু আপনার জন্য। আপনার মঙ্গলের জন্য। যদি হুকুম করেন, তাহলে বাধ্য। তবুও সংকোচ হয়। যেহেতু আমি,—আমি মেথরাণী। একথা সভাসদগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে, সকলেই আপনাকে ঘৃণা করবে। দরকার হয় আমার বাড়িতে গিয়ে বলবেন, আমি শুনিয়ে দেব।

রাজা : হরি! একি তুমি শোনালে! তুমি হরি নও, তুমি ভয়ংকরী। তুমি অতীব বুদ্ধিমতী। তুমি তোমার সত্য পরিচয় দিয়ে, আমার কুল মর্যাদা আর রাজসভার পবিত্রতা যে অক্ষুণ্ণ রাখলে এর জন্য আমি তোমাকে দশহাজার টাকা বক্‌শিস দিলাম [বক্‌শিস প্রদান]। ধন্য হরিদাসী, তুমিই ধন্য। [প্রস্থান]

[পরদিন, হরিদাসী মাথায় টব ও হাতে ঝাঁটা নিয়ে পথ চলেছে। হরিদাসীর রূপে পাগল ভুজঙ্গ নানা অঙ্গভঙ্গী করে চলেছে তার পিছু পিছু। মাঝে মাঝে টবের ময়লা নিয়ে গায়ে মাখছে।]

[হরিদাসী ও ভুজঙ্গের প্রবেশ]

হরি : বসন্তের সময়ের গুনে, বসন্তের সময়ের গুনে।
মাথায় টব, হাতে ঝাটা, নব যৌবনে ॥
বল বন্ধু কিসের কারণ,
পায়খানাতে যাব এখন,
আমার আঁখায় হাঁড়ি, দেহভারী প্রথম ফাল্গুনে।

ভুজঙ্গ : হরি তোমার মাথায় কি?

হরি : আমার মাথায় পায়খানার টব। আর এটা কি দেখেছো [ঝাঁটাটা দেখিয়ে] আমার হাতে ঝাঁটা।

ভুজঙ্গ : আচ্ছা হরি, তুমি কি আমার কথা কোনদিন ভাবো?

হরি : ভাবি না মানে, তোমার কথা মনে হলে, চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ে। ভুজঙ্গ আমার জন্যে তোমার কি হয়?

ভুজঙ্গ : আমার মনের কথা কি বলবো হরি :

[গীত]

সদা স্মরি হরি, হরি আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে।
সদা ডাকি হরি হরি, মোর ধ্যানে আর জাগরণে ॥
চোখের সামনে সদা ভাসে হরি।
সদা জপি তব নাম হরি হরি।
তুমি হরি সদা রয়েছো আমার মনের গহন কোণে ॥

হরি : তাহলে তুমি আমায় খুব ভালবাসো।

ভুজঙ্গ : শুধু আমি নই, রাজা মশায়ও তোমাকে ভালবাসে।

হরি : রাজা মশায় আমার জন্য কিছু বলে?

ভুজঙ্গ : সে কথা পরে বলব। এখন আমরা দু-জন একখানা গান করি।

হরি : তাহলে তো ভালই হয়। হোক একটা গান :

ডুয়েট গান

ভুজঙ্গ : ওলো মেথরাণী একটুখানি পা টিপে দে।

হরি : ফের যদি কইবি কথা, ভাঙ্গবো মাথা ঝাঁটারবাড়িতে ॥

ভুজঙ্গ : জানিস্ আমি রাজার চাকর।

হরি : আমি ভাবি তুই পোকামাকড়।

ভুজঙ্গ : উড়ে গিয়ে মারবো কামড়, বলবি ছেড়ে দে ॥

হরি : তুমিতো খুব রসিক আছো ভজাদা। আচ্ছা পরে এস [গমনোদ্যত]

ভুজঙ্গ : শোন শোন হরি, মহারাজ বলেছে '.....' [ভুজঙ্গ হরির কানে কানে কিছু বলে হাসতে লাগল।]

হরি : ঠিক আছে, ঠিক আছে। [হরির প্রস্থান]

ভুজঙ্গ : যাও হরি, দেখবে আমি আবার কি করতে পারি। তোমার নাম হরিদাসী, আর আমি তোমার লেজকাটা খাসি। [দর্শকদের দিকে মুখ করে] ঠকে গেলাম নাকিরে ভাই।

[দৃশ্যান্তর]

[পটলের বাড়ি। উঠানে বসিয়া পটল ও হরি কথা বলছে। এমন সময় ছদ্মবেশে রাজা ও ভুজঙ্গের প্রবেশ।]

পটল : হুজুর আপনি এ বেশে কেন?

রাজা : দেখ পটল আমি একজন রাজা হয়ে যদি তোমার বাড়িতে আসি তাহলে সমাজে আমায় নিন্দা করবে। তাই ছদ্মবেশে তোমার বাড়ি এসেছি, হরিদাসীর মুখের গান শুনতে ও নাচ দেখতে। পটল তুমি কি বলছো?

পটল : রাজামশায় আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি আপনার মনের কথা সব হরিদাসীকে বলেছি।

রাজা : তাহাতে হরিদাসী কি ইচ্ছা প্রকাশ করেছে?

হরি : না হুজুর, আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ...

রাজা : কিন্তু কি হরি?

হরি : না এমন কিছু নয়। রাত একটু বেশি হলে ভাল হয়। কারণ নাচের ঝঙ্কার আর গানের সুরধ্বনি কারও কানে পৌঁছাবে না। আর কেউ জানতেও পারবে না।

রাজা : তাহলে এখন চলি হরি। রাত বারোটার মধ্যে ফিরে আসব। কই ভজা? [ভজার প্রতি] তুই আর আমি যখন বাড়ি হতে বেরুবো, তখন যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, আর তাদের মধ্যে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বলবি ও আমার মামাতো দাদা, কেমন।

ভুজঙ্গ : বেশ হুজুর, আমি আপনাকে এমনভাবে নিয়ে যাবো যে কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আমার নাম ভুজঙ্গ। আমার অভ্যাস আছে সূক্ষ্মগর্তের মধ্যে ঢুকে পড়া। চলুন মহারাজ গোপন পথ ধরে চলে যাই আমরা। তাহলে চলি হরি, চলি। মন হরি নাম ভজবো কেমনে, হরি, হরি, হরি। [রাজা ও ভুজঙ্গের প্রস্থান]

পটল : হরি কি ভাবছো, তোমার কি ভয় হচ্ছে?

হরি : দেখ সোয়ামী, নারীর রূপযৌবন নিয়ে এক শ্রেণীর পুরুষ ছিনিমিনি খেলতে চায় পাশা খেলার মত। নারীর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে

নারীত্ব। আর সেই অমূল্য সম্পদ চিরদিনের মত লুট হয়ে যাবার আশঙ্কা, ভয় না করে থাকতে পারি। মৌচাকভরা মধু যদি কেউ আকণ্ঠ পান করে চলে যায়, শুধু রেখে যায় মধুবিহীন মৌচাকটাকে। বল সোয়ামী বল, তখন শূন্য মৌচাকের দিকে হাত বাড়াবে, না মুখ ফিরিয়ে নেবে।

পটল : তাহলে এখন কি করা যায়? আচ্ছা হরি তুমি পারো না প্রেমের ফাঁসী গলায় পরিয়ে টান দিয়ে শ্বাস বন্ধ করতে।

হরি : পারি কিন্তু সমাজের কাছে জবাব দিতে হবে।

পটল : তাহলে কি হবে হরি?

হরি : সতীর সতীত্ব বজায় রাখনেওয়ালা সেই ভগবান। দেখি একটু চেষ্টা করে কি করতে পারি।

[ছদ্মবেশে রাজা ও ভুজঙ্গের প্রবেশ]

ভুজঙ্গ : হরি হরি হরি, কি যে করি। দিন রাত ভেবেই মরি।

রাজা : কই পটল, পটল কই। এখন যে রাত বারোটার ওপর।

পটল : আসুন মহারাজ আসুন। আমরা তৈরি হয়েই আছি। হরি তুমি মধুমাখা কণ্ঠে, মিষ্টি সুরের লহরী ছড়িয়ে দাও। সুরের ঝংকারে এই সভাটি মুখরিত হয়ে উঠুক [রাজা আসনে বসিল]।

হরি : [প্রথমে আলাপ]

আ—আ—আ—আ—আ।

আমার মনের মানুষ ফিরলো আজ একটু বেশি রাতে।
লাজুক লতা, ফুলের কলি ঝরল জোছনাতে ।।
বকুল ঝরা মাধবী রাতে,
আছ প্রিয় মোর সাথে,
নিশিদিন জাগি আমি ঘুম নাই আঁখিপাতে ।।
একটু বেশি রাতে।

রাজা : অপূর্ব হরি, অপূর্ব। তোমার তুলনা নাই। এই নাও হরি বিশ হাজার টাকার থোকা। [হরিকে টাকাটা দিল] ভজা একটু মাল দে।

ভুজঙ্গ : [ভুজঙ্গ পাত্রে মদিরা ভরে] এই নিন মহারাজ।

রাজা : এসো প্রিয়ে এসো। তোমাকে দু-বাহুর বন্ধনে জড়িয়ে ধরে প্রেমের একটু চুম্বন দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি। এসো হরি এসো আমার বক্ষে।

হরি : দেখুন আপনি মহারাজ, ধৈর্যহারা হলে সকলে আপনাকে নিচু ভাববে। একটু জলযোগ করুন। এই সভাতে আপনার মুখে আমি কালিমা লেপন করতে চাই না। কারণ সমাজ আপনাকে লজ্জা দেবে। আপনি বসুন আমি আসি।

[রাজা নির্জন কক্ষে বসিল। পাত্র হাতে সরবত নিয়ে আসবার সময় রাজাকে দেখিয়ে পটল দুবার সরবতের পাত্রে চুমুক দিল। রাজা দেখল।]

পটল : [রাজার সামনে গিয়ে] মহারাজ একটু সরবত পান করুন।

রাজা : সামান্য মেথর হয়ে তোর এতো স্পর্ধা। তুই আমাকে তোর উচ্ছিষ্ট সরবত পান করাতে চাস্। আগামীকাল প্রভাতে ঘাতক দিয়ে বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দেব, তোকে হত্যা করার জন্য।

হরি : [দ্রুত ছুটে এসে] না-না হুজুর এ আদেশ ফিরিয়ে নিন। কিন্তু কেন এমন হলো হুজুর, বলুন? চুপ করে কেন, কেন? [রাজার পা দুটো জড়িয়ে ধরল হরিদাসী]

রাজা : পটল সরবত উচ্ছিষ্ট করে আমাকে পান করাতে আসছে। কত বড় ওর দুঃসাহস, তাই .....

হরি : আপনার পায়খানা পরিষ্কার করা একজন মেথরকে হত্যা করে নিজের হাতকে কলঙ্কিত করবেন হুজুর? ও আমার সোয়ামী। ওর অপরাধ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার থেকে বেশি অপরাধ করেছেন আপনি।

রাজা : আমি?

হরি : হ্যাঁ মহারাজ হ্যাঁ। মেথরের উচ্ছিষ্ট সরবত পান করতে যদি আপনার ঘৃণা হয়, তাহলে [পটলের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে] ঐ মেথর কি আমাকে উচ্ছিষ্ট করে নাই? আর সেই উচ্ছিষ্ট সীতাভোগ খাওয়ার জন্য হরিদাসী মেথরাণীর উপর এত লালায়িত। এটা কি অপরাধ নয়? একথা যখন সারা দেশের মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকবে, তখন কি আপনার সম্মান বাড়বে মহারাজ? আমার মনে হয়, আমাকে ভোগের ভিতর দিয়ে না দেখে ত্যাগের মধ্য দিয়ে ছোট ভগ্নী বলে যদি হাত ধরে টেনে বুকের মাঝে নিতেন, দেখতেন দেশের মানুষ আপনার গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিয়ে পূজা করতো।

রাজা : হরি, তুমি থাম। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়! হরি তাই হোক, তুমি যখন আমার জ্ঞানচক্ষু ফিরিয়ে দিলে, তখন আমি তোমাকে আজ হতে ভগ্নীরূপে, ছোট বোনরূপে মেনে নিলাম।

[রাজা হরির হাত ধরিয়া টানিয়া বুকের মাঝে নিল।]

[গীত]

হরি : ওগো ও মোর প্রাণের দাদা আমায় তুমি ক্ষমা কর।
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সোয়ামীকে মোর ক্ষমা কর ॥
আমায় তুমি বোন বলিলে,
তুমি যে মোর দাদা হলে,
দাদা বোনের মিলনস্থলে, এ সভা হলো সুন্দর ॥

রাজা : ওরে বোন হরি তোকে আমি ক্ষমা করলাম। পটলকে ক্ষমা করলাম। ক্ষমা না করে কি থাকতে পারি। ভাই পটল, তুমি আমার পাশে এসো। [পটল, ভুজঙ্গ, হরি রাজার পাশে এসে দাঁড়াল।]

সকলে : 'জয় রাজা সূর্যকান্তের জয়।' 'জয় রাজা সূর্যকান্তের জয়।'

[সমাপ্ত]

মন্তব্য : [পালাটি কাজী নজরুল ইসলামের লেটো জীবনের শেষের দিকের রচনা। প্রথমে সৈয়দ খোরসেদ আলী পালাটি নিয়ে আসেন। তাঁর কাছ থেকে পালাটি লেটো শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পালাটি আছে 'দাঁত কথায়', অর্থাৎ মুখে মুখে। বর্ধমান জেলার, কাটোয়া মহকুমার, কেতুগ্রাম থানার খাসপুর গ্রামের প্রবীণ লেটো শিল্পী কাজী আব্দুস সুকুর সাহেবের 'দাঁত কথা' থেকে সংগৃহীত।]

সম্পাদকের সংযোজন : প্রবন্ধকার মুহম্মদ আয়ুব হোসেন একনিষ্ঠ ক্ষেত্রসমীক্ষক। তিনি লোকসংস্কৃতির অপরাপর উপাদানের সঙ্গে কিছু লেটোও সংগ্রহ করেছেন। এবং তিনি মনে করেন যে ঐগুলি সবই কাজী নজরুলের রচনা। ঐ লেটোর কিছু কিছু নজরুলের রচনা হতেও পারে— কিন্তু সবগুলিই নজরুলের—এ-বিষয়ে সম্পাদক ভিন্নমত পোষণ করেন।

[পরিবেশ, দর্শক ও প্রচার] :

গ্রাম নিয়েই ভারত, গ্রাম নিয়েই বাঙলা। বাঙলার মানুষের বেশিরভাগ কৃষিজীবী। এদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন গ্রামে থাকে তেমনি তাঁরা প্রায় সবাই কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বর্ষাকালে শুরু হয় মূল ফসল—ধান চাষের কাজ। ধান চাষের পর তার পরিচর্যা ইত্যাদি চলে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ শুরু হয় ধান কাটা ও ঝাড়াই বাঁধাই। শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সময়ে গ্রামবাঙলার নানাস্থানে মেলা বসে। চিত্ত-বিনোদনের জন্য এইসব মেলায় এবং গ্রামে গ্রামে চলে নানা প্রকারের নাচ-গান। এই রকম কয়েকটা গ্রাম

মিলিয়ে যে এলাকা তার মাঝে কোনো এক জায়গায় বসে হাট। গ্রামে-গ্রামান্তরে নানা দেবদেবীর আটন এবং পীরের মকবরা—এ-সবকে ঘিরে বৎসরান্তে একবার মেলা বসে। এই মেলায় ভিড় করে গ্রামের মানুষ। একদা ব্যাপকভাবে এইসব মেলা-খেলায় হতো লেটো, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি। বর্তমানে এসবের প্রচলন বিশেষভাবে কমে গেছে।

গ্রামের মধ্যে পুকুরের প্রশস্ত পাড়ে, গোয়ালঘরের অনতিদূরে ধান ঠেঙানো খামারবাড়িতে, মেলাতলার পাশে ধানকাটা নাড়াযুক্ত জমির ওপর বসতো বা আজো বসে লেটোগানের আসর। সেখানে টাঙানো হতো ছোটো বড়ো শামিয়ানা [এগুলো তখন জমিদারবাড়ি থেকে পাওয়া যেতো], গ্রামের মানুষ এই এবড়ো-খেবড়ো ধুলোমাটি নাড়াযুক্ত জমিতে বসে শোনে লেটো।

গ্রামে যেখানে লেটোগানের আসর বসতো, সেখানে গ্রামের দু-একজন বসাতো চা, বিস্কুট, বাদামভাজা, চানাচুর, পান-বিড়ি এবং পাঁপড়, তেলেভাজার দোকান।

গানের আসরকে ঘিরে ছেলে, বুড়ো, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং মেয়েদের মধ্যেও দেখা যেতো আনন্দ-উদ্দীপনা। উৎসাহী দর্শকদের অনেকেই লেটো দলের বিভিন্ন শিল্পীকে চিনতো এবং কোনো বিশেষ ভালো শৌখিন শিল্পী এলে মুখে মুখে চলতো তার আলোচনা।

তখনকার দিনে এই গানের প্রচারের জন্য খবরের কাগজে আজকের যাত্রাদলের মতো বিজ্ঞাপন দিতে হতো না। কোনো একটা গ্রাম বা মেলাতলায় গান হলে, আশপাশের বহু গ্রাম থেকে লোক এসে গান শুনতো। দূর গ্রামের কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব-জামাই এলে তারাও গান শুনতো, কিংবা যে গ্রামে পাওনা হতো, গান শোনার পর সেই গ্রামের লোক কোনো কাজে বা কুটুম্বিতার কারণে অন্য গ্রামে গেলে তার দেখা ও শোনা লেটোগানের দলের কথা সেখানে বলতো। বলতো শিল্পীদের অভিনয়ের কথা। এইভাবে মুখে মুখে, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে লেটো দল বা দলের শিল্পীদের অভিনয়ের কথা প্রচার যেতো।

[মহিলা শিল্পী] :

প্রথমত লেটোগানে কোনো মহিলা শিল্পী ছিল না। কিশোর ও যুবকরা কিশোরী ও নারী সেজে অভিনয় করতো এবং গান গাইতো। পাঁচের দশকের শেষ দিকে বর্ধমান জেলার রায়না থানার উচালন গ্রামে শেখ

কাজেম আলীব একটি লেটোর দল ছিল। এই দলের খুব সুনাম ছিল। এই গ্রামেব আদিবাসী সাঁওতাল পাড়ায় লক্ষ্মী মাণ্ডী নামে এ নৃত্যগীতপটিয়সী যুবতী ছিল। লেটোর প্রতি ছিল তাঁব খুব আকর্ষণ। সে প্রায় গান করাব জন্য ঐ কাজেম আলীর দলে যেতো। এব. জন্য সাঁওতাল সমাজে তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। যুবতীটি ছিল দৃঢ়চেতা। সব ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সে কাজেম আলীর দলে যোগ দেয়। নাচে গানে অভিনয়ে সে ছিল অনন্যা। তার অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য এই দলের খ্যাতি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও ২৪-পবগণা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীমতী লক্ষ্মী মাণ্ডী এখনও জীবিত আছেন।

এই শতাব্দীর সাতের দশকে হিন্দু সমাজের তপশীলভুক্ত ও দুঃস্থ মুসলিম কিশোরী-যুবতী লেটোব অভিনয় ক্ষেত্রে যোগ দেয। ক্রমে ক্রমে এইসব গ্রাম্য মেয়েরা নাচে-গানে অভিনয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। এরা এখন অভিনন্দনযোগ্য অভিনয় করে।

[লেটোর ক্রমাবনতি ও বর্তমান অবস্থা] :

মূল নাম লেটোগান হলেও এই গানের অঙ্গীভূত ছিল 'খেস্‌সা গান' ও 'ধাপ্‌সা গান' ও 'বঁদলেটো' বা 'বাঁধালেটো'। বর্তমানে খেস্‌সা ও ধাপ্‌সা গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্ধমান-বীরভূমের কিছু কিছু এলাকায় বঁদলেটোর দল আছে।

বর্তমান শতাব্দীর ছয়ের দশকের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে লেটো থেকে 'ছ্যাঁচবা গানে'র উদ্ভব হয়। এ গান ছিল একক ডুয়েট ও ছোট ছোট নৃত্য-গীতি-নাট্য। আদিরসের পরিমাণ ছিল বেশি।

পরে লেটো-ছ্যাঁচরা ভেঙে উদ্ভব হয় 'আলকাটাকাপ গান'। এ-গানও ছিল নৃত্য-গীত-নাট্যযুক্ত। কিন্তু ঠিক ছ্যাঁচরা-আলকাটাকাপ ভেঙে উদ্ভব হয় 'আলকাপ' গানের। উত্তর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত নট 'ঝাঁক্‌সু' তাঁর প্রতিভা ও শিক্ষায় এই আলকাপ গানকে নতুন রূপদান করেন। তাঁর শিক্ষার ধারা পথে এ গান বেশ জনপ্রিয়। তাঁর দুইটি কন্যা এখনও আলকাপের নটী। এ-বিষয়ে তাঁরা সফল মহিলাশিল্পী। উক্ত জেলায় ভগবানগোলা এলাকায় এ-গানের ভালো দল আছে।

[কিছু প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পী] :

লেটোগানের যেসব প্রাচীন শিল্পী নৃত্য, গীত, হাস্যরস, এবং অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন বর্ধমান জেলার উচালনের শেখ

কাজেম আলী, আবদুল লতিব [সংদার], শ্রীমতী লক্ষ্মী মাণ্ডী, আবদুল শুকুর, আবুল হাশেম, মুবাই শেখ, পাগল দাস, অন্নদাপ্রসাদ কেওড়া, জোবেদ মির্জা, আবদুল খালেক ও আবদুর রহমান, বীরভূমের আশুতোষ দাস, মনচোরা দাস, শেখ আবদুল আজিম ও মানিক খান প্রমুখ। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে কালো রজক, কার্তিক দাস, করুণাকেতন হাজরা, ঝাঁকসুর দুই কন্যা এবং অধীর দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

১. 'নট-নাট্য-নাটক' : ড. সুকুমার সেন।

২. *Selected Asokan Epigraphs* : Sachchidananda Bhattacharyya

৩. সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' ১৩৭২ : ড. সুকুমার সেনের প্রবন্ধ 'বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা'।

৪. এই গান ও পালাগুলি আবুল হাশেম, আব্দুল খালেক, কাজি আব্দুর রহমান, আব্দুর লথিব [লেটো শিল্পী], শেখ নজির হোসেন [লোক-সংস্কৃতি গবেষক] এবং বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত জনাব মুহম্মদ ইসমাইল সাহেবের স্মৃতি থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে।

□

গ্রামীণ লোকনাটক : ভাঁড়যাত্রা

শ্যামল বেরা

সূচনা : বাঙলার লোকনাটকের আসরে ভাঁড়যাত্রা আজও প্রবেশাধিকার পায়নি। বলা ভালো, সে অধিকার দেওয়া হয়নি । আবার, এটাও ঠিক অনেকের কাছে বিষযটি অজানা, কাবণ, এব বিষয়-ভাবনা ও নাচ-গান, আদিবসাত্মক। এ কথা আংশিক সত্য হলেও, সর্বাংশে নয়। বাঙলা, তথা ভাবতেব লোকনাট্যে যে-সব মৌল বৈশিষ্ট্য বয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একটি ভাঁড় জাতীয় চরিত্রের উপস্থিতি। এই রসিক চবিত্রটি হলেন রঙদাব বা সঙদার বা বিলিফ ক্যারেকটার, কিংবা ভাঁড়াযাত্রাব 'ভাঁড়'। আজ অপ্রচলিত হলেও এক সময় গ্রামবাঙলার নানান অঞ্চলে বমরমিয়ে এব আসর বসতো। শুধু কি ভাঁড়যাত্রা? পাশাপাশি চলতো নাথযাত্রা, পীরযাত্রা, গদাভারত, বামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি। এখানে আমাদেব আলোচ্য কেবল 'ভাঁড়যাত্রা'।

সংজ্ঞা : 'ভাঁড়' শব্দটি তদ্ভব। এসেছে সংস্কৃত 'ভণ্ড' শব্দ থেকে [নাসিক্যীভবনের পর] থেকে। 'ভণ্ড' শব্দের অর্থ 'কপট' হলেও 'ভাঁড়' শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। 'ভাঁড়' শব্দের আভিধানিক অর্থ হাস্যরসিক বা বিদূষক। আর, 'যাত্রা' শব্দের বহুমাত্রিক অর্থের মধ্যে 'গীতাভিনয়' অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। ভাঁড়যাত্রার 'ভাঁড়' রঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়ে আসর মাতিয়ে রাখেন। এই রঙ্গকৌতুক সব সময়েই স্থূল হতো, তা নয়, অনেক সময়েই তার পরিবেষণ খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। কোন কোন পালার এক একটি দৃশ্য শেষ হলে, 'ভাঁড়' তাঁর এক সঙ্গিনীকে এনে কয়েক মিনিট দর্শকদের হাসিয়ে যান। আবার, কোন কোন পালায় 'ভাঁড়' নিজেই একটি প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেন। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ভাঁড় অর্থাৎ বিদূষক চরিত্রের তাৎপর্যময় উপস্থিতির কথা আমাদের জানা। পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যে ভাঁড়েব উপস্থিতিটি লক্ষ্য করার মতো। যাইহোক, লোকনাটকের ভুবনে কে এই ভাঁড়যাত্রা? উত্তর : ভাঁড়যাত্রা হলো—রঙ্গব্যঙ্গমূলক, ধর্মীয় নিয়মতন্ত্রের বেড়াজালমুক্ত এক ধরনের গ্রামীণ নাটক বা গীতাভিনয়।

সীমানা : 'ভাঁড়যাত্রা' বাঙলার উপেক্ষিত লোকনাটক। এ-পর্যন্ত তথ্যানুসন্ধানে জানতে পেরেছি—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে এই যাত্রার আসর বসতো। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে এবং পাথরা, খেলাড় অঞ্চলে মাঝে মধ্যে আসর বসছে। মেদিনীপুর ছাড়া হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলেও মাঝে মাঝে এর অভিনয় হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উত্থাপন করতে হয়। তা হলো—কাশ্মীরের 'ভাঁড় পথর'-এর সঙ্গে বাঙলাব ভাঁড়যাত্রার অনেকটা মিল রয়েছে। 'পথব' বলতে বোঝায় 'পাত্র' অর্থাৎ চরিত্র বিশেষ। 'ভাঁড় পথর হলো ভাঁড়ের দ্বারা চরিত্রাভিনয়। .....ব্যঙ্গাত্মক পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী সমন্বিত কাশ্মীরেব লোকনাট্য।'[১] সুদূর কাশ্মীরের 'ভাঁড় পথর' আর বাঙলার 'ভাঁড়যাত্রা'ব সাদৃশ্য কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিষয়টি নিয়ে আরো গভীর গবেষণাব প্রয়োজন। তবে, ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া, যে মূল পার্থক্যটির কথা বলতে হয়, তা হলো—কাশ্মীরে 'ভাঁড় পথর'-কে খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয—কিন্তু বাঙলার ভাঁড় যাত্রা আজও উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত।

অভিনয় কাল : ভাঁড়যাত্রা সুনির্দিষ্ট কোন বার-তিথি মেনে অভিনীত হয় না। মূলত ফসল কাটার পব পৌষ মাসের শেষ থেকে শুরু হয়ে চলে বৈশাখ পর্যন্ত। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের ফাঁকা মাঠে এই আসর বসতো এবং বর্তমানেও কোথাও কোথাও বসে। ফসল কাটার পর গ্রামীণ মানুষজনের হাতে কিছু পয়সা কড়ি আসে এবং কাজে কিছু অবসর পাওয়া যায়। এই উভয়বিধ কারণ থেকে অবসর বিনোদনের লক্ষ্যে শীতের মরসুমে আসর বসে ভাঁড়যাত্রার। এখানে একটি কথা বলা দরকার—ভাঁড়যাত্রার প্রধান অঙ্গ ডাইস খেলা বা জুয়া খেলা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে যেন ভাবা যায় না। যাত্রার আসরের পাশে সারা রাত চলে জুয়া খেলা। যাত্রার ব্যবস্থাপনাও নানাভাবে ঘটতো। কোন গ্রামের কয়েকজন লোক ঠিক করলেন তাঁরা ভাঁড়ের আসর বসাবেন। কিন্তু আসর বসাতে গেলে তো টাকা লাগবে। তখনই ঠিক হল কোন ডাইস পার্টি বসিয়ে টাকা তোলা হবে। আবার বিপরীতটাও ঘটতো। কোন ডাইস পার্টি এসে বললেন ভাঁড়ের আসরের ব্যবস্থা করবেন, পরিবর্তে তারা ডাইসের আসর বসাবেন। সারারাত ধরে জুয়া-যাত্রা—আর জল ও ধোঁয়ার নেশায় রজনী প্রভাত।

শিল্পী ও দর্শক সমাজ : ভাঁড়যাত্রার শিল্পীরা মূলত গ্রামের জনমজুর বা কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ। প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিল্পী মুসলিম সম্প্রদায়ের। বাকিরা হাড়ি-বাগ্‌দি-ডোম প্রমুখ নিম্নবর্গের মানুষজন। পরবর্তী কালে মাহিষ্য ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যাত্রা-পাগল কয়েকজন শিল্পী এদিকে এসেছেন। যাত্রার নেশা ছাড়া, রুজিরোজগারের তাড়নায় অনেকে এ পেশা গ্রহণ করেছিলেন। তবে যাঁরাই শিল্পী হিসেবে এসেছেন তাঁদের সামাজিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করতে হতো। যিনি দল পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় ওস্তাদ বা চালকদার। এ রকম কয়েকজন চালকদার হলেন : শেখ আব্দুল লতিফ [উচালন, শেয়ার বাজার, বর্ধমান], আসগর, কেরামত, তাপস দোলই [বালি দেওয়ানগঞ্জ, আরামবাগ, হুগলী]; প্রয়াত শেখ ইয়াসিন [গদি, বাগনান, হাওড়া]; ফদো, এস্তাজকাজি [গুণীন পাড়া, বাগনান, হাওড়া]; খুরসেদ আলি [পাথরা, মেদিনীপুর], প্রয়াত রহিম বক্স [মেছেদা, মেদিনীপুর]; লীলাবতী, গোলাপী, অমূল্য ক্যাওরা, হৃদয় বাগদী, রাজেন তিওর প্রমুখ। এঁরা যেমন দল পরিচালনা করতেন, তেমনি পালা রচনাও করতেন। মুখে মুখে একটি গল্প তৈরি করে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা চালকদার বলে দিতেন। শিল্পীরা অভিনয়ের সময় তাৎক্ষণিক প্রস্তুত সংলাপ ব্যবহার করতেন। শিল্পীরা অদ্ভুত বাচন ভঙ্গীতে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে আসর মাতিয়ে তুলতেন। দর্শকরা একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়তেন। এইসব শিল্পীদের অভিনয়ক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

ভাঁড়যাত্রায় যিনি 'ভাঁড়' হতেন তাকে বলা হয় 'রঙদার' কিংবা 'সঙদার'। বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক পরা রঙদার সারা আসরের মূল আকর্ষণ। রঙদারকে সঙ্গ দিতেন মহিলা শিল্পীরা। প্রথম পর্যায়ে পুরুষেরাই মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এই রকম একজন পুরুষ হলেন মনির দালাল [৭৫] হাতিহলকা, মেদিনীপুর গ্রামের মানুষ। যাইহোক, পরবর্তী পর্যায়ে মহিলারাই এলেন নারী চরিত্রে। তবে, এইসব মহিলা শিল্পীরা যাত্রার আসর মাতিয়ে বাহবা পেলেও সামাজিক ক্ষেত্রে কোন মর্যাদা পেতেন না। বলা যায়, এঁদের ছোট নজরে দেখা হতো। কারণ, অধিকাংশ মহিলাদের আনা হতো পতিতালয় থেকে। মেদিনীপুর স্কুলবাজারের গৌরী, মোহিনী; তমলুকের সুবলা, পারুল, রাধিকা, কমলা;

তমলুক সাইবার কাঞ্চনমালা; মেছেদার [?] লীলাবতী ও তাঁব মেয়ে গোলাপী ছিলেন ভাঁড়যাত্রাব শিল্পী। লীলাবতী ও গোলাপীব নিজস্ব দল ছিল, মেয়েদেব দল। লীলাবতীব শাস্ত্রজ্ঞান যেমন ছিল, তেমনি কণ্ঠ--- তাতে যোগ হয়েছিলো রূপ— বঙ্কিমের ভাষায়—উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। ফলে, লীলাবতীর আসর হয়ে উঠতো জনসমুদ্র। ভাঁড়যাত্রার মূল দর্শক-সমাজ হলেন মুসলিমপ্রধান গ্রামের লোকসাধাবণ; স্ত্রীলোক দর্শক প্রায় নেই বললেই হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের তথাকথিত অভিজাত মানুষজন এই আসব একেবারেই এড়িয়ে চলতেন। তবে, তাঁদের ছেলেপুলেদের অনেকেই লুকিয়ে দর্শকের আসনে এসে বসতেন। বর্তমানে অনেকেই ভাঁড়যাত্রা দেখছেন। ভাঁড়যাত্রার দলগুলি ৩/৪ জন থেকে ২০/২৫ জনেরও হয়, অর্থাৎ পালার চরিত্রানুযায়ী দল গড়া হতো।

বাদ্যযন্ত্র ও অনুষঙ্গ : ভাঁড়যাত্রার আদিপর্বে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ছিল—কর্নেট, বাঁশি, ঢোলক, ঝুমকো। পরবর্তীকালে তবলা, হারমোনিয়াম সহ ক্ষমতা অনুযায়ী তলা পার্টি [বাদ্যযন্ত্রের দল] ব্যবহার করতেন এবং কেউ কেউ করছেন। অভিনয় হয় ফাঁকা মাঠ-প্রান্তরে। সচরাচর উঁচু মঞ্চ তৈরি হয় না। চার কোণে চারটি বাঁশ পুঁতে মাথায় সামিয়ানা জা[illegible]য় কিছু টাঙিয়ে, কখনো বা খোলা আকাশের নিচেই অভিনয় হয়। আর পাশে চলে জুয়ার আসর। আগে অভিনয় হতো হ্যাজাকেব আলোয়—বর্তমানে ইলেকট্রিকে।

ভাঁড়যাত্রার বিষয় : ভাঁড়যাত্রার কোন লিখিত বই নেই। সবই মুখে মুখে রচিত এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত। বিযয-ভাবনার দিক থেকে এখানে দুটি বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। একটি লৌকিক দিক এবং অপরটি শাস্ত্রীয় দিক। লৌকিক দিকে রয়েছে মার্জিত-অমার্জিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কোন পালার উপস্থাপনা। আর শাস্ত্রীয় দিকে রয়েছে মানজীবনের গভীর তত্ত্বকথা। উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্য ভূমিকা গানের। যাইহোক, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভাঁড়যাত্রার বিষয়-ভাবনাকে চারটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি।

প্রথমত, এক ধরনের পালা যেখানে একটি কাহিনী থাকবে এবং ভাঁড় বা রঙদার নিজেই একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠবে। যেমন, বর্তমান আলোচনার সঙ্গে প্রকাশিত 'পাটশাগ তোলা' পালাটি। এ ধরনের আরো কয়েকটি পালা হল—'টাকার জোরে বুড়োর বিয়ে', 'লাউ চিংড়ি',

'কলাইওয়ালা', 'ঝিংঙে ফুল', 'গাভীন ভূত', 'ঘুঘুর ফাঁদ', 'কার পাওনা', 'গুরুব ঠ্যাং কাটা', 'বৌ বদল', 'কালেব হাওয়া', 'নটা লক্ষহীরা' প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত পালা। যেমন—সম্রাট আলাউদ্দীন, হরিশ্চন্দ্র, দাতা কর্ণ, রাধাবিনোদ, মেঘবতী ইত্যাদি। এ ধরনের পালায়—এক একটি দৃশ্যের পর কিংবা মাঝে মাঝে 'ভাঁড়' তার সঙ্গিনীকে এনে রঙ্গ কৌতুক পরিবেশন করে আসব জমিয়ে তোলেন। কিংবা, পালা শুরুব আগেই প্রায় ঘন্টা খানেক বা ঘন্টা দেড়েক ধরে 'ফার্স' দেওয়া হয় অর্থাৎ রঙ্গ কৌতুক কবা হয়।

তৃতীয়ত, অনেকটা কবি লড়াইয়ের মতো। দুটি দল নানা ধবনের প্রশ্নোত্তরেব মধ্য দিয়ে আসর মাতিয়ে তুলতেন।

চতুর্থত, অনেকে আবাব গোপাল ভাঁড় কিংবা প্রচলিত কোন রঙ্গব্যঙ্গমূলক কাহিনীকে পালায় রূপ দিয়ে অভিনয় কবতেন।

অভিনয় হতো চড়া মাত্রায়। বঙ্গরস যাই থাক না কেন প্রত্যেক শিল্পীকে সচেতন থাকতে হতো বিষযটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করাব ক্ষেত্রে। বিযয-ভাবনার মধ্যে কোন ধর্মীয় অনুশাসন নেই। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় 'প্রতিটি পালায় কাহিনীর সূচনা আছে, ক্রমোন্নয়ন আছে এবং তার একটি স্পষ্ট পরিণতি আছে।'[২] ভাঁড়যাত্রার বিযয়-ভাবনাব সঙ্গে 'লেটো' কিংবা 'আলকাপে'ব সঙ্গে অনেক মিল আছে। এ নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন '**গ্রামীণ নাটক : লেটোগান**'-এব আলোচনায়[৩] লেটোর যে সব পালার নাম করেছেন, ভাঁড়যাত্রার শিল্পীরাও সেসব পালার নাম করেছেন। যেমন, রাধাবিনোদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি। স্বভাবতই লেটোগানের পালা এবং ভাঁড়যাত্রার পালার মধ্যে কোন মিশ্রণ আছে কিনা অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ছড়া কাটাকাটি : ভাঁড়যাত্রার আসরে রঙদার ও তার সঙ্গিনী নানা রকম ছড়া বলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন। পালার মাঝে কিংবা এক-একটি দৃশ্যেব শেযে সময়-সুযোগমত এই ছড়া কাটাকাটি চলতো। ভাঁড়যাত্রার এটি একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। এরকম একটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত হলো :

সঙ্গিনী : তোমার মত পুরুষকে আমি বিয়ে করবো না।
আমরা কি যা-তা মেয়ে,

আমরা কি তেমন মেয়ে সইলো
তেমন মেয়ে সই।
আমরা জলের ভিতর উনুন কেটে
ভাজতে পারি খৈ।।

রঙদার : তোমরা জলের ভিতর উনুন কেটে
খৈ ভাজতে পার এমন মেয়ে।
তোমাদের খোলা ফাসাতে আমি জানি।

সঙ্গিনী : তোমরা কেমন করে খোলা ফাসাতে
পারো ফাসাও।

রঙদর : ছিপ নিলাম, বড়শি নিলাম
গেলাম পুকুর ঘাটে।
জোর করে খিঁচ মেরে দিলাম
তোদের খোলা গেল ফেঁসে
তোরা খৈ ভাজবি কিসে?.... ইত্যাদি।

ভাঁড়যাত্রার গান : মূলত ভাঁড় এবং তার সঙ্গিনীর কণ্ঠেই গান পরিবেশিত হয়। লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় দুটি দিকই গানের বিষয় হয়ে ওঠে। ভাঁড়যাত্রার গানে পুরাণ-কোরানের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সামাজিক প্রসঙ্গ, কখনো কখনো গানের মধ্যে আদিবাসীদের গান ও সুরের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এখানে দুটি গানের নমুনা ও স্বরলিপি দেওয়া গেল :

ভাঁড় : ও তুই মেলায় যাবি?
সঙ্গিনী : হঁ হঁ।
: কি লিবি?
: হাতের চুড়ি।
: হঁ হাঁ
: তুই লিবি?
: না অ-দিকে দুব?
: না, না।

ভাঁড় গান ধরে ·

ঘরে আছে ভাঙা ঝুড়ি
তাই ভাঙিয়ে গড়িয়ে দেবো হাতের চুড়ি।
হাত নেড়ে চেড়ে ভাত দিবি বেড়ে
ও তোর হাতে ধরি, পায়ে পড়ি।
ও তুই আমার কথা রাখিস রে
ও তোর ভালোই হবে, হবে ভালোই হবে
ভালোই হবে। *

এই অংশটিকে দীর্ঘায়িত করা যায়। একই সুর ও আঙ্গিকে 'চুড়ি'র জায়গায় আসে 'পায়ের মল', 'মাথার কাঁটা', 'কোমরের বিছা', 'কানের দুল', 'নাকের নলুক' ইত্যাদি। এবং একই ভাবে গানের প্রথম লাইনের 'ঝুড়ি'র জায়গায় ব্যবহৃত হয় 'ভাঙা কুড়োল', 'মুড়ো ঝাঁটা', 'তেঁতুল বিছা', 'ভাঙা কুলো', 'ভাঙা ঢোলক'। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে দাপিয়ে বেড়ায় রঙ্গদার ও সঙ্গিনী। সঙ্গিনীর চাওয়ার শেষ নেই। রঙ্গদার তাকে ভাঙা ঝুড়ি থেকে হাতের চুড়ি, ভাঙা কুড়োল থেকে পায়ের মল, মুড়ো ঝাঁটা থেকে মাথার কাঁটা, তেঁতুল বিছা থেকে কোমর বিছা, ভাঙা কুলো থেকে কানের দুল, ভাঙা ঢোলক থেকে নাকের নলুক গড়িয়ে দেবে। দর্শকদের কাছে দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

২. এত দিনে গোলামবাবু ডুবলো মন তোমার
পুড়িয়েছো কাছারি বাড়ি এই কি তোমার বাহাদুরী
আজ কোথায় রইল তোমার জমিদারী
আজ করে অহংকার, ডুবল নাম তোমার
আজ কোথায় রইল তোমার মাথা বুড়ি!
গোলাম ডাকাতি কেসে, গোলাম ভাবতেছে বসে
আজ আসামীগণ ধরতে না পেরে, মুখেতে হাসে
বাবুগো রয়ে গেল মনের ময়লা
বাবুগো ভেবে হলাম তবু সারা, ডুবল তোমার নাম।

* গানটি শুনিয়েছেন ভাঁড়যাত্রা ও রামযাত্রার শিল্পী, চালকদার ও রচয়িতা মোহন দাস [৪৫]। দেবখণ্ড, হুগলী।

দুরণ রাণা [৮০], কোলাঘাট-এর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

নন্দনপুরের পশ্চিম মাঠে, গোলাম কি ঐ ফেরি ঘাটে
ওগো যেমন করে পাঠা কাটে, তেমন কেটেছে গলা
ডুবল নাম তোমার।
তুমি গইলের গরু টেনে এনে
কাটো জলার মাঝখানে
করে অহংকার, ডুবল নাম তোমাব
গোলামবাবু ডুবল নাম তোমার।'

আরো একটি গান ও তার স্বরলিপি

অতি সাধের বিয়ে
আজ জমি বন্ধক দিয়ে
বউ মরণকালে কিছু বলে গেল না।
বউ-এর হাতে ছিল চুড়ি
আর ভাজতো গরম মুড়ি
শশা দিয়ে মুড়ি খাওয়া হল না।
অতি সাধের বিয়ে...
বউ-এর পায়ে ছিল মল
আর ধরে খেতাম জল
জল বিনে আমার প্রাণ বাঁচে না
অতি সাধের বিয়ে...

তাল দাদরা

স	র	স	র	র	র	গ	গ	গ			
অ	তি	সা	ধে	র	০	বি	য়ে	০			
প	প	প	প	প	প	প	ম	ম	সম	মপ	র
আ	জ	০	জ	মি	০	ব	ন্ধ	ক	দি	য়ে	০
র	র	র	রঁ	র	র	প	প	প	র	র	স
ব	০	উ	ম	র	ণ	কা	লে	০	কি	ছু	০
স	র	র	গ	গ	গ	র	র	র			
ব	লে	০	গে	ল	০	না	০	০			

স	স	স	র	র	র	গ	র	র	গ	গ	গ
ব	উ	এর	হা	তে	০	ছি	ল	০	চু	ড়ি	০

গ	গ	গ	প	প	প	প	ম	ম	গম	গম	গর
আ	র	০	ভা	জ	ত	গ	র	ম	মু	ড়ি	০

র	ব	ব	গ	গ	গ	ব	স	স	স	র	ব
শ	শা	০	দি	য়ে	০	মু	ড়ি	০	খা	ও	য়া

গ	গ	গ	ব	ব	র
হ	ল	০	না	০	০ *

সংগৃহীত পালা প্রসঙ্গে : ভাঁড়যাত্রার কয়েকটি পালা এবং কাহিনী বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। আপাতত 'পাটশাগ তোলা' নামের পালাটি এখানে উদ্ধৃত হলো। এ-পালা থেকে ভাঁড়যাত্রার স্বরূপ সন্ধানের সম্পূর্ণ চিত্র না পাওয়া গেলেও ভাঁড়যাত্রা কি তার আঁচ পাওয়া যাবে। পালাটি মূলত বিনোদন মূলক। পালার চাবটি চরিত্রই গ্রামের একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য-সদস্যা। প্রণয়-কেন্দ্রিক রঙ্গ-ব্যঙ্গের পালা এটি। সামাজিক অনুশাসন এখানে খবরদারি করতে পারেনি। চবিত্রগুলি মুক্ত বিহঙ্গের মত বাঁধাবন্ধনহাবা হয়ে বিকশিত হয়েছে। দুঃখকে হাসি দিয়ে ভুলিয়ে নিজেদের কামনা-বাসনাকে কৌতুকরসে মজিয়ে তুলেছে চরিত্রগুলো। পালাটিব এমন টানটান বুনোট সে, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, কিংবা দেখার সময় চোখের পাতা পড়ে না। প্রয়োজনমত অনেক জায়গায় পালাটিকে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে ভাঁড়যাত্রার মূল রস দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিনয়দক্ষতার উপর। এখানে

* গানটির স্থায়ী এবং অন্তরার সুর একই রকমের।
* স্বরলিপিটি তৈরি করে দিয়েছেন বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়।
* গানটি শুনিয়েছেন : কোলাঘাটের পাল্কীবাহক দুরণ রাণা [৮০], বর্তমানে ভিক্ষা করে দিন চালান। বহু লোকগান তাঁর স্মৃতিতে রয়েছে।

'আকারে' হচ্ছে পালাটির 'ভাঁড়' এবং তাঁর 'সঙ্গিনী' হচ্ছে 'জঞ্জালি'। এক-একটি সংলাপের কৌতুকরসের উৎস চরিত্রগুলির বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়দক্ষতা এবং তাৎক্ষণিক সংলাপ রচনার কেরামতিতে এসব পালা উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পালাটি বেশ পুরানো, কিন্তু অভিনয়কালে সময়-সমাজ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপ বদলে যায়। যেমন, আলোচ্য পালায়, জঞ্জালি যখন বলছে 'তোমাদের কি টাইটেল?' তার উত্তরে আকারে বলছে 'আমাদের হিরো অন্ডা মোটর সাইকেল।' এসব পরবর্তীকালের সংযোজন।

ভাঁড়যাত্রা কি লোকনাটক? : এ নিয়ে আলোচনা করতে হলে লোকনাটকের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হয়। এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে, আপাতত ভাঁড়যাত্রা বিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং সংগৃহীত পালাটিতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে। বাঙলার ভাঁড়যাত্রার সঙ্গে কাশ্মীরের 'ভাঁড় পথর' এবং আমাদের 'লেটোগান' কিংবা 'আলকাপে'র কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আলোচ্য পালার নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি 'গ্রাম্য নরনারীরই প্রতিনিধি', 'বিষয়বস্তু গ্রাম্যজীবনভিত্তিক'। সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে [extempore] রচিত হলেও এর একটি সূচনা এবং স্পষ্ট পরিণতি আছে। প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যে কোন 'কৃত্রিমতা নেই'। সর্বোপরি রয়েছে নাট্যরস। তাই, ভাঁড়যাত্রাকে আমরা লোকনাট্য বলতে দ্বিধা করি না।

শেষের কথা : ভাঁড়যাত্রার একটি পালা এই প্রথম প্রকাশিত হলো। 'ভাঁড়যাত্রা' নিয়ে যেসব তথ্য, এ-পর্যন্ত জানতে পেরেছি, তা সাজিয়ে দেবার চেষ্টা এখানে হয়েছে। বিষয়টিতে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার লক্ষ্য। বাঙলার লোকনাটকের মানচিত্রে 'ভাঁড়যাত্রা' আপন বৈশিষ্ট্যে স্থান পাক, এই আশা নিয়ে 'পাটশাগ তোলা' পালাটি এখানে উপস্থিত করা হলো :

পাটশাগ তোলা

রচনা : শেখ আব্দুল লতিফ [বর্ধমান]। স্মৃতি থেকে পালাটি বলেছেন : মোহন দাস [দেবখণ্ড, হুগলী]। সংগ্রাহক : শ্যামল বেরা [কোলাঘাট, মেদিনীপুর] সংগ্রহের তারিখ : ২৫.৭.১৯৯৯।

চরিত্রলিপি : বকারে—পিতা। আকারে—ঐ পুত্র। ভেঙালি—মা। ভঞ্জালি—ঐ মেয়ে।

প্রথম দৃশ্য

বকারে 'আকারে, আকারে ...

আকারে [ছেলে বাইরে থেকে সাড়া দিতে দিতে বলছে]
যাইরে বাবা বকারে, কি বলছো বাবা, কেন ডাকছো?

বকারে তোকে মানুষের মত মানুষ করেছি, তুই অনেক বড় হয়েছিস, এবার সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে। আমার বয়স হয়ে গেছে আমি আর কদিন বাঁচবো বল।

আকারে হ্যাঁ বাবা তাই তো তোমার বয়স হয়ে গেছে, তুমি গাছের পাকা ফল হয়ে গ্যাছো, কবে না কবে ঝড়ে পড়ে যাবে। আর এই পাড়ার ছেলেরা তোমাকে গুড়িয়ে সাবাড় করে দেবে। বাবা সত্যি বটে তুমি আমাকে অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছো, আমি তোমার বংশের প্রদীপ.....

বকারে . হ্যাঁ বাবা, সত্যিই তুই আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ।

আকারে : সারাদিন টিব টিব করে জ্বলবো, সন্ধ্যে হলে ফুস করে নিভে যাবো।

বকারে : না বাবা, ও কথা বলতে আছে, তুই আমার একমাত্র সন্তান।

আকারে . হ্যাঁ বাবা আমি তোমার বংশের একমাত্র শয়তান।

বকারে : আরে বাবা, শয়তান নয়, সন্তান। থাক বাবা সে-সব কথা, তুই এখন আমাদের চাষবাস দেখাশোনা কর।

আকারে : বাবা, আমি চাষবাস দেখাশোনা করবো, আমার বয়স কত গো বাবা?

বকারে : কেন রে পঁচিশ।

আকারে . আচ্ছা বাবা ও পাড়ার নাগড়ার বয়স কত?

বকারে : কেন আঠারো।

আকারে : বাবা, নাগড়া ক'টা ছেলের বাপ গো?

বকারে : কেন, তার তো দু'টো ছেলে।

আকারে : তার বয়স আঠারো বছর সে দু'টো ছেলের বাবা, আর আমার বয়স পঁচিশ বছর, আর আমার বেলায় মুড়া আমগাছটা।

বকারে : বেশ, বেশ বাবা তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। এবারে পাট-টা কাটা হলেই পাট বিক্রি করে তোর বিয়ে দেবো।

আকারে : বেশ পাটে যদি পোকা লেগে যায়, তাহলে আমার বিয়েতেও পোকা লেগে যাবে?

বকারে : না-রে, বাবা না। বিয়ে তোর দেবোই।

আকারে : বাবা কিছু দিন আগে আমার বিয়ের ফুল ফুটেছিল, ওদের পাড়ার এক পাগ্লাছাগল ছিল, সে ফুলটা খেয়ে গেল। না হলে আমার বিয়ে নিশ্চই হয়ে যেতো। বেশ বাবা আমি পাট-বাড়িতে আগল দিতে যাচ্ছি, তুমি আমার জন্য জলখাবার নিয়ে যেও।

বকারে : তা কি নিয়ে যাবো বলতো? মুড়ি?

আকারে : না বাবা, মুড়ি খেলে পেট গরম হবে।

বকারে : তা হলে রুটি?

আকারে : না বাবা, রুটি খেলে পায়খানা হবে।

বকারে : তা হলে পান্তা?

আকারে : না বাবা, পান্তা খেলে সর্দি হবে।

বকারে : তা হলে কি নিয়ে যাবো রে বোকা?

আকারে : আমার জন্য গরম গরম পান্তা নিয়ে যাবে।

বকারে : গরম গরম কি পান্তা হয়?

আকারে : হ্যাঁ, বাবা হয়।

বকারে : কি করে?

আকারে : গরমভাত রান্না করে, ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে। তাহলেই গরম গরম পান্তা হয়।

বকারে : বেশ তাই নিয়ে যাবো।

আকারে : তা হলে যাচ্ছি বাবা মাঠে—[প্রস্থান করতে করতে বলছে] বাবা, আর একটা জিনিস নিয়ে যাবে গো—

বকারে : কিরে কি নিয়ে যাবো রে .....

আকারে : আমার বিড়ি দেশলাইগুলো নিয়ে যাবে গো। [প্রস্থান]

বকারে : দেখেছো ছেলে কেমন শিক্ষিত! [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেজালি : জঞ্জালি, ও জঞ্জালি।

জঞ্জালি : [বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে] যাই গো মা ভেজালি, কেন ডাকছো মা আমাকে।

ভেজালি : দেখ মা, দেখতে দেখতে তুই অনেক বড় হয়েছিস। তোর বাপ যত দিন বেঁচে ছিল আমাকে কত ভালমন্দ জিনিস খাইয়েছে। তোর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর কোন ভালমন্দ জিনিস খেতে পাই নি। তুই একটা জিনিস খাওয়া না মা।

জঞ্জালি : কি খেতে চাইছো মা।

ভেজালি : দ্যাখ মা, ঐ দূরে, ঐ মোড়লদের পাটবাড়ি আছে, ওখান থেকে কিছু কচিকচি পাটশাগ আমায় তুলে এনে দে, আমি ভেজে পান্তা খাবো।

জঞ্জালি : বেশ মা, আমি মোড়লদের পাটবাড়ি থেকে তোমার জন্য কচি কচি পাটশাগ তুলে আনছি।

ভেজালি : খুব সাবধানে যাস মা। মোড়লদের একটা ছেলে আছে, ও খুব বদমাইশ, ওর সাথে কথা বলবি না।

জঞ্জালি : বেশ মা, তোমার কোন ভয় নেই। আমি এখনই আনবো। [প্রস্থান]

ভেজালি : মেয়েকে পাঠিয়ে দিলাম শাগ আনতে। আমি স্নান সেরে পান্তা ভাতের জোগাড় করি। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

জঞ্জালি : [গান করতে করতে প্রবেশ করে] আঃ কি সুন্দর পাটশাগ হয়েছে। যতগুলো খুশি নিয়ে যাবো। আর গাছপালাও ভেঙে ফেলবো, দেখি আমায় কে কি বলে? [পাটশাগ তুলতে থাকে] আজ ভালো ভালো পাটশাগ তুলবো।

আকারে : হ্যাট, হ্যাট, হ্যাঁট কাদের গরুগো, পাটশাগ ভাঙছে। ওরে কাদের লাল বগনা বাছুর গো, পাটশাগ ভাঙছে। [আরো কাছে যায়] যাঃ বাবা! এটা গরু নয় তো, কাদের মেয়েছেলে মনে হচ্ছে, ওরে বাপ্‌রে কি সুন্দর রে ....., এই, এই আমাদের পাটশাগ তুলছো ক্যানো?

জঞ্জালি . বেশ করছি। একি তোর বাপের পাটবাড়ি?

আকারে . এই বাবা কাটাস নি। জানিস আমি কি কবতে পাবি।
[হাত পাকাতে থাকে]

জঞ্জালি · কি করবি, দ্যাখ না একবার গায়ে হাত দিয়ে।
[দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয]

আকারে : [আস্তে আস্তে মেয়েটার গায়ে হাত দেয] ওরে বাপ্‌রে-বে— কি নরম।

জঞ্জালি . তুমি আমার গায়ে হাত দিলে কেন? আজ ছেলেব নাম ঘুচিয়ে দেবো।

আকারে . বেশ, আমি আজ মেয়েব নাম ঘুচিয়ে দেবো।
[দুজনে কোমব বাঁধে। আকারে লাঠিব আঘাত দিয়ে জঞ্জালিকে মারার ভঙ্গি করে। জঞ্জালি ও-মা-গো বলে চিৎকাব কবে কাঁদতে শুরু করে।]

আকারে [দর্শকদের দিকে তাকিয়ে] ওরে বাবা, ওকে এখনো মারিনি, ওর কান্নার বেগ দ্যাখো।

জঞ্জালি : বেশ, আজ আমি তোমাব বাবার নাম ঘুচিয়ে দেবো। [পায়ে করে একটা দাগ কাটে] যদি বাপের বেটা হয়ে থাকো, এই দাগটা পেরিয়ে এসে আমাকে মাববে। আর আমি যদি বাপের বেটি হয়ে থাকি, তাহলে এই দাগ পেরিয়ে তোমাকে মারবো।

[দু'জন মল্লযুদ্ধ শুরু করে। আকারে মাটিতে পড়ে যায। জঞ্জালি তাকে মারতে থাকে। আকারে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায। দর্শকদেব দিকে তাকিয়ে কথা বলে—]

আকাবে · এব সঙ্গে ঝগড়া করলে আমাকে মেরেই ফেলবে। তার চেয়ে, এর সাথে ভাব করে দেখি। [জঞ্জালিকে জিজ্ঞেস করে] তোমার বাড়ি কোথায়?

জঞ্জালি ঐ দূরে—। তোমার বাড়ি কোথায?

আকারে ঐ মোড়ল পাড়ায়। তোমাব বাড়িতে কে কে আছে?

জঞ্জালি আমার কেউ নেই, শুধু মা আর আমি।

আকারে তোমার মায়ের নাম কি?

জঞ্জালি আমার মায়ের নাম ভেজালি।

আকারে তোমার নাম কি?

জঞ্জালি আমার নাম জঞ্জালি। তোমার কে কে আছে?
আকারে : আমার কেউ নেই। আমার বাবা আর আমি।
জঞ্জালি : তোমার বাবার নাম কি?
আকারে : আমার বাবার নাম বকারে।
জঞ্জালি : তোমার নাম কি?
আকারে : আমার নাম আকারে। তোমাকে একটা কথা বলবো। ধর তোমারও যখন কেউ নেই, আর আমারও কেউ নেই। তার চে তুমি এক কাজ করো।
জঞ্জালি : কি কাজ? [আকারে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নানান অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। বিয়ের কথা বলবো কি বলবো না!]
জঞ্জালি : আরে কি ভাবছো, বলো না কি বলবে?
আকারে : তোমার বিয়ে হয়েছে?
জঞ্জালি : না।
আকারে : তোমার ছেলেপুলে কয়টি?
জঞ্জালি [রেগে গিয়ে] আমার বিয়েই হল না, আবার ছেলে কয়টি?
আকারে : ও, হ্যাঁ, তাও-তো বটে। ওর তো এখনো বিয়েই হয় নি, ছেলে কোথায় পাবে? তার চে তুমি এক কাজ করো। আমাকে বরং বিয়ে করো।
জঞ্জালি : [রেগে গিয়ে] কি বললে, তোমাকে বিয়ে করবো?
আকারে : তোমার নেই ব্যান ধান। আমারও নেই এঁড়ে গরু। তাই বলছিলাম, আর চিন্তা করে কি হবে?
জঞ্জালি আচ্ছা, তোমরা কি জাতি?
আকারে : আমরা সুপারি কাটার যাঁতি।
জঞ্জালি : আরে সে যাঁতি নয়, মানে তোমাদের কি বংশ?
আকারে : আমাদের নির্বংশ।
জঞ্জালি : আরে সে কথা বলছি না, তোমাদের কি গোত্র?
আকারে : আমাদের খেঁকশিয়ালি গর্ত।
জঞ্জালি : আরে সে কথা বলছি না, তোমাদের কি টাইটেল?
আকারে : আমাদের হিরো অন্ডা মোটর সাইকেল।
জঞ্জালি : আরে কি বোকা ছেলের পাল্লায় পড়লাম। আমি সে কথা বলছি না। তোমরা কি সজাতি?

আকারে আমরা খুব ভালো সজাতি।

জঞ্জালি কি?

আকারে : আমরা সবার ঘরে খাই, আমাদের কেউ খায় না।

জঞ্জালি . সে আবার কি জাতি।

আকারে আমরা বারো জাতি।

জঞ্জালি . আরে আমি সে কথা বলছি না।

আকারে : দ্যাখো, আমরা জাতিতে মোড়ল।

জঞ্জালি · তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি।

আকারে : [দর্শকদের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলে] ওরে বাপ্‌রে এতক্ষণে মত হয়েছে।

জঞ্জালি . আচ্ছা তুমি বিয়েব মন্ত্র জানো।

আকারে : না তো। আমি তো কোন দিন বিয়ে করি নি। আমার বাবাও কোনদিন বিয়ে করে নি।

জঞ্জালি কি বললে, তোমার বাবাও কোন দিন বিয়ে করে নি। তাহলে তুমি হলে কোথা থেকে।

আকারে : কেন হবো না। আমি আকাশদুম। আর আমার বাবা ফটাসদুম।

জঞ্জালি : তার মানে?

আকারে . আমি আকাশ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, আর আমার বাবা বাজির ভেতর থেকে বেরিয়েছে। তাই, আমরা আকাশদুম, আর ফটাসদুম। তাই বিয়ের মন্ত্র জানি না।

জঞ্জালি . তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না।

আকারে . ওঃ কি মুসকিল, যদি চলে যায়, তাহলে আমার আর বিয়ে হবে না। [দর্শকের দিকে তাকিয়ে] তাব চেয়ে যা পারবো, বিয়েব মন্ত্র বলে দিই।

জঞ্জালি : বেশ তুমি মন্ত্র না জানো, আমি বলে দিচ্ছি। এই নাও মালাটা ধরো। [আকারের হাতে মালা দেয়] আমার সঙ্গে বিয়ের মন্ত্রটা বলো। —ওগো আমার প্রাণ পিয়সি।

আকারে : [বলার চেষ্টা করে] ওগো আমার প্রাণের পিসি।

জঞ্জালি : আরে হচ্ছে না। বলো ওগো আমার প্রাণ পিয়সি।

আকারে : ওগো আমার প্রাণ পিয়সি।

জঞ্জালি : আমার মালা তোমার গলে, আজ থেকে তুমি আমার একলাকারে স্ত্রী হলে.... .

আকারে : আমার মালা তোমার গলে, তুমি আমার আজ থেকে ইস্ত্রি হলে। আমি তোমার মিস্ত্রি হলাম।

জঞ্জালি : আরে ইস্ত্রি কি? বলো স্ত্রী হলে।

আকারে : বেশ তুমি আমার স্ত্রী হলে। [মালাটি মেয়ের গলায় দেয়]

জঞ্জালি : তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাকে একটা প্রণাম করি। [প্রণাম করে। আকারে তার পিঠে পা তুলে দেয়]

আকারে [পিঠে পা রেখে] আশীর্বাদ, শিরোচ্ছেদ, দিনে দিনে বংশলোচন, চারিদিকে ধবলাকার। এক কিলো চালের ভাত, পনের দিন খাও। পাইখানা করতে করতে হাওড়া যাও। আমি আশীর্বাদ করি তোমার একটা ঠোট কাটা বেটা হোক।

জঞ্জালি : [ভেউ ভেউ করে কাঁদে] ও-গো-মা-মা তুমি আমাকে কি আশীর্বাদ করলে গো। ঠোট কাটা বেটা আমার কি হবে গো। [উঠে দাঁড়ায়] — হ্যাঁ গো ঠোট কাটা ব্যাটা যদি হয়, তাহলে কি ভালো হবে?

আকরে : সত্যিই তো, আমি যদি ছেলেকে বলি—বাবা, দোকান থেকে এক টাকার বিড়ি কিনে আনো তো। ছেলে বলবে—হুঁ-দ-হুঁ-দ-দ। বেশ তোমাকে আমি ভালো আশীর্বাদ করছি। তোমার ভালো ব্যাটা হোক। তুমি একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও।

জঞ্জালি : কেন?

আকারে : তোমাকে একটা প্রণাম করবো। [প্রণাম করে]

জঞ্জালি : হ্যাঁ-গো তুমি যে আমার স্বামী হও, তুমি আমাকে প্রণাম করলে?

আকারে : আরে বোস না। স্ত্রীর পায়ের ধূলা খেলে সকালে পায়খানা পরিষ্কার হয়। যাক সব কথা। চল তোমাকে এবার আমাদের ঘরে নিয়ে যাবো। আর আগে তুমি আমায় একটা ভালো গান শোনাও তো —

[দ্বৈত কণ্ঠে গান হয়। এমন সময় বাইরে থেকে বাবা বকারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

বকারে : [নেপথ্যে] ওরে আকারে, দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গেল, তুই জলখাবার খাবি নে, আমি তোর জন্যে জলখাবার এনেছি।

আকারে : এই রে, বাবা জলখাবার নিয়ে ডাকাডাকি করছে। কি করি বলতো—

জঞ্জালি : তোমাব বাবাকে বল এখন খিদে পায় নি।

আকারে : বাবা, এখন আমি খাব না। তুমি এখন জলখাবার নিয়ে যাও।

[আবার গান শুরু হয়। এমন সময় মা ভেজালির ডাক শোনা যায়]

ভেজালি . [নেপথ্যে] ও জঞ্জালি গো, তুই পাটশাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়! কত বেলা হয়ে গেল। কখন পান্তা খাবো।

আকারে . তোমাকে কে ডাকছে?

জঞ্জালি : আমার মা, কি কববো বলতো?

আকাবে : [রেগে গিয়ে] ওখানে ইঁট পড়ে আছে ফিকে দাও। তোমার মায়ের মাথাটা ফেটে থাক।

জঞ্জালি : তা আবাব হয় নাকি? তার চে এখান থেকে পালিয়ে চলো।

[দুজনে গান করতে করতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বকারে : তাই তো ছেলেটা যে কোথায় গেল, সারা মাঠ ঘুরে ফেললাম, ছেলেটাকে তো দেখতে পেলাম না। তাহলে আমি এখন কোন দিকে যাই।

ভেজালি : মেয়েটাকে তো দেখতে পেলাম না, কোথায় পাটশাগ তুলতে গেছে কে জানে। কত বেলা হয়ে গেল, এখনো দেখতে পেলাম না। [বকারে ও ভেজালি দু'জনে পেছন দিক করে এইসব বলতে বলতে প্রবেশ করে এবং ধাক্কা লেগে উভয়েই পড়ে যায়—উভয়েই উভয়কে প্রশ্ন করে— কে? ধাক্কা মারলে কেন? উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়]

বকারে : তুমি কাকে খুঁজছো?

ভেজালি : আমার মেয়েকে খুঁজছি।

বকারে : তোমার মেয়ে কোথায় গেছে?

ভেজালি : আমার মেয়ে পাটশাগ তুলতে এসেছিল।

বকারে : আমারও ছেলে পাটবাড়ি আগলে দিতে এসেছিল।

ভেজালি : তাহলে বুঝেছি, ব্যাপারটা কি ঘটেছে।

বকারে : আমিও তো তাই ভাবছি, ওরা দুজনে কি কোথাও পালিয়ে গেছে। বেশ যাক, ভেবে আর কাজ নেই। আচ্ছা তোমার কোথায় বাড়ি?

ভেজালি : ঐ দূরের গ্রামে। তোমার কোথায় বাড়ি?

বকারে : ঐ মোড়ল পাড়ায়। তোমার কে কে আছে?

ভেজালি : আমার কেউ নেই। আমার মেয়ে আর আমি।

বকারে : তোমার স্বামী নেই?

ভেজালি : না, আমার স্বামী নেই। অনেকদিন হল মারা গিয়েছে।

বকারে : আমারও কেউ নেই। আমার ছেলে আর আমি।

ভেজালি : তোমার বউ নেই।

বকারে : না।

ভেজালি : কি হয়েছে, কোথাও পালিয়ে গিয়েছে?

বকারে : বহুদিন হল তার কোন খোঁজ পাই নি। তোমাকে একটা কথা বলবো। তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে, যখন পালিয়ে গেছে, তাহলে শুধু তুমি আর আমি। আর চিন্তা করে কি হবে। তার চে তুমি আমাকে বিয়ে করে ফেলো।

ভেজালি : বেশ, তোমার যখন পছন্দ, তখন আমারও পছন্দ।

বকারে : বেশ, তাহলে চলো ঐ দূরে একটা কালীমন্দির আছে, মা কালীকে সাক্ষী রেখে, আমি তোমাকে বিয়ে করে ফেলবো। [উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[ভেজালি ও বকারের প্রবেশ]

বকারে : এই আমাদের ঘর। তুমি এইখানে চুপ করে বসো। ছেলেটা আসে কিনা দেখি।

[বাইরে থেকে ছেলের সাড়া পাওয়া যায়]

আকারে : বাবা গো-বাবা-

বকারে : কে রে, আকারে? আয় বাবা, আয়। এতক্ষণ কোথায় ছিলি।

আকারে : বাবা, আমাকে খুব খিদেয় পেয়েছিল, তাই পুকুরে জল খেতে গিয়েছিলাম।

বকারে : আমি তোকে কত খুঁজলাম, দেখতে পেলাম না। তাই ফিরে এলাম এবং একটা বড় ভুল করে ফেললাম।

আকারে কি করেছো বাবা? ভাত রান্না করতে ভুলে গেছো?

বকারে : না, বাবা—

আকারে : তবে কি হয়েছে বাবা, বেড়ালে মাছ ভাজা খেয়ে ফেলেছে।

বকারে : না, বাবা, ওই একটা ভুল করে ফেলেছি।

আকারে : তবে কি হয়েছে বল না বাবা। বাবা তোমার গায়ে কিসের গন্ধ মনে হচ্ছে।

বকারে : না বাবা, ও কিছু না, ওই একটা ভুল হয়ে গেছে—

আকারে : তুমি যেন কিছু লুকোতে চাইছো। কি হয়েছে বলতো বাবা।

বকারে দেখ বাবা, তোকে খুঁজে না পেয়ে, আমি এই পাটবাড়িতে একটা বিয়ে করে ফেলেছি।

আকারে : [রেগে গিয়ে] বাবা, তুমি বিয়ে করেছো? তুমি এই বয়সে বিয়ে করেছো? [আরো রেগে ওঠে] এ তুমি কি করেছো বাবা, তুমি বিয়ে করে ফেললে। [দর্শকের দিকে তাকিয়ে] বাবাকে কি দোষ দেবো। আমার বউ-ও ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বকারে : তোর কি হয়েছে বলতো। মনে হচ্ছে কি যেন ভাবছিস?

আকারে : বাপ-বেটার একই তো কেস গো।

বকারে : কি কেস রে। এক উকিল ধরলেই বাপ-বেটার কেস ফায়শালা হয়ে যাবে। কি কেস রে খুলে বল।

আকারে : আমিও বিয়ে করে ফেলছি বাবা।

বকারে : তুইও বিয়ে করেছিস? কই রে, বউমা কোথায়?

আকারে : ঐ দাঁড়িয়ে আছে। বাবা, মা কোথায় গো?

বকারে : ঐ ঘরের কোণে বসে আছে।

[আকারে মা-কে প্রণাম করতে যায়। বউমা ছুটে এসে বাবাকে প্রণাম করে।]

বকারে : যা হয়েছে হয়েছে। চ বাবা আমরা দু-বাপ বেটাই মাঠে কাজ করি, ওরা ঘরের কাজ করুক।

আকারে : না, বাবা, আমার আজকে বিয়ে হয়েছে, আমি আজকে মাঠে যাবো না। তুমি চলে যাও।

ভেজালি : [ভেতর থেকে] ওগো কত্তা, এ দিকে শোন, তোমার ছেলেকে মাঠে পাঠিয়ে দাও। তুমি আজকে যেও না।

জঞ্জালি : [আকারে-কে] এদিকে শোন, তুমি মাঠে যেও না। তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও। বাবাকে বলো আমাদের আজ ফুলশয্যা। আজকে মাঠে যাওয়া হবে না।

বকারে : তুই বড় হয়েছিস, ঘরে বসে থাকলে চলবে। যা বাবা মাঠে যা—

আকারে . বাবা, তুমি এই বয়সে বিয়ে করতে পাবলে। আর মাঠে যেতে পারলে না—

বকারে : তাহলে চল দুজনেই যাই। [দুজনেব প্রস্থান]

ভেজালি : [ঘরের ভেতর থেকে] বউমা, আমাকে একটু চা করে দাও।

জঞ্জালি : আমি পাববো না মা, তুমি আমাকে একটু চা করে দাও।

ভেজালি : ওরে বাবা রে, এ কোন বংশের মেয়ে গো, মুখের উপর কথা। ভালো মুখে বলছি বউমা, আমাকে একটু চা করে এনে দাও।

জঞ্জালি . আমি ভালো মুখে বলছি মা, আমাকে একটু চা কবে দাও।

[দু'জনে ঝগড়া শুরু করে]

ভেজালি : ওলো কুমড়োখাকির বেটি।

জঞ্জালি · ওলো কচুখাকিব বেটি।

ভেজালি . উচ্ছে খাকি।

জঞ্জালি : পটল খাকি।

[ঝগড়া শুনতে গেয়ে বাপ-বেটা ছুটে আসে। এদিকে ঝগড়া করতে করতে দুজনের মাথার ঘোমটা খুলে যায়। মা-মেয়ে দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারে।]

জঞ্জালি : এ কি মা, তুমি? একি করেছো মা?

ভেজালি : আর বলিস নি, মা। তোকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে আমি বিয়ে করে ফেলেছি।

[বাপ্-বেটা উভয়েই তাকিয়ে দেখতে থাকে ওদের]

আকারে · [জঞ্জালিকে] ও তোমার কে হয়?

জঞ্জালি : ও আমার মা?

আকারে . বাবা, তুমি কোথায় শ্বশুর করলে গো ভালোই হয়েছে বাবা, তুমি যখন শ্বশুববাড়ি যাবে, তখন আমার শ্বশুরবাড়ির খবরটাও পাওয়া যাবে।

জঞ্জালি : মা, এ কি করলি? মায়ে ঝিয়ে শাশুড়ি-বউ হলি!

[মা ও মেয়ে জড়িয়ে ধরে এবং ঠেলাঠেলি করে এদিকে বাপ্-বেটায় জড়িয়ে ধরে]

বকাবে : বাবা করালি কবলি বাপ্-বেটায় শ্বশুর-জামাই হলি।

[ঠেলাঠেলি, জড়াজড়ি করতে করতে পালা সমাপ্ত হয়]

১. ধ্রুব দাস : ভারতের লোকনাট্য।

২. দ্রষ্টব্য : বর্তমান সংকলনের ৯ পৃষ্ঠা।

৩. যাঁরা তথ্য দিয়েছেন, যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি। পাথরা [মেদিনীপুর] অঞ্চলে তথ্যসংগ্রহের সময় ইয়াসিন পাঠান সাহায্য করে এবং সংগ্রহকার্যে সঙ্গী হয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

□

গ্রামীণ লোকনাটক : ডোমনি

সুরেন মুখোপাধ্যায়

১.

মালদহ জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিহার সন্নিহিত নদীবিধৌত এলাকার এক বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর অবক্ষয়ী মুমূর্ষু গ্রামীণ নাটকের নাম 'ডোমনি'। বস্তুতপক্ষে মালদহ জেলাকে 'গম্ভীরা'-'আলকাপ'-'ডোমনি'র প্রসূতিভূমি বলে চিহ্নিত কবা হলেও বিংশ শতাব্দীব শেষ পর্যন্ত এই জেলাব লোক-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের কাছেও 'ডোমনি' নামক কোন লোকনাটকের চেহাবা স্পষ্ট ছিল না। এই অপরিচয়েব অন্তরালে থাকতে থাকতেই ডোমনি গানের দলগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হয়ত চর্চা বা অনুশীলনেব ক্ষেত্রে দীর্ঘ উৎসাহহীনতাই ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে এই লোকনাটকটিকে।

আজকের অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানে হয়তো দেখা মিলতে পারে শুধু রতুয়া এবং মানিকচক অঞ্চলে—যেখানে এই পালাব চর্চা এখনও ক্ষীণভাবে হচ্ছে। সেটাও কতটা পরম্পরাগতভাবে চর্চিত হচ্ছে তা নিয়েও বিতর্ক তোলা যেতেই পারে।

এই বিতর্ক ওঠার মূল কারণ হল বাঙলা লোকনাটকের ক্ষেত্রে 'ডোমনি' আসব পেয়েছে অনেক পবে। ভালোভাবে লক্ষ্য কবলে এটাও দেখা যাবে যে বর্তমানে ডোমনিব ভাষা এবং পরিবেষণরীতি যথেষ্ট পরিশীলিত এবং এতে যাত্রার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই মালদহ অঞ্চলের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতিবিদ মনে করেন, এর যে চেহারা দেখছি তা প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয এবং লোক-আঙ্গিকে সেটা আধুনিক কালে যেন জায়গা জুড়ে রয়েছে—স্বাভাবিকভাবে জায়গা পায়নি।

ডোমনি লোকনাটকটি অপরিচিত এবং অবজ্ঞাত থাকার প্রধান কাবণ সম্ভবত এর ভাষা। ভাষাগত দুর্বোধ্যতার জন্যই ডোমনি অন্য ভাষাভাষী মানুষজনের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিল। রসগ্রহণের ক্ষেত্রে ভাষাজনিত এই সমস্যাব কারণেই ডোমনির প্রচলন ঔপভাষিক পরিমণ্ডলের বাইরে বিশেষ পরিচিতি ও প্রসাব লাভ করতে পাবেনি। কি এই ঔপভাষিক পরিমণ্ডল তা

বোঝাবার জন্যই মালদহের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি প্রথমে আলোচনা করা দরকার।

বাঙলার লোকনাটক বিশ্লেষণে ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির সাধারণ লক্ষণ আঞ্চলিকতা। এই আঞ্চলিকতাই ডোমনিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মালদহ জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে আছে বিহারের পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণা জেলা। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দুই নদী ফুলহার এবং গঙ্গা। ভূ-প্রকৃতির গঠন অনুসারে মালদহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—বরিন্দ, টাল এবং দিয়াবা। মহানন্দা নদী এই জেলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। আবার পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত কালিন্দ্রী মহানন্দার সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে মহানন্দার পশ্চিম অঞ্চলকে দু-ভাগে ভাগ করেছে। এরই দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় দিয়ারা। বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া, মিথিলা দ্বারভাঙা, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন বর্ণ-সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করছে। এই দিয়ারা অঞ্চলেরই অন্যতম সাংস্কৃতিক ফসল হলো 'ডোমনি'। দিয়ারা এলাকার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হলো চাঁই-ধানুক-নাগর সম্প্রদায়ের মানুষ। নৃতত্ত্ববিদদের মতানুসারে এই জাতিসমূহ সাঁওতাল এবং মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত। প্রধানত এরাই দিয়ারা এলাকার লোকায়ত সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তদুপরি এই এলাকার নীল চাষ, জমিদারি ব্যবস্থা, উর্বর জমির সহজলভ্যতা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে এই অঞ্চলে বাসা বাঁধতে প্রলুব্ধ করেছে। এরই পাশে পাশে বাঙলা ভাষার আঞ্চলিক কথ্যরীতিতে যাঁরা কথাবার্তা বলেন তাঁদের তিনটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয় : ১. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ২. সদ্গোপ এবং ৩. মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বাদিয়া। এঁরা দীর্ঘদিন একত্রে পাশাপাশি বাস করার ফলে সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত সমৃদ্ধ কিছু লোকসংস্কৃতি-উপাদান; যেমন : 'পরবের গান,' 'বিবাহ গীতি' এবং অবশ্যই 'ডোমনি'।

দিয়ারা অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত হলে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না যে ডোমনি গানের ভাষা আদপেই বাঙলা নয়। এই কারণে অনেকেই মনে করেন বাঙলা লোকসংস্কৃতির আলোচনায় 'ডোমনি'র কোন স্থান থাকা উচিত নয়। এই জেলার মূল বাঙলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে এ-অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার অবয়ব এবং

জীবন-সংস্কৃতির প্রকৃতি একেবারেই অজানা। ডোমনি গানেব ভাযা ভাঙা মাগধী যা সাধারণভাবে খোট্টাই বলে পরিচিত। দিয়াবা অঞ্চলের অধিকাংশ মানুযের কথ্য ভাযাও খোট্টাই। প্রখ্যাত ভাযাবিদ গ্রীয়ারসনের মতানুসারে হিন্দী মগহী [মাগধী] উপভাযাব একটি কথ্যরূপই হল 'খোট্টা'। ভাযাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে 'কোবাঠা' [কর্কশ] শব্দ থেকে 'খোট্টা' শব্দের উৎপত্তি, যাতে ভোজপুবি, মৈথিলি, উর্দু প্রভৃতির যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তদুপরি বাঙলা ক্রিয়াপদে তৎসম শব্দের প্রয়োগে এই ভাযাব লিখিত রূপ বাঙলাভাযায় প্রতিবর্ণ করা; বিশেযত এই বিভাযার উচ্চারণ ও ধ্বনিগতরূপকে বাঙলায় লিপ্যন্তব করা একান্তই দুরূহ।

ডোমনিকে গান বলে উল্লেখ করা হলেও এটি একান্তভাবেই লোকনাটক এবং দিযারা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবর্তিত রূপ। বেহুলা কর্তৃক ডোম-রমণীর ছদ্মবেশ ধারণের ঘটনাকে স্মরণে রেখেই 'ডোমনি' পালাগানের উদ্ভব। দিয়ারা অঞ্চলের নানা স্থানে সারা ভাদ্র মাস ধরেই মগহীতে রচিত 'বেহুলা কথা'-পুঁথির পাঠ চলে। অনেক 'ডোমনি' লোকনাটকের শিল্পীদের বিশ্বাস যে 'লখিন্দর-বেহুলা' উপাখ্যানের সঙ্গে 'ডোমনি' পালার যোগ আছে। 'বেহুলা' সম্পর্কিত অতি পরিচিত কাহিনী অনুসরণে আমরা জ্ঞাত আছি যে, সর্প দংশনে মৃত লখিন্দরের দেহ মান্দাসে নিয়ে বেহুলা ভাসতে উদ্যোগী হলে সনকা তাকে বাধা দেয়। বেহুলা কিন্তু তার সিদ্ধান্তে অবিচল। ক্রুদ্ধ সনকা তখন বেহুলাকে অভিশাপ দিয়ে বলে প্রথম ঘাটে বেহুলা ধনদৌলত হারাবে, দ্বিতীয় ঘাটে লখিন্দরকে হারাবে এবং তৃতীয় ঘাটে একজন ডোমকে সে পতিরূপে পাবে। যে সুখসম্পদ বেহুলা হেলায় হারাচ্ছে, ভবিযাতে ডোমনি হয়ে তাকেই ঝুড়ি চাঙারি বিক্রি করে জীবন কাটাতে হবে। এর প্রত্যুত্তরে বেহুলা সনকাকে বলে .

'ডোমা তো ভাতারা হে সাহুনী কবম লিখ্যালা।
যেহি দিন হইতো গে সাহুনী বেটাকে ছৌমাসী ॥
ওহি দিন আইব্যা হে সাহুনী তোহারা দুয়ারী।
সুপ্যা-ছাউড়ি বেচ্যাতে আইব্যা হে সাহুনী তোহারা দুয়ারী ॥'

অর্থাৎ 'ডোমকে স্বামীরূপে বরণ আমার কপালের লিখন। যেদিন সাহুনী [সাহুর গৃহিণী] তোমার পুত্রের ছৌমাসী [যাণ্মাযিক শ্রাদ্ধ] হবে, সেদিন আমি কুলা-চাঙারি বিক্রি করতে তোমার দরজায় আসব।'

দিয়ারা অঞ্চলের অনেকেই মনে করেন যে, ডোমনী অর্থাৎ ডোম জাতীয় মেয়েদের সহজাত নৃত্যগীতকুশলতার সূত্র ধরেই এই নাটপালার উদ্ভব হয়েছে। চর্যাপদে বেশ কয়েকবার ডোমনারীর নৃত্যকুশলতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। একটি চর্যায় ডোমনারীর নৃত্যপটুতার প্রসঙ্গে চর্যাকার কবি কাহ্নপাদ বলেছেন :

'এক সো পদুমা চৌসট্ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচিঅ ডোম্বী বাপুড়ী ।।'

অর্থাৎ,

'একটি পদ্মের চৌযট্টি পাপড়ি
তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী নারী ।।'

মালদহ জেলার যে সমস্ত এলাকায় ডোমনীপালার প্রচলন আছে সেখানে 'কারম' উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা এক ধরনের গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নগদ টাকাকড়ি বা ফল-ফসল ইত্যাদি মাগন সংগ্রহ করে। এই গান সেই অঞ্চলে 'ডোমবার গান' নামে পরিচিত। এই গানের ভাষা মগহী ও বাঙলার মিশ্রণে রচিত। ভাষার কূট ছাড়াতে পারলে বোঝা যাবে যে ঐ-সব সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভরা জীবনের ছবির অর্থ।

এই দিয়ারা অঞ্চলে ডোমনির মত আরও একটি লোকনাট্য দেখতে পাওয়া যায়, সেটির নাম 'ডোমকাচ'। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'ডোমরার গান' বা 'ডোমকাচ'-এর কোথাও পুরুষের কোন ভূমিকা নেই; এমনকি 'ডোমকাচে' কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকেও দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় না। সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের জন্য পরিবেষিত এই নাটকে পুরুষদের ভূমিকায় অভিনয় করে মেয়েরাই। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বর সহ যেদিন বরযাত্রী রওনা হয়, সেই রাত্রে পাত্রপক্ষীয় এবং তাদেরই প্রতিবেশী মেয়েরা সারারাত ধরে নৃত্যগীত সহযোগে তাৎক্ষণিক নাটক 'ডোমকাচ' পরিবেষণ করেন। বর্তমানে ডোমকাচও যথেষ্ট ক্ষীণ, তবুও ডোমনির আলোচনা প্রসঙ্গে ডোমকাচের উল্লেখ করতে হলো এই জন্যে যে ডোমনি যেমন পুরুষদের বহির্জীবনের গীতবাদ্য ও নাটকের এক সংমিশ্রিত রূপ, ডোমকাচও তেমনি পুরুষবর্জিত স্ত্রী-সমাজের নৃত্যগীত। সঙ্গে যুক্ত থাকে স্ত্রী-সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট লৌকিক

আচার। এ-প্রসঙ্গে এ-কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, আজকের যে ডোমনির কথা আমরা বলছি তা হলো ডোমজাতির নৃত্যগীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।

২.

ডোমনি গ্রামীণ এবং তথাকথিত অনুন্নতপ্রায় নিরক্ষর মানুষদের যৌথ নাট্য-প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে এটি মালদহের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষদের সুখ-দুঃখ-বেদনা, প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার। অপরাপর গ্রামীণ নাটকের মতো 'ডোমনি' অভিনয়ের জন্য কোন লিখিত পালার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাৎক্ষণিক সংলাপ তৈরির মাধ্যমে এই পালা অভিনীত হয়। বস্তুত এই নাটকের যারা দর্শক তারাও প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তাই এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি সংলাপই সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত আটপৌরে ভাষা থেকে নেওয়া হয়। তাই দর্শকদের কাছে সেই অভিনেতাই গ্রহণযোগ্য হয়েছেন, যিনি ভাষায়-ভাবে সহজবোধ্য এবং মনোরঞ্জক। এক্ষেত্রে আবেগপ্রধান অভিনয়ের কোন স্থান নেই।

'ডোমনি' প্রধানত হাস্যরসপ্রধান নাটক, কারণ সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দর্শক এবং অভিনেতারা এই নাটকের অভিনয়-সঙ্গীত-নৃত্যাদির যে আনন্দ আহরণ করে তা যেন তাদের সারা বছরের ক্লান্তি অপনোদন করে। এক্ষেত্রে যে হাস্যরস তা অবশ্যই স্থূল এবং আদিরস পরিবেষণেও অকৃপণ নয়; এমনকি শহরবাসীর কাছে তা অশ্লীল বলেও মনে হতে পারে, তবে গ্রাম্যভাষার মধ্যে যে আদিরসাত্মক শব্দ পাওয়া যায় তা গ্রাম্য সরলতা ও সরলতার লক্ষণে ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এর সঙ্গে কুরুচিকর অশ্লীলতার সম্পর্ক নেই।

ডোমনি শুধুমাত্র বাচিক অভিনয় নয়, এর মধ্যে উদ্ভট অঙ্গভঙ্গিও বর্তমান, তদুপরি আছে হাল্কা ভোজপুরী বামধুন ভঙ্গির গান ও চটুল নাচ। ঐসব নাচগানের সঙ্গে মূল কাহিনীধারার নিবিড় কোন সম্পর্ক নেই, আসলে সংলাপের সঙ্গে নাচগান জুড়ে দিয়ে ডোমনিকে জমজমাট ও চিত্তাকর্ষক পালানাটক তৈরি করাই ওদের উদ্দেশ্য। আগে ডোমনি পালা ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের বেশি দীর্ঘ হতো না, কারণ এর সঙ্গে 'মাগনে'র একটা সম্পর্ক ছিলো, ডোমনি গানের দল অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ি গিয়ে ছোট ছোট

অনুষ্ঠান করে চাল-ডাল, আনাজ-পত্তর বা অর্থ সংগ্রহ করতো। খোলা আকাশের নিচে দিনের বেলায় গৃহস্থবাড়ির বাইরেব আঙিনায় এই আসর বসত। আর আসরের চারপাশ ঘিরে থাকত শ্রোতার দল। এই কারণে তখন ছোট ছোট পালা তৈরি করে যত বেশি বাড়িতে অনুষ্ঠান করা যাবে তত বেশি উপার্জন হবে। এই বাস্তব প্রয়োজনই পালাগুলিকে বড় হতে দিতো না। বর্তমানে মাগনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কিছুটা 'সফিস্‌টিকেটেড' হওয়ার চেষ্টা করায় ডোমনির আকৃতি বড় হচ্ছে বা হয়েছে।

ডোমনিতে কোন লিখিত পালা থাকে না। প্রয়োজন শুধু একটি কাহিনী-রেখার। তবে সে কাহিনী কখনও নিয়মবদ্ধভাবে নাটকের রূপ গ্রহণ করে না। কোন একটি বিষয় নিয়ে দলের অধিপতি সেই বিষয়েব সারমর্ম অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেন, তাই সম্বল করে অভিনেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে [extempore] নিজের অভিরুচিমত সংলাপ নিজেই তৈরি করে নেন। ব্যাপারটা খুব জমে ওঠে যখন দুই বা ততোধিক ডোমনি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

নববর্ষ উৎসব 'সিরুয়া পরব' উপলক্ষে এই অঞ্চলে এক সময়ে অজস্র মেলা হতো। এই মেলার মুখ্য আকষণই ছিল ডোমনির প্রতিযোগিতা। শামিয়ানার নিচে হ্যাজাকের আলোয় এই প্রতিযোগিতা সারারাত ধরে চলতো। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হতো পাল্লা-পাল্লি। সঙ্গীত, সংলাপ এবং নাচ মিলিয়ে ডোমনি সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অনুষ্ঠান। ডোমনিতে সামাজিক ব্যাধির কঁথা তুলে ধরা হলেও কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতা তাব লক্ষ্য ছিলো না। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর বিভাজনের ফলে এ-অঞ্চলের দুর্বল খেটেখাওয়া মানুষজনই ডোমনির ধারক এবং বাহক। অর্ধ শতাব্দীরও আগে যখন গ্রামে সিনেমা ভিডিও ছিল না, ছিল না অন্য কোন প্রমোদমাধ্যম, তখন এইসব আসরে, বিশেষত গঙ্গানদীর উভয় তীরবর্তী মানিকচক, নাজিরপুর, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, রাজমহল, রাধানগর প্রভৃতি এলাকায় ডোমনির দর্শক সমাগত হতো সবচেয়ে বেশি। সেই সমৃদ্ধি আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তবু আজও রতুয়া-মানিকচক এলাকায় ডোমনির আসর বসলে ভালই ভিড় হয়।

সাধারণত হোলি বা পূর্ণিমার পরেই শুরু হয়ে যায় ডোমনির মহড়া;—কোন বারোয়ারী দালানে, কৃষকের খামার বাড়িতে অনুশীলন চলে সারা

চৈত্রমাস ধরে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডোমনি অনুরাগী ভদ্রজনের পরিত্যক্ত ঘরে।

বামনবমীর সময় থেকেই ডোমনীব মহড়া শুরু হয়ে যায়। পুরোনো ও প্রচলিত পালাগুলি রেওয়াজেব সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে নতুন পালা তৈরির কাজও। আগে ডোমনিতে সমাজের গভীব অসুখগুলির কথা পালার মাধ্যমে তুলে ধরা হত। বর্তমানে বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, খরা, বন্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, অপরেশন বর্গা, সাক্ষবতা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও নাট্য-কাহিনী তৈরি হচ্ছে। গ্রামীণ জীবনেব বিশেষ ঘটনা;— পারিবারিক কেচ্ছা এখনও ডোমনির প্রিয় বিষয়। তবে পাবিবাবিক কিস্সাগুলি সোজাসুজি নয়— ঠাবে-ঠোরে বলা হয়। এই প্রসঙ্গে দেবব-বৌদির অবৈধ প্রণয়সম্পর্কের ইঙ্গিত বয়েছে, এমন একটি ডোমনি পালার সামান্য কিছু অংশ এখানে উদাহৃত হলো। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে এমন দেবরকে নিরস্ত করতে গিয়ে বৌদি বলছে :

দেওরা হে জরাসা থাম্
মাথা ফৌড়িকে দে দেবো হে জ্যান্
তোর ভাউজি খোজি খোজি হো গেলিও হয়রান
দেওরা হে জরাসা থাম্ ।।
সোনাকে টুক্বা হম্মার দেওরা
পূর্ণিমাকে চাঁন
বাঁন্হিকে কাল্‌সি গল্লাসে রশিন
নাই দিয়ো হে জ্যান্ ।। দেওরা হে
দেওরা হে জলদি সে নাম্
মাথা ফোড়িকে দে দেবো হে জান
তোরে ভাউজি খোজি খোজি হো গেলিও হয়রান
দেওরা হে ।।
সোনাকে টুক্‌রো হম্মার দেওরা
পূর্ণিমাকে চাঁন
ভাউজিকে ছোড়ি গাছ মে চড়ি
নাই দিয়ো হে জান ।।
দেওরা হে...

অস্যার্থ : তুমি যদি নিরস্ত না হও আমি মাথা ঠুকে প্রাণত্যাগ করবো। অভাগী বৌদি তোমায় খুঁজে হন্যে হয়ে হয়রান। গলায় কলসি বেঁধে তুমি জলে ডুবো না। তোমার বৌদিকে ছেড়ে গাছে প্রাণ দিও না হে। সোনার টুকবো দেবর আমার, আমার পূর্ণিমার চাঁদ।

ডোমনির সংলাপে গদ্য এবং পদ্য উভয়েরই ব্যবহার আছে। তবে গদ্যের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম, সাধারণত হাস্য-কৌতুক, রং-তামাশার ক্ষেত্রেই গদ্যেব ব্যবহাব আছে।

প্রথম যুগে ডোমনিতে হাঁড়ি ও থালাবাসনের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রের কাজ চলত। পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে করতাল ও ঢোল। বর্তমানে আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে হারমোনিয়াম। এর সঙ্গে রয়েছে ফ্লুট, কর্নেট এবং একাধিক ঢোল।

এইসব বাদ্যযন্ত্রের তুমুল আওয়াজ অনেক সময় ডোমনির সংলাপকে চাপা দিয়ে দেয়। এখন মঞ্চেরও পরিবর্তন হয়েছে। আগে বাড়ির উঠানে ডোমনি অভিনীত হতো, ফাঁকা মাঠে সামান্য উঁচু করে আসর তৈরি করা হতো। মাথার ওপর থাকত সামান্য ছাউনি, হ্যাজাকের আলোই ছিল ভরসা। বর্তমানে একেবারে যাত্রার ঢঙে প্যান্ডেল করে মাইক লাগিয়ে ডোমনি পরিবেশিত হচ্ছে।

ডোমনির আদি পর্বে শিল্পীদের বিশেষ কোন সাজসজ্জার বাহার ছিল না। যে যা পরে থাকতো তাই নিয়েই অভিনয় হতো। হাঁটুর ওপর ধুতি পরে খালি গায়ে কাঁধে গামছা নিয়েই অভিনয় হতো। যে-সব পুরুষেরা মেয়েদের পার্ট করতো তারাই কেবল মেক্-আপ নিতো, খড়িমাটি, আলতা-কাজল পরতো এবং পরচুলাও ব্যবহার করতো। বর্তমানে সাজ-পোশাকের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম এবং যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাবে চরিত্রানুসারে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সাজ-সজ্জা তৈরি হচ্ছে।

ডোমনির শিল্পী-সংখ্যা কম। সাধাবণত আট থেকে বার জন নিয়ে এক-একটি দল তৈরি হয়। আলকাপের মত যেসব ছেলেরা স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে ডোমনিতেও তাদের বলা হয় 'ছোক্‌রা'। সাধারণত প্রতিটি দলে দু-জন ছোক্‌রা থাকে। এছাড়া রং-তামাশা বা 'কমিক বোল' করবার জন্য প্রতিদলে একজন করে ভাঁড় থাকে। একে লাব্বাড় বা জোকার বলে। এছাড়াও আছে বাজনদার, দোহারকি। সাধারণ অভিনেতাদের ভূমিকাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোহারকিরাই চালিয়ে দেন।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ডোমনি গানের শিল্পীরা হলেন অসাম্প্রদায়িক। এঁদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু, তপশিলী জাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন আছেন। এঁরা সাধারণত খেটে খাওয়া দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর বা কেবল নাম সইটুকু করতে পারেন। যে সময়ে পালা হয় না, সেই সময়ে তারা অনেকেই ক্ষেতমজুরী করে, রিক্সা চালায় বা অন্য শ্রমসাধ্য কাজ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকও ডোমনি গানে অংশগ্রহণ করছেন।

সাধারণত দুটি পর্বে ডোমনির উপস্থাপনা করা হয়। এর প্রথম ভাগটি হল আসর বন্দনা এবং অন্য অংশটি হল নাচারি বা লাচারি। অনুষ্ঠানের শুরু আসর বন্দনা দিয়ে। আসর শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই চলতে থাকে ঐক্যতান বাদন বা কনসার্ট। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অঞ্চলের দর্শক শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। একাধিক ঢোলের বোল, তার সঙ্গে হারমোনিয়াম এবং করতালের সুর-মূর্চ্ছনা একটি চমৎকার-সঙ্গীতময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এরপর নানা দেবদেবীকে বন্দনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আসর বন্দনা। প্রথমে আসরে উঠে মূল গায়েন এবং ছোক্‌রা বন্দনা গান ধরেন। গানের প্রতিটি কলি শেষ হলে দোহারিয়া ধুয়া ধরেন, এর সঙ্গে চলতে থাকে মূল গায়েন এবং ছোক্‌রাদের নাচ। বন্দনা অংশে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ এই ছয় দিকের দিক্‌পতিরা বন্দিত হন। সবশেষে সভায় উপস্থিত দর্শকদেরও বন্দনা গান গাওয়া হয়। এই আসর বন্দনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যে জায়গায় আসর বসে সেখানকার প্রসিদ্ধ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নতুন করে বন্দনা-গান তৈরি করে নেওয়া, এই জন্যে ডোমনিতে বন্দনার অংশটি অত্যন্ত দীর্ঘ।

আসর বন্দনার পর ছোক্‌রাদের গান ও নাচ। এই 'ছোক্‌রা'ই ডোমনি সাজে। এই অংশটি মালদহের গম্ভীরার সঙ্গে খুব মেলে। কারণ গম্ভীরায় শিবের ভূমিকা যেমন প্রতীকী, ডোমনির ক্ষেত্রেও তাই। এই অংশে নাট্য-সংলাপের ভাগ গানের চেয়ে বেশি, নাটকের মুখ্যত যে চারটি অংশ কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা এবং সংলাপ ডোমনিতে তার প্রয়োগ বেশ স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে অভিনয়-ভঙ্গির সুর যাত্রার মতই চড়া। এ-প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্যের

কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ডোমনির বিদূষক কেবল একজন ভাঁড় নয়, অঙ্গ ভঙ্গি, সংলাপ ও রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করে এবং আর অভিনেতারা ঐ আখ্যান বিষয়কে সংলাপ-নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ি-বউ, বৌদি-দেওর, কৃষাণী-চাকর প্রভৃতি চরিত্রে যে নাচগান ও সংলাপ বা নাচারি ব্যবহৃত হয়, তা মূল নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই; অনেক ক্ষেত্রে আবার গানই সংলাপ, নাচই মনোভাবের বাহক।

আগেই বলা হয়েছে যে এখানে অভিনেতাদের কোন বাঁধা সংলাপ নেই, কাজেই অভিনেতা, ছোক্‌রা মূল দোহারির প্রতিভা এবং চর্চার ওপর নির্ভর করে কোন পালা কতটা আকর্ষণীয় হবে। এতে নাচ-গানের সঙ্গে যে গদ্য কথোপকথন পরিবেষিত হয়, তাকে বলা হয় 'চুট ডোমনি গান'।

কোন কোন লোকসংস্কৃতিবিদ ডোমনিকে আচারমূলক [Ritualistic] লোকনাট্য বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী, কিন্তু এই পালা আদপেই আচারমূলক কোন কৃত্য নয়, বরঞ্চ এটিকে প্রথাগত [Functional] বলাই উচিত। গ্রামীণ দরিদ্র-স্বল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে ডোমনি লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। বিদ্রূপের কষাঘাতে, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষত, জমিদার-জোতদারদের অনৈক্যকে তুলে ধরা হয় বলে সমাজে সৎ ও সুস্থ চেতনা তৈরি হতে ডোমনি সাহায্য করে। এতে লোক-সাংবাদিকতারও কিছু ভূমিকা আছে।

পূর্বাংশে ডোমনিতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বজনগ্রাহ্যতার সমস্যার কথা বলেছি, যা আজও ডোমনিকে অনেকখানি একঘরে করে রেখেছে। এক সময়ে নানাবিধ প্রতিকূলতা ও নাগরিক মাধ্যমগুলির ব্যাপক প্রভাবে এই লোকনাট্য তার অতীত গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। বর্তমানে শিল্পীরা নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে ডোমনিকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডোমনি এখনও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ডোমনির নাট্যগতি [Action] এবং সুরের বিশিষ্টতা যা আজও শ্রোতা সমাজকে আকৃষ্ট করে থাকে, তাকে অবলম্বন করেই ডোমনিকে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে যদিও সংলাপকে নৃত্য-গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার মত পরিচালকের অভাব হচ্ছে, তেমন প্রতিভাবান ছোক্‌রা বা নাচিয়েদের আর পাওয়া যাচ্ছে

না তবুও বলা যেতে পারে ডোমনির মৌলিক আবেদন আজও অম্লান। যুগরুচির পরিবর্তনে এই মুহূর্তে ডোমনির বিভিন্ন চরিত্র যেভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তাতে যাত্রা ও ব্যবসায়িক নাটকের ছাপ ভীষণভাবে পড়ছে। আবার গানের অংশেও সাঙ্গীতিক মাধুর্য ও লালিত্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে সিনেমার [মূলত হিন্দী] চটুল সুর জায়গা জুড়ে বসছে। দূষণ থেকে ডোমনিব লৌকিক চরিত্র ও নিজস্বতা রক্ষা করতে না পারলে কেবল গবেষকের আলোচনাতেই ডোমনিকে খুঁজতে হবে; প্রধান শিকড় যাবে শুকিয়ে।



গ্রামীণ লোকনাটক : চোর-চুরনীর পালা

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

'বন্দনা করু মুই চোর চক্রপাণি,
সেই চোরের চুরনী বন্দু রাধা বিনোদিনী।'

উত্তরবঙ্গের মোট ছয়টি জেলার মধ্যে প্রধানত দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় রাজবংশী সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন এখনও খুঁজে পাওয়া গেলেও খুব বেশিদিন আঞ্চলিক লোকসাহিত্যের এইসব ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয় না। আঞ্চলিক ভূমিপুত্র রাজবংশীদের নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের লোকসংগীতে। বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুকাল আগেও স্থানীয় লোকজনের তেমন কোনো আগ্রহ বা জিজ্ঞাসা ছিল না। ফলে সময় থাকতে থাকতে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির যে বিশাল ঐশ্বর্যকে ধরে রাখা সম্ভব হত, তা হয়নি। বরাবরই উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট ধারণাই বহিরাগত গবেষকদের কলমে জন্ম নিয়েছে। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে তা খুব বেশি স্পষ্ট হতে পারেনি,—স্থানীয় লোকজনের উদাসীনতা তো তার সঙ্গে আছেই। অনেক দেরিতে হলেও সম্প্রতি বেশ কিছু স্থানীয় গবেষক আন্তরিকভাবে ধীরে ধরে হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করছেন। কারণটা খুবই স্পষ্ট। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে বিষয় হিসেবে তাই লোকসংস্কৃতির গবেষণা, চর্চা ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। যেহেতু পরিবর্তনশীল সমাজের বিকাশমুখী বিন্যাসে সংস্কৃতিরও বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেহেতু আধুনিক কালে সংস্কৃতির রূপান্তরের ইতিহাসে মনোনিবেশ করাটা বিশেষ জরুরি বলে মনে করি।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ্ লিনিয়স [১৭০৭-১৭৭৮]। পরে এ-বিষয়ে জার্মানির গ্রীমভাইরাই প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির

বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও চর্চার যথার্থ পথপ্রদর্শক। লোকসংস্কৃতি গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায় ১৮৭৭ সালের ১ ডিসেম্বরে আয়োজিত এক স্মরণীয় সভায় 'ফোকলোর সোসাইটি' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। দু-মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৩০ জানুয়ারী ডবলু জে. টমাস-কে ডাইরেক্টর এবং লরেন্স গোম-কে সেক্রেটারি করে প্রথম আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি পরিষদের পথ চলা শুরু হয়। ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চার ঢেউ এসে পৌঁছায় আরো অনেক পরে। বঙ্গদেশে লোকসংস্কৃতিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং গুরুসদয় দত্ত। অজস্র মণিমুক্তো সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এঁদের অনলস প্রয়াস আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে আমরা একদা বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। এঁদের পথ ধরে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন বাঙলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে রাখার কাজে।

আগেই বলেছি, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য কিছুদিন আগেও অবহেলিত ছিল. লোকসংস্কৃতির বহুমুখী ধারার একটি হল লোকনাট্য। এই ধারাটি অল্প আলোচিত থেকে গেছে আজ পর্যন্ত, এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনাট্য 'মৈষাল বন্ধু' এবং গীতধর্মী লোকনাট্য 'চোর-চুরনী'-র কোনো মুদ্রিত রূপ বা আলোচনা আজ পর্যন্ত তেমনভাবে চোখে পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে 'মৈষাল বন্ধু' লোকনাট্য এখনও অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত থাকলেও, 'চোর-চুরনী' নামে একদা বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় সংগীতসমৃদ্ধ লোকনাট্য আজ প্রায় অবলুপ্ত। একসময়ে উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর জেলায়, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুরে এর বহুল প্রচলন ছিল। এর লিখিত নাট্যরূপ অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'চোর-চুরনী' পালার কিছু গান, কিছু সংলাপ সংগ্রহ করা গেছে এবং প্রাচীন কিছু মানুষের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে এই লোকনাট্যের প্রকৃত চেহারা।

বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই উত্তরবাঙলা বা হিমালয়ের কোলজোড়া উত্তরখণ্ড। আগে রঙপুর এবং আসামের কিয়দংশ জুড়ে ছিল উত্তরবাঙলার সীমানা। জলপাইগুড়ির অনেকটাই ছিল ভূটানের অংশ।

পরবর্তী কালে রঙপুরের ফকিরগঞ্জ থানা এবং ভূটানের অংশবিশেষ নিয়ে ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারী জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর বাঙলার এই বিস্তৃত অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায় এবং তপশীলী উপজাতি সম্প্রদায়ের মেচ-বোড়ো-রাভাদের সামাজিক-ধর্মীয় এবং লোকসংস্কৃতি চর্চায় রয়েছে তাদের নিজস্ব মৌলিক অবদান। এর গৌরবময় অবশেষ আজও দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগধর্মের প্রবল ধাক্কা খেয়েও টিঁকে রয়েছে। কিন্তু কতদিন এই আঞ্চলিক সংস্কৃতি তার নিজস্ব সৌরভ ধরে রাখতে পারবে বলা কঠিন। তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দার তীরবর্তী জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের জনজীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে যে সবুজ প্রাণবন্ত কোমলভাব এখানকার উৎসব-পার্বণ, লোকসংগীত, লোকনৃত্য এবং লোকনাট্যের প্রতিটি ধারায় প্রবাহিত হয় তার পরিচয় মেলে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উপাদানের মধ্যে।

জলপাইগুড়ি-কোচবিহার জেলার বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এই অঞ্চলে নানান উৎসব লেগেই থাকে। প্রতিটি উৎসবের মধ্যেই ধর্ম স্থান পেয়েছে নিবিড়ভাবে। বছর শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে। বছরের এই প্রথম মাসটিকেই ধর্মমাস বলা হয়। একজন গ্রাম্য বিধবার নেতৃত্ব কয়েকটি গ্রামের মহিলারা গঠন করে 'মেচেনীর দল'—এই মেচেনীর দল উলুধ্বনি দিতে দিতে 'মেচেনী খেলা'য় মেতে ওঠে। মেচেনীর দল পুজো করে তিস্তা বুড়ির ও ধবলা বুড়োর। এ-মাসের আর একটি উৎসব 'বাঁশপুজো' তো আছেই। এইরকম জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘরে ঘরে নারায়ণ পুজোর ধুম পড়ে যায়। আষাঢ়ে আষাঢ়ী পুজো, আমাতী [অম্বুবাচী], গছিবুনা [ধান্যরোপণ]। শ্রাবণে বিষহরির পুজো উপলক্ষে 'বারমাসী গানের' মাতামাতি সত্যিই বেশ উপভোগ্য। ভাদ্রমাসে গেড়াভাসা, আশ্বিনে দুর্গাপুজা এবং একাদশীতে ভাণ্ডানিপুজো উত্তরবঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর চেয়েও উত্তর বাঙলার আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত খেতি লক্ষ্মীপুজোর প্রচলন ও সমাদর অনেক বেশি।

এর পরেই কার্তিক মাসে কালীপুজো উপলক্ষে রাত্রে বেরিয়ে পড়ে 'চোর-চুরনীর দল'। সমবেত বন্দনা গান দিয়ে শুরু হয় চোর-চুরনীর পালাগান :

'বন্দনা করু মুই চোর চক্রপাণি
সেই চোরের চুরনী বন্দু রাধা বিনোদিনী।

সে চোর যদি মনে করে দিনেতে ডাকাতি পড়ে
কারয় সাইধ্য ধবিতে পারে?
সে চোব ভয় হাতাশ কিছুই করে না
যারে বাড়িৎ যায় তাহে কানা
দ্যাখেয়া দিলেও তাও দ্যাখে না
ও পরশীর কানাকানি
বন্দু চোবাজগৎ সেরা চোবেব শিবোমণি'।

—কালীপুজোব বাত্রে সাবাবাত চোব-চুবনীব পালাগান কখনো কখনো মা কালী বন্দনা দিয়েও শুরু হয় :

'বন্দনা কবি ও মা শ্যামা কালী
এ মা তুমি তো জগৎ জননী,
তুমি তো সকলি'।

এই বন্দনায় আধুনিক ভাষাব ছাপ ফুটে উঠেছে কালের পরিবর্তনেব সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

'আমাতী পরবে রে চোরের উধোপতি'

অঞ্চলবিশেষে চোর-চুরনী, চোরচুন্নী, চকচুন্দি, নটুয়া চকচন্দি [দিনাজপুর] নামে পবিচিত এই পালা ঠিক কোন্ সময় থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে আজ তা জানার কোনো উপায় নেই। নামের মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে এই গান বা পালাগান চৌর্যবৃত্তিভিত্তিক ছিল এক সময়ে। আমার মনে হয় গোটা পৃথিবী জুড়েই চৌর্যবৃত্তি নিয়ে অজস্র মিথ এবং Taboo প্রচলিত আছে। উত্তব বাঙলাও এর ব্যতিক্রম নয়। চোর-চুয়নী নামের এই পালা-গান উত্তরবঙ্গের জাতীয় লোকনাট্য। এব পেছনে যে মিথ আছে আজ আর তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। শিক্ষায় ও আধুনিকতায় সমাজ যত এগিয়েছে ততই সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের প্রভাবও তার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।

দীপান্বিতা অমাবস্যার ঠিক একমাস আগের মহালয়ার অমাবস্যাব রাতে গৃহস্থবাড়ি থেকে চোর কিছু চুরি কবে আনে। দীপান্বিতা রাতে অর্থাৎ আমাসী পরবের রাতে চোর-চুরনীর দল গৃহস্থবাড়ির অঙ্গনে অঙ্গনে পালাগান গায় আর যে-চোর সে বাড়িতে চুরি করেছিল সেই বাড়িতে ফাঁকতালে একমাস আগে চুরি করে আনা দ্রব্যটি ফেরত দিয়ে আসে।

নির্বিঘ্নে গিয়ে ফেরত দিয়ে আসতে পারলে সারা বছর ধরে চোর প্রত্যাশিত সফলতার সঙ্গে চুরি করতে পারবে—মূল বিশ্বাস এটাই। এই বিশ্বাস এখন চোরদের এবং গৃহস্থদের মধ্যে নিশ্চয়ই ততটা সফল নয়। সে কারণেই চোর-চুরনী পালাগানের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত হতে বসেছে। বিশ্বাস নষ্ট হতে বসার ফলে এই লোকনাট্যের প্রচলিত ধারাতেও এসেছে পরিবর্তন। লৌকিক 'চোর' চোর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আর 'চুরনী' রাধাবিনোদিনীতে রূপান্তরিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও চোর-চুরনী হয়ে উঠেছিল বারমাসী গানের মধ্য দিয়ে লোকসাংবাদিক—যাদের গানের মুখ্য বিষয় ছিল সারা বছরের কার্যবিবরণী পেশ করা। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনীতি, মুখরোচক প্রেম-পিরিতের সংবাদ এ-সবকিছুই চোর-চুরনীর বাৎসরিক রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনের পথ ধরে কিভাবে চোর-চুরনী পালাগানের বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে সেটা এখন দেখা যেতে পারে।

বৃত্তিই যার চুরি করা, রাত্রে তাকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতেই হবে। চুরি না করলে যার পেটে ভাত জুটবে না, তার ঘরে মোটা ভাত-কাপড় সাজ-সজ্জা কিছুই থাকার কথা নয়। তবু জীবনসঙ্গিনী না হলেও তো চলে না। যুবতী বধূর শরীরে ভরা-গাঙের ঢেউ। শয্যায় স্বামী-সঙ্গ কামনায় সে আকুল। কিন্তু চোরেরও কোনো উপায় নেই—বনিতার বাহুপাশ ছিন্ন করে তাকে রাতের অন্ধকারে পথে নামতে হয়। কপালে করাঘাত করে কণ্টক-শয্যায় কেঁদে ভাসায় চোরের চুরনী :

'তিন কাচালে যাচ্ছে মোর জীবন
ও মোর চোরা রে।
চোরা ভাতার দোগা পড়া
সেই তানে মোর কপাল পোড়া
মোর অভাগের দুখের নিশি
আর কি পোহায় রে।'

অবুঝ চুরনীর হা-হুতাশের পালা বা খেদোক্তি শোনা যায় চোরের মুখে

'মাছ ধরি মুই ভালে গে চুন্নী
খোলাই ধরায় নাই চুন্নী
খোলায় ধরায় নাই

ঢেল কামাই কবিছু জীবনে তোর যোগ্যা নাই।
ওই তানে মোর কপাল খান ধাই ধাই।'

তবুও চোর চুরনীর কাছে প্রতি রাতেই বিদায় চায় এইভাবে :

'হিত্তি কনেক কথা শুনেক
অন্তরে না ধরিস তাও
হাসি মুখে বিদাই দে মোক
চুরি করিবার যাও।'

চোরের এই কাতর অনুনয়ে চুরনীর বুকে প্রেমের ঢল নামে। স্বামীর বুকে মাথা রেখে চুরনীও অনুনয়ে ভেঙে পড়ে

'ওগে চাইবো দিয়া নানান কথা
মোক্ নাগেছে ভয়
ওবে এমন আন্ধার রাতি
কার বা খবর করে কায়
ঘরটাত্ মোক ছাড়িয়ে যাচ্ছিৎ একেলায়।
ও তোকনা লাগে না লাগে যাবার
নাইতে নাই ঘরৎ খাবার
দুখে সুখে দিন তো হামার যাছে সর্বদায়।
ও তুই করিস কি না করিস চুরি
তাতেও তোর নামটা জাব
পুলিশে আসিয়া বাড়ি তাল্লাসিয়া যায়
তোর ঘরটাৎ মোক ছাড়িয়া যাছিৎ একেলায়।'

এইভাবেই পরিবেষিত হয় চোর-দম্পতির চৌর্যবৃত্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের রসঘন কাহিনী।

কোথাও বা চোর-চুরনীর বদলে পূর্ণ বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেমলীলা থেকে বস্ত্রহরণ অথবা মান-অভিমানও এই লোকনাট্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। রাধাকে তাই বলতে শুনি :

'তুই হোলো সুন্দর কানু ঘাটে ভাঙ্গা নাও
কুণ্টা রাখিম্ দধি প্রসাদ কুণ্টা জুরাম্ পাও।'

উত্তরে রসিক কানু গেয়ে ওঠে :

'ভাঙ্গা নাহি টুটা নাহি বজরিয়া ভারি
হাতি ঘড়া পার করু তুই কতয় ভারি

কেশবা ছাড়িয়া রাধে গড়ায় চাপে বস
মুটে মুটে পানি ছেক লজ্জায় কেন মর
কাচলি চিড়িয়া রাধে গারিনু সকল
প্রাণ শান্তি হইয়া রাধে টুটে গেল্ জল।'

আবার রাধাকে বলতে শুনি

'পরের রমণী দেখিয়ে কানু জ্বলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহা কেনে নি কর।'

রাধা ছাড়াও কানুর গতি নেই তাই চটপট কানু র উত্তর

'ভাল ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন করিম তোরে।'

রাধা-কৃষ্ণের এই ব্যক্তিগত সংলাপের ভাষা ও উপস্থাপনার ভঙ্গির সঙ্গে জলপাইগুড়ি কোচবিহার অঞ্চলের চোর-চুরনী পালার পার্থক্য খুবই স্বল্প।

কালীপূজার রাত থেকে আট-দশ দিন ধরে চোর-চুরনীর দল বাড়ি বাড়ি পালাগান গেয়ে বেড়ায়। প্রতিদিন একই বিষয় থাকে না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার কারণে গ্রামের ওস্তাদ পালাকাররা চোর চুরনীর ব্যক্তিগত সুখ-দুখ ছাড়াও সালতামামী গান এবং সংলাপ তৈরি করে দিতেন। এইসব ক্ষেত্রে গানের বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক দুর্নীতি, বন্যা, খরা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত উদ্বেগজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, কৌতুক, ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক ডামাডোল, প্রেম-পিরিতিজনিত কেচ্ছা-কাহিনীও পরিবেষণ করা হয়। জ্যোতি বসুর মিটিং, ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রীত্ব, জরুরি অবস্থা, রাজনৈতিক পালাবদল ইত্যাদি কোনো কিছুই বাদ যায় না। অর্থনৈতিক দুর্দশাও বর্ণিত হয় এইভাবে :

'কলির কাথা চুন্নী শুনেক মন দিয়া
ওগে অভাবে পড়িয়া সবায় হারালেক দিশা।
ওগে রাতারাতি সুট করিয়া
বেচাচ্ছে হোর খুঁটি খাপেরা
পালেয়া যাচ্ছে হোর ভিটা ছাড়িয়া।'

এছাড়াও আধুনিক ছেলেমেয়েদের অশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ, স্কুল-কলেজে 'চিঠি দিয়া প্রেম পিরীত' করা ইত্যাদিও রসালো ভাষায় পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। এগুলিকে অবশ্য 'মুরশুমী' গান হিসেবেই

গণ্য কবা হয। দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক গান উদ্ধৃত করা যায। প্রবন্ধ দীর্ঘ না করে চোব-চুরনীর দল সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া দবকার।

কমপক্ষে ১০/১২ জন বা ততোধিক যুবা ও কিশোর মিলে এই দল তৈরি করা হয। একজন চোর, একজন চুবনী এবং অন্যবা দোহাব ও বাজনদার হিসেবে দলে থাকে। তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিম দুই পারেই এই 'চোব-চুন্নী'র গানের ব্যাপক প্রচলন। ওই পালাগানেব জন্য মঞ্চেব প্রয়োজন হয় না। বাড়ির উঠোনে এই গ্রামীণ লোকনাট্যেব অভিনয হয়ে থাকে। আগে চোর-চুবনীব গানে পুরুষের গানই ছিল একমাত্র সঙ্গীতাংশ। পববর্তীকালে চুবনীব অংশে —অভিনয়ের জন্য অল্পবযসী মেয়েদেবও দলে নেওয়া শুরু হয, তখন চুরনীও সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেছে। আগে ছেলেবাই চুবনী সেজে অভিনয় কবতো। সাজসজ্জাব উপকবণ অবশ্য নিজেদেব ঘরোযা সাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। বংচঙে ঝলমলে পোশাকের এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। আগেই বলেছি বাঁধা মঞ্চেরও দবকার হয না। ফলে বাজনদারেরাও পালার কুশীলব হয়ে ওঠে। খোল, খঞ্জবী, আড়বাঁশী, [কোথাও কোথাও দোতারা] প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যিক মূল্যে সমৃদ্ধ এই চোর-চুরনী পালার শ্রেষ্ঠ পালাকাবদেব বসতি ছিল জলপাইগুড়ি শহরের আশেপাশে টুপামারী, খড়িবেচী পাড়া, বালাপাড়া, ধাপগঞ্জ গড়ালবাড়ি অঞ্চলে। এখন আর এসব অঞ্চলে চোর-চুবনী পালার লিখিত রূপ মেলে না। গানও এখন আব বিশেষ লেখা বা গীত হয় না।

সংযোজন : সম্পাদক

"সাধারণ ভাবে 'চোর-চুন্নী'-র গান বা পালাকে স্বল্প পরিচিতই বলা চলে। তবুও 'চোব-চুন্নী'-র তুলনা 'চোর-চুন্নী'-ই। এটি আঞ্চলিক রীতির একটি বিশিষ্ট দলবদ্ধ পালা-গান। এ-গানের সুরে ও কথায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী কৃষক-সমাজ যাঁরা সাধারণত পশ্চিম ডুয়ার্সের গ্রাম্য-মানুষ তাঁদেরই পালা-গান এটি। সেইখানে অনেকদিন ধরেই এ-সমাদৃত আসন অধিকার করে আছে।

"এই গানগুলি গাওয়া হয় কার্তিক মাসে। কালীপূজার পনের দিন আগে থেকে শুরু করে কালীপূজার আগের রাত্রি পর্যন্ত। গানগুলি গীত হয় সমবেত ভাবে, এজন্য একটি দল গঠন করা হয়। এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন

গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক, যিনি এ অঞ্চলে গিরি / ধনী বা দেওয়ানী নামে পরিচিত। তাঁর বাড়ির বাইরের 'ডারী ঘরে' [বহিরাগত পুরুষ অতিথির জন্য নির্দিষ্ট] তালিম চলে নিয়মিতভাবে। এই দলকে সাধারণ ভাবে 'চোর-চুন্নীর'-র দল বলা হয়। দলে একজন মূল গায়েন থাকেন। তাঁর দোহার রূপে থাকেন দুই / তিন জন, যাঁরা সবাই সুকণ্ঠের অধিকারী।

"এদের মধ্যে একজনকে চোর ও অন্য একজনকে 'চুন্নী' সাজানো হয়। এছাড়া থাকেন বাদকরা, আবহ-সুর-সঙ্গতের জন্য দোতরা, খোল, বাঁশের বাঁশি, খমক, সারিন্দা, জুড়ি—অধুনা হারমনিয়ামও বাজানো হয়।

"এ অঞ্চলের 'কুশান', 'বিষহরি' যে-ভাবে নির্দিষ্ট মঞ্চে বা আসরে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী সমন্বয়ে দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে গাওয়া হয়, চোর-চুন্নী-র গান সে ভাবে গাওয়া হয় না। সন্ধ্যা হতেই দলটি গ্রাম পরিক্রমায় বের হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট গানগুলি গায়। গৃহস্থ কৃষকগণ আনন্দিত হয়ে চাল, ডাল, নগদ অর্থও দান করে। পরে তা দিয়ে কালীপূজা করা হয়। চোর-চুন্নীর গান গেয়ে মাগুন করা হলেও এর পটভূমিতে কোনো ধর্মীয় ভাবনা নেই। এটি অনাবিল আনন্দানুষ্ঠান মাত্র।

"উল্লেখযোগ্য যে কৃষক কবিরা প্রতি বৎসরই গানের কথা পাল্টে দেন। রচনার মধ্যে সমকালের প্রভাবটি সুস্পষ্টভাবে ধরবার চেষ্টা করেন। সমাজের ভেতরের ও বাইরের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার ঢেউ [সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক] নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে আলোড়ন তোলে, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় গানের পদটি। চুন্নী বা চোরের জবানীতে এ গীত হয়ে গ্রামীণ শ্রোতাকে আনন্দিত করে বা বিষণ্ণ করে কিংবা করে কষাঘাত। ব্যঙ্গ-রসাত্মক বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি পূর্ণ অথবা লোক-শিক্ষামূলক বিষয়ও পদগুলিতে থাকে। কোনো কোনো পদে উপমা অলঙ্কার ছন্দ নিদর্শনও মেলে যা গ্রামীণ কবিদের কাছ থেকে উপরি পাওনা বলে গণ্য করা যায়।

"এই গানগুলি যাদের নিয়ে বাঁধা সেই চোর ও চুন্নী বৃহত্তর সমাজের কাছে নিন্দিত ও অবজ্ঞাত। কিন্তু তাদেরও যে একটা জীবনবৃত্ত আছে,—সেই জীবনবৃত্তে বিরহ যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা অভাব-অভিযোগ আছে, সে সবই লোককবি গানের কথার মধ্যে চিত্রিত করতে সচেষ্ট হন। তাদের প্রতি মানবিকতাবোধে একাত্ম হয়ে, অথবা এও বলা যেতে পারে চোর-চুন্নীকে সম্মুখে রেখে দরিদ্র গ্রামীণ নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের

লবণাক্ত বেদনার অব্যক্ত বাণী তাঁর আপন হৃদয়ের রসযন্ত্রে পাতন করে সহৃদয় সামাজিক মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত করার প্রয়াস পান---তাদেরই মর্মজ্বালার শরিক হতে।

"পালার শুরুতে স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর বন্দনা গাওয়া হয়। বন্দনা শেষ হলে চোর-চুন্নীর চাপান ও উতোরের রীতিতে গানগুলি পরিবেশিত হয়। মূল গায়েন এক একটি পদের কিছু অংশ গেয়ে ছেড়ে দিলে দোহারবা তা ধরে বিস্তৃত করে দেন সম্মেলক সুরে।"

□ ওপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, রাভা, মেচ প্রমুখ জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আত্মনিমগ্ন গবেষক **শ্রীযুক্ত সুনীল পাল** মহাশয়ের লেখা এবং অনেক বছর আগে একটি স্মারকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। সেখান থেকে অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে। --সম্পাদক।

এখন উদাহরণ-স্বরূপ এই বক্ষ্যমান গ্রন্থ-সম্পাদক কর্তৃক ৭ নভেম্বর ১৯৮০ জলপাইগুড়ি জেলার বেঙকান্দি [গ্রাম ও পোস্ট] থেকে সংগৃহীত একটি 'চোর-চুরনী'র পালা গানের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

বন্দনা

গড়ান : পথ্থমে বন্দনা করো তোর---দয়ে কর মোর
ওরে মোর ননী চোরা চোর ॥

চিতান : ত্রিগুণ মন্ত্রের জোরে রে---চুরি কর মুই দিন দুপোর
ওরে অলক্ষিতে কর চুরি সন্দেয়া ভাণ্ডের ভিতোর
ওরে মোর ননী চোরা চোর ॥

গড়ান : ঐ চোর চক্রপতি হরি হে চরণে ভকতি তোর
মুই অধম ডাকি তোরে-- এসো হরি এ আসোর
ওরে মোর ননী চোরা চোর ॥

চোরের উক্তি

গড়ান : কি মায়হা[১] লাগালো চুরনী লাগেয়া[২] মোক প্রেম জ্বালা
ওগো মুই না কান্দ তোর বাদে গো কান্দে মনুরা।।

চিতান : [আহার][৩] প্রেম জ্বালায় ফেলালো চুন্নী মোক
ও মোক্ নালাগে তিস্যা ভোক্[৪]---
ওগে রাইতে দিনে ফম্[৫] পড়েছে---কি আর কহিম তোক্
আয় গে চুন্নি শান্তি দেগে মোক্।

গড়ান : ওগে হাসিয়া তুই কাথা কোলো
মন প্রাণ কাড়িয়া নিলো—তুই মোরে গলার মালা—
মই না কান্দ তোব বাদে গে কান্দে মনুরা ॥

[যন্ত্রসঙ্গীত] চলান-এর গড়ান অংশ দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়।

চিতান . [আহাবে] শুনিয়া তোর হাসি মুখের আও[৬]
ঠাণ্ডা হয় মোর জ্বলা গাও—
হাসিয়া হাসিয়া বগলত্[৭] বসিয়া—দেহাটা জুড়াও
আয় গে চুন্নী দুই চাইব কথা কও ॥

গড়ান . ওগে এমন প্রেমিক হোলো—মন প্রাণ কাড়িয়া নিলো
তুই মোরে গলার মালা—
ওগে মুই না কান্দ তোর বাদে গে
কান্দে মনুরা[৮] ॥

চুরনীর উক্তি

গড়ান : চরা পোড়িসিত[৯] পিড়ীতীর ফান্দে
খালি কি তুই আসিস্ যাইস্
আজিকার মনে ঘুড়িয়া যাতুই মনুরাক্[১০] বুঝাইস্ ॥

চিতান : [আহারে] কত দিন পরে আজিরে চরা নাগাল পানু তোর
ওকি ওরে মন চোর—
আজিকার সনে ঘুড়িয়া যা তুই অশান্তি মোর ॥

গড়ান : ওরে আজি মন অশান্তি মোরে
মনিপুরের মন্দির ঘড়ে[১১]
কালি তুই ওইঠেটায় যাইস্
আজিকার মনে ঘুড়িয়া যা তুই মনুরাক বুঝাইস ॥

চিতান : [আহার] মুইও যে তোর পিরীতের নাগরী
ও মোর মন করিলো চুরি
কুল মান খোয়ানু চরা তোর প্রেমে পড়ে
কলঙ্কিনী কছেঁ টারী বাড়ী ॥

গড়ান : ওরে বিনা দোষে হয়া দুষি
মোর সনত গাই খুশী
দেখে রাইতে প্রেমের বাঁশী

কেনে তুই বাজাইস্
আজিকার মনে ঘুড়িয়া যা তুই মনুরাক বুঝাইস ॥[১২]

শব্দার্থ : ১. মায়া, ২. লাগিয়া, ৩. আর, ৪ তৃষ্ণা-ক্ষুধা, ৫ মনে, ৬ কথা, ৭. পাশে, ৮. মন, ৯. পড়িয়াছে। ১০. মনটাকে। ১১ মনিপুর নামক সংকেত স্থানে গমনের ইঙ্গিত। ১২. মনে হয় ইহা কামভোলা রায়ের গান।

মন্তব্য . সম্পাদক

চোর-চুরনী [বা চোর-চুন্নী] উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি পালাগান। ঠিকমতো আর্থিক-সাংগঠনিক, প্রয়োগকৌশলগত ও সংস্কৃতিগত সহযোগিতা এই পালাগান যদি লাভ করতো তবে এ-সর্বভারতীয় মর্যাদা অর্জন করতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়।

অন্য কি কথা? —চোর-চুরনী পালা-গান কিছু কিছু ইতস্তত সংগৃহীত হলেও এই গ্রামীণ লোকনাটক সম্পর্কে কোথাও কিছু আলোচনাও প্রায় হয় নি। যা দু-একটি আলোচনা চোখে পড়েছে তার মধ্যে অব্যাপ্তি এবং অতি-ব্যাপ্তি উভয় দোষই প্রবল। বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন ·

ক. কেউ কেউ বলেছেন যে, চোর-চুন্নী গানের প্রেরণা আনুষ্ঠানিক [functional]। ঐ একই বাক্যে এ-বিষয়ে একটি আচার [ritual] পালনের কথাও বলা হয়েছে। এতে ধন্দের সৃষ্টি হয়। 'আনুষ্ঠানিক' ও 'আচারমূলক' কি এক? মনে হয় না। কারণ অনুষ্ঠানের [function] অর্থে ব্যাপ্তি আছে [public function, social function, religious function ইত্যাদি]; এর ল্যাটিন উৎস [fungor]-এর সঙ্গে আভিচারিক ক্রিয়াও যুক্ত [prescribed order for performing *religious service*]। অতএব চোর-চুন্নীকে একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও আচারমূলক হিসাবে নেওয়া কিছু কঠিন বলেই বোধহয়।

খ. আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রগবেষণা থেকে বলতে পারি যে চোর-চুরনী পালায় মুখোশ ব্যবহৃত হতে দেখিনি। যদি কোথাও হয় তবে তাকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরতে হবে।

গ. কার্তিকী অমাবস্যা অর্থাৎ কালীপূজার দিন চুরির কাজে সার্থকতা লাভ করলে চোর সারা বছর সার্থকভাবে চুরি করতে পারবে—কেবল এই বিশ্বাসই নয়—জুয়া খেলা, শব সাধনা, আরও নানা গুপ্ত বিদ্যার প্রয়োগ বা ক্রিয়ার সার্থকতা লাভও ঐ তিথি বা রাত্রির সঙ্গে যুক্ত আছে। কাজেই

সমস্তরকম কালো বিদ্যা বা কালো যাদু [black-knowledge বা black-magic] এবং গুপ্তবিদ্যা [occultism] এই অমাবস্যার কালো রাত্রির সঙ্গে যুক্ত আছে। অতএব চুরিবিদ্যার হাতেখড়ি বা চুরির ভালো 'বউনি'-র দিন হিসাবে কার্তিকী অমাবস্যার দিনকে নির্দিষ্ট করে তার মধ্যে আচারগত তথ্য অনুসন্ধান করতে যাওয়ার পেছনে অতি অনুসন্ধানপ্রিয়তাজনিত বিশৃঙ্খলা আছে বলে করা যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ অনুসন্ধানেই বলা হয়েছে চোরের পক্ষে বাৎসরিক চুরির শুভদিন হচ্ছে আশ্বিনী অমাবস্যা অর্থাৎ মহালয়ার দিন। অতএব কার্তিকী অমাবস্যা চৌর্যবৃত্তির পক্ষে শুভযোগ--এই তত্ত্ব যুক্তির ওপর দাঁড়াতে পারে কি? মনে হয় না।

ঘ. চোর-চুন্নীর পালাগানে চোর ও চোরবধূর দুঃখময় জীবনের সমস্যা ও ব্যথাসৃষ্ট গানের পাশে পাশে সমাজের ভেতরের ও বাইরের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার ঢেউ [সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক], —যা নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে আলোড়ন তোলে, তেমন ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রচিত হয় অনেক গান। মূল বিষয়কে অতিক্রম করে অর্থাৎ চোর-চুন্নীর জীবন-সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এই যে সমাজ-চেতনা, এই যে সমাজ-বিষয়মূলক গান এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, ঐ কার্তিকী অমাবস্যা থেকেই একদা নববর্ষ গণনা করা হত। ['কার্তিকী অমাবস্যার দিন একদা রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত'] এবং কার্তিকী অমাবস্যাতেই তাঁরা দক্ষিণায়ন 'কল্পনা' করেছেন। অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানে গাণিতিক যাথার্থ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস', 'কল্পনা', ইত্যাদির ব্যবহার করে উক্ত গবেষকগণ চোর-চুন্নীর বাৎসরিক সমাজ-পর্যালোচনাকে "বৎসরের একটি বিশিষ্ট দিনে 'আদিম গণতান্ত্রিক' ['সাম্যবাদী'—primitive communism হবে নাকি?] সমাজের দুই প্রতিনিধি নিজেদের সংলাপের মধ্য দিয়া গত বৎসরের ঘটনার বিবরণী জনগণের সম্মুখে যেন উপস্থিত করিতেছে।" বিষয়টি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণিতকে ভিত্তি করে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

ঘ. ১. আমরা জানি যে, পৃথিবীর বার্ষিক গতি অনুযায়ী ২১ মার্চ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে চৈত্র মাসের ৭/৮ তারিখ নাগাদ সূর্য বিষুবরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং ঐ সময়ে উত্তর গোলার্ধে দিন-রাত্রির সময় সমান সমান। এবং এই কারণেই চৈত্র সংক্রান্তিকে 'মহাবিষুব সংক্রান্তি' বলে। তখনও সূর্যের উত্তরায়ণ চলছে। এরপর, ২১ জুন অর্থাৎ

৬/৭ আষাঢ় সূর্যের উত্তরায়ণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং সূর্য তখন কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ সময়ে উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগ হয় সর্বোচ্চ এবং রাত্রির ভাগ সর্বনিম্ন। এই কারণের জন্যই আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিকে বলা হয় 'দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি'। অর্থাৎ এই মাসের [আষাঢ়] দ্বিতীয় সপ্তাহের সূচনা ভাগেই সূর্যের দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর ২২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আশ্বিন মাসের ৪/৫ তারিখ নাগাদ সূর্য আবার বিষুবরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় ও দিন-রাত্রির ভাগ উত্তর গোলার্ধে সমান হয়ে যায়। এই জন্যেই আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিকে 'জলবিষুব' বা 'তুলা সংক্রান্তি' বলে।

পরে সূর্য আরো দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে। এবং ২১ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৫।৬ পৌষে সূর্য মকরক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগ সবচেয়ে ছোট এবং রাত সবচেয়ে বড় হয়। এই সময়েই সূর্য দক্ষিণায়নের চরমে পৌঁছে এবং আবার উত্তরদিকে উঠে আসতে আরম্ভ করে। এই জন্যেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিকে 'উত্তরায়ণ' বা 'মকর সংক্রান্তি' বলে।

ঘ. ২. এই গাণিতিক হিসাবের মধ্যে কিভাবে আসে কার্তিকী অমাবস্যা, যা কিনা কার্তিক মাসের যে-কোনো সপ্তাহে পড়তে পারে [যেমন, ১৪০৩, ২৪ কার্তিক [১৯৯৬, ১০ নভেম্বর]; ১৪০২, ৫ কার্তিক [১৯৯৫, ২৩ অক্টোবর], ১৪০১, ১৫ কার্তিক, [১৯৯৪, ২ নভেম্বর] ইত্যাদি। এর মধ্যে যদি কোনো বছরে 'মলমাস' পড়ে তবে তারিখ আরো অনেক পেছিয়ে যেতে পারে [যেমন ১৪০০ বঙ্গাব্দে কার্তিকী অমাবস্যা পড়েছিলো ২৭ কার্তিক [১৯৯৩, ১৩ নভেম্বর]। অতএব কিভাবে কার্তিক অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন এবং নববর্ষ হতে পারে? সূর্যের দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ সারা কার্তিক মাস ঘুরে বেড়াতে পারে নাকি? এ-ছাড়া উত্তর ভারতে বা বোম্বাইতে 'হালখাতা' হয় গণেশ পূজার দিন এবং গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা দীপাবলীতে [কালীপূজা ও দীপাবলী কিন্তু এক নয়] নতুন হিসাব খুললেও সেদিন তাদের নববর্ষ নয়।

ঘ. ৩. এ-ছাড়াও ধান ভানতে শিবের গীত অর্থাৎ চোরের পালা গাইতে এসে বাৎসরিক স্থানীয় বা গ্রামীণ সংবাদাদিব রিপোর্ট দেওয়ার উদাহরণ শুধু চোর-চুরনীতেই নয়, আলকাপ, বোলান, হালুয়া-হালুয়ানী

ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি গ্রামীণ নাটকেই প্রচলিত আছে। আর গম্ভীরা পালা-গানের বিষয়বস্তুই হল আচার নিরপেক্ষ সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা বা সংবাদ সমীক্ষা। সেখানে 'নানা' বা শিব একেবারেই গৌণ।

অতএব আগেই বলেছি, এই চোর-চুরনীর পালাগানের মধ্যে কোনো ধর্মীয় ভাব নেই।

৬. প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে "অগ্রহায়ণ মাস শরৎ বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছিল। এই কথাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্', আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ নামের অর্থও তাই। হায়ণ বৎসর, বৎসরের অগ্র প্রথম মাস।" কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কাব্যে [১৬ শতাব্দী] ফুল্লরা তার বারমাস্যাতেও এই কথাই বলেছে।



গ্রামীণ লোকনাটক : মৈষাল বন্ধুর পালা

অবিনয় ব্রহ্ম

বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা'-র ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা [শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯] 'ভাওয়াইয়া বিশেষ সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়। সেখানে ভাওয়াইয়া গানের উৎস-- অভিপ্রায়, ক্রমবিকাশ এবং তার বিভিন্ন প্রকার, যেমন--গাড়িয়াল মৈষাল-মাহুত ইত্যাদি বিষয়ের স্বরূপ পরিচয় বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হয়েছে। এখানে সে-সবের পুনরুল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ঐ প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটির ['বাথান-সংস্কৃতি ও ভাওয়াইয়া', পৃ ১০২-১০৮] থেকে প্রয়োজনীয় কিছু অংশ উদ্ধৃত করে কেবল মৈষাল বলতে কি বোঝায়, তাদের জীবন-জীবিকার পরিচয় কি, কি ভাবে তারা গ্রামীণ নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

"'গাড়ীয়াল' এবং 'বাঁকুয়া' গানের মতোই আর একটি প্রিয় গীতিধারা হল---'মৈষালী' গান। বিষয়বস্তু পরকীয়া প্রেম বিচ্ছেদ বিরহ, সব মিলিয়ে মৈষালের জীবনে বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। অধিকন্তু শিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাবে মৈষাল হয়ে যান বৃন্দাবনের রাখাল। মনচোরা কৃষ্ণ। হাতের দোতারা হয় অষ্ট ছিদ্র বংশী। যুবতী নারী বনে যান শ্রীরাধা। পদাবলীর গুণের সঙ্গে মিশে মৈষালী গান ভিন্ন মাত্রা পায়।

'মৈষালের মহিষ পালনই জীবিকা। চাষের জমির উপর নিজের জীবন বন্ধক না রেখে পশুপালনের মাধ্যমে এক নয়া অর্থনীতির খোঁজে সচেষ্ট হয় সম্পন্ন গৃহস্থ। ঠিক পূর্ণ নির্ভর নয়---আংশিক ফসলের সঙ্গে নতুন বিত্ত-যোগ। বাথান গড়ে ওঠে। চারণভূমির অভাব তো নেই। পতিত জমি, জলা, জঙ্গল চর, মরানদীর খাত। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর প্রকৃতি অদ্ভুত। সারা বছর শুখা। বালিতে মজা তলা। বর্ষাতে তার ভয়ঙ্কর রূপ। হাজার কেউটের ছোবলের শব্দ। একদিক গিলে খায় তো উগরে ফেলে অন্যদিকে। উগরে ফেলা চরে বা চাষের জমির উপর দিগ্‌ভ্রান্ত নদীর ফেলে যাওয়া বালিতে নলখাগড়া, এলুয়া, কাশিয়া জেগে উঠে। চারণভূমির জন্য খুবই উৎকৃষ্ট। জঙ্গল তো আছেই উজানে। সম্পন্ন পরিবারও মহিষের বাথান দেয়। কখন এও দেখা গেছে মালিক নিজেই মৈষাল। সংখ্যায় কম।

অভাবি গ্রামের মানুষই মৈষালের কাজ নেয়। মৈষালের ভবঘুরে দিকটাও বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে এই বয়সকে।

"সূর্য পাটে বসার আগে, চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ 'বিষুয়া সংক্রান্তি'-তে গিন্নির বাড়ি থেকে মৈষাল জীবদের নিয়ে রওনা দিত। সরকারী ফরেস্টে বাথান করতে হলে অবশ্যই আগাম অনুমতি নিতে হয়। বাথানে ৫০ থেকে ১৫০ পর্যন্ত মোষ থাকে। সংখ্যা অনুযায়ী মৈষাল নিয়োগ হত। বাথানের জন্য কাছাকাছি জলাশয় চাই। বালির চরে ভাবুনি ঘাস দেখলে মহিষের দল মুখ নামিয়ে স্থিরচিত্র হয়ে যায়। জঙ্গলের লতা-পাতা ছাড়াও মহিষের প্রিয় 'গারুয়া',--এক বিশেষ প্রজাতির জলজ ঘাস। 'ধানের' পাতার মতো জেগে থাকে অল্প জলে। আহার স্নান একই সঙ্গে হয়। মহিষের স্বভাবই হল জল দেখলে পাগল। বাথানের যাবতীয় দায়িত্ব মৈষালের; দুধদোহন, বাজারে বিক্রি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস স্থানীয় হাট থেকে কেনা, রাঁধা-বাড়া, সবই করতে হয়। ঘোষ গোয়ালা বাথানে এসে দুধ কিনে নিয়ে যায়। রবিবারের দুধ গোয়ালা ঘোষ পায় না। স্থানীয় মানুষদের বিতরণ করা হয়। দুধ বেচে সেদিন পয়সা নিলে মহিষের অকল্যাণ হয়, এটা সংস্কার। উত্তরবঙ্গের মানুষ উদারচেতা, অতিথি-বৎসল, সরল, বিভিন্ন সংস্কারে, বা রীতিনীতিতে বিশিষ্ট স্বভাবের। অতএব রবিবারে নরসেবাব্রত —মানুষ নারায়ণও বটে। এক একটি মহিষ সাত-আট সের পর্যন্ত দুধ দেয়। গড় পাঁচ সের। দুধ ছেঁকা হয় 'কারিয়া'-তে [বিশেষ ধরনের ফাঁপা বাঁশের চোঙা। ২/২; সের দুধ ধরে এক একটিতে]। বাথানেই পাওয়া যায় দুধজাত দ্রব্য পয়োধি। কাঁচা দুধের থেকে-মাখন বার করে সেই দুধ ব্যবহার করে হয় 'দাগরা' দই'—এ স্বাদে অম্ল। দুধ ফুটিয়ে পাতা হয় 'ছাঁচি দই'— মিষ্টি। মাখন ছাড়াও ঘি প্রস্তুত হয়। সপ্তাহান্তে 'গিরী' আসে। হিসেবনিকেশ মৈষাল বুঝিয়ে দেয়।

"মহিষের ভিন্ন-ভিন্ন নাম থাকে। সবাই যে নামধারী তা নয়। স্বভাব আর রূপের নিরিখে সে-সব নাম। কালটি, কালো, কাজল, কাজলি, সুন্দরী, নালো, ধৌলি, বড়মাই, ছোটমাই, সনেকা, আজবালা, আজলিয়া। কালোর রূপও ভিন্ন—ঘন কৃষ্ণবর্ণ, মসীবর্ণ, ছাইরঙা, ফাকাসে। 'কাজলা' স্ত্রীলিঙ্গ। স্থানীয় ভাষায় কন্যাসম্বন্ধযুক্ত প্রীতিস্নেহের সম্ভাষণে 'মাই'। রাজবালা স্থানীয় উচ্চারণে 'আজবালা'। নাম ধরে ডাকলে এরা সাড়া দেয়। মৈষাল উচ্চকণ্ঠে শূন্য বাতাসে আওয়াজ দিল—ন-ও-দারী...। বড় আদরের নাম।

নতুন-বৌ। হ্যা-ম-বা—প্রত্যুত্তর এল, বা মাথা ঝাঁকিয়ে গলার বাঁধা ঘণ্টা নাড়া দিল। প্রতি দলে পালের গোদা থাকে। দলনেতা সে। জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াবার সময় সে থাকে সর্বাগ্রে। বন্য জন্তুর আক্রমণে মুখটাকে ঈষৎ নামিয়ে শিং উঁচিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। হিস্-হিস্ শব্দে শত্রুকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি। মৈষালের জীবন রক্ষা করেছে এমনও গল্প শোনা গেছে। একপলক চোখ বুলালেই নেতা চেনা যায়। নিটোল মিশ কালো রং। কণ্ঠে বড় ধাতব ঘণ্টা। তাকে সামাল দিলে সবাই এক ঠাঁয়ে আসবে, চরবে। বনাঞ্চলে বাঘ হায়না ইত্যাদি বন্যজন্তুর অভাব নেই। সন্ধ্যের পর বাথানে পোষা প্রাণীগুলো বসে জাবর কাটে। বাঘ হামলা চালাতে চায়। মৈষালের বুকে দুর্জয় সাহস, কব্জিতে জোর ছিল অশরীরী। বজ্রকণ্ঠের হাঁক দিয়ে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। অন্য হাতে মশাল। 'ছেইরে কুত্তা ভাগ শালা—ভা...গ'। তাতে বাঘ মশাই পালালে ভাল। নইলে সম্মুখ সমর।

"ঐসব আদরের জন্তুরা বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নদীও পার করে দিত মৈষালকে। সাঁতারে মহিষের জুড়ি মেলা ভার।

"মহিষের সঙ্গে মৈষালের সম্পর্ক মনে হয় অনেকটা তো মানবিক। তারা মৈষালের নির্দেশ মানে। নিস্তব্ধ বনচ্ছায়ে মৈষাল নানান কথা বলে রসিকতা করে। সেই মৈষাল সুনাম পায় যে তাদের বশে রাখতে পারে। মৈষালের চরিত্রে আরো বিশেষ গুণ থাকতে হয়। সে লাঠিয়াল এবং শক্তিমান শুধু নয়, ভাল দোতারা বাদক। সঙ্গীত রচয়িতা, ভাল গায়ক, সে রসিকও বটে। গাঁয়ের মানুষ সেই রসিকতা উপভোগ করে থাকে। মৈষাল নাকি নানান লৌকিক মন্ত্রের ব্যবহারও জানে। বশীকরণ, আত্মরক্ষার মন্ত্র, দেও বা অপদেবতার কুদৃষ্টি তাকে ছুঁতে পারে না; অসুখ-বিসুখের নানা মন্ত্রের ওঝালিতে সে পটু। 'ঝাড়ুনি মন্ত্র' কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় :

'কলিযুগের হরির নাম চৈতন্য প্রকার।
নিয়ামে আইখ্যারে হইল দেহার বিচার ।।
মায়ের চারি, বাপের চারি, গুরুর দোয়া দশ।
আঠারো মোকাম ফিরে মহারস ।।
কন্নে কালী, ত্যাজে তিস্তাবুড়ি, মজে মাসান।
হাটু হতে পদে গঙ্গা। ছাড় ছাড় অম্মার শরীরে
কুদিষ্টি শীঘ্র করি ছাড় ।।'

"গো-বৈদ্যের বিদ্যাও জানা আছে মৈষালের। চিকিৎসার মন্ত্রের সঙ্গে দ্রব্যগুণেরও ব্যবহার দেখা যায়। মন্ত্রের ওপর শুধু নির্ভর না করে, গাছ-গাছালির প্রয়োগ তুলনায় আধুনিক। আগে কেবল মন্ত্রেরই ব্যবহার ছিল। বর্তমানে মন্ত্রের কার্যকরী ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভেষজের ব্যবহার।

"মহিষের 'মীনা' রোগে পেটটা ফুলে থাকে। টোকা মারলে ভূষির মতো ঢিপ্-ঢিপ্ শব্দ বেরোয়। এ রোগে সতেজ বাঁশপাতা বা শিশুগাছের পাতা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। 'গালাহার'—কণ্ঠনালী ফোলে, মুখে ফেনা বেরোয়। আটিয়া কলার খোড় পুড়িয়া 'ছ্যাকা' রাজবংশী সমাজে প্রিয় খাদ্য। 'ছ্যাকা' ক্ষারজাতীয়—সোডি-বাই-কার্বের গুণযুক্ত। এই ছ্যাকার প্রলেপ কণ্ঠনালীতে দেওয়া হয়ে থাকে।

"মৈষালের খাদ্য রাজসিক। দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য তো আছেই, মাছ, মাংস, ডিম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সকালের খাবার দই-চিঁড়া। দাগরা দই, চিঁড়া, সঙ্গে লবণ, গুড় মিশিয়ে কানা উঁচু শানকিতে কব্জি বুড়িয়ে খাওয়া। পাত্রের আকার আর ফলারের বহর দুই-ই মানানসই। পেটে সারাদিন ওই বস্তু থাকা চাই। নইলে ৭০/৮০ টি জীবকে চোপর দিন চরাতে দেহ এলিয়ে পড়বে। পাচন হাতে 'হেই ছোটমাই...হেই ধৌলি কোনটে যাইস, হু-র-র-র হিত্তি আয়'—বলে চিল্লে মহিষের পালকে আয়ত্তে রাখতে হয়। দলছুট হয়ে গেলেই চিত্তির। বাঘের ভোজে। অবসর খুব কম মেলে। তবে যদি চারণক্ষেত্রটি সরেস হয়, কিংবা জলাজমিতে 'গারুয়া' ঘাস পাওয়া যায় তাহলে কিছুটা নিস্তার। গামছা বিছিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া। মনখুশ থাকলে দোতারায় সুর তোলা। অপরাহ্নে গোছগাছ করে বাথানে-ফেরা। গা হাত পা ধুয়ে দোহন পর্ব। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে নৈশভোজন। এবার অন্নভোগ। সরু চালের গরম ভাতে ঘি এক খামচা। হাটবার থাকলে কাছাকাছি দূরত্ব থেকে মাছ, মাংস বা ডিম আনা হয়। দুধ তো ঘরেই মজুত।

"জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু খোলা জায়গায় বাথান হয়। জল না জমলেই হল। ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। মহিষগুলোর পায়ের চাপে বাকি আগাছা মরে গিয়ে ফুটফুটে আঙিনা হয়ে ওঠে। এলুয়া, কাশিয়া, জঙ্গলের বাঁশ, কাঠ কেটে তৈরি হয় ছোট ঝুপড়ি। মৈষালের পোশাকে বাহুল্য থাকার কথা নয়। সাধারণভাবে প্রচলন 'লেংটি'।

"বাড়ির খবর 'গিরী' নিয়ে আসে। দেবার হলে ওরই মাধ্যমে। প্রয়োজনে বাড়ি চলে আসা যায়। সামলাতে অন্যজন। নিয়মমাফিক ছুটি

বরাদ্দ কিছু নেই। মাস মাহিনা নির্দিষ্ট কিছু নেই। দক্ষতা এবং মহিষের সংখ্যার ভিত্তিতে স্থির হয়। পঞ্চাশ বছর আগের মাসিক বেতন পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা। খাইখরচা বাদ।

"অঘ্রানে ঘরে ফেরা। মৈষাল ঘরে ফিরলে উৎসব লেগে যায় 'গিরী'র বাড়িতে। উৎসবের 'মধ্যমণি' মৈষাল। বনবাসী জীবনের নানান গল্প-কাহিনীতে মৈষাল সারা গাঁ মাতিয়ে রাখে।

কল্পকথার প্রকাশ মৈষালী গানে উজ্জ্বল। জলা-জঙ্গলে বান্ধবহীন, সমাজ-বহির্ভূত মৈষালকে থাকতে হয় দীর্ঘ দিন। তার এই দীর্ঘ একাকীত্বের হাহাকার গানে ফুটে ওঠে। কখনও লঘুছন্দে এবং কখনও আদিরসাত্মক বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ করে। বিদেশ-বিভুঁই-এ এই সঙ্গীতই তার সাথী, মূক মনের ভাষা। সবুজ বনানীতে তা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে আদিগন্ত এলুয়া কাশিয়ার চরকে সুরের ঝর্নাধারায় সিক্ত করে থাকে। সমাজ নেই, অনুশাসনের কঠোর ঘেরাটোপের তর্জনী তাকে শাসায় না। মনে যা আসে তা অবিকৃতভাবে ফুটে ওঠে মৈষালী গানে। তা সমাজে যতই নিন্দিত হোক না কেন :

'গালার কাটি সোনার মৈষাল রে
মৈষাল কোন বা দ্যাশে যাও
কার মুখ দেখিয়া মৈষাল জুরাইম্ সোনার গাও।...
মৈষ চরাইতে যাইবেন মৈষাল
ঐ না দ্যাশের ভাটি,
তুই মৈষাল মরিয়া গেইলে
কায় দিবে তোক্ মাটি।।'

মৈষাল গেছে বাথানে। স্ত্রীর দুশ্চিন্তা। প্রিয়জনের সমূহ বিপদের আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত :

'বাথান বাথান করেন মৈষাল
বাথান করিলেন বাড়ি
যুবা নারী ঘরৎ থুইয়া
কায় করে চাকরি।
ছোট কালে হইছে বিয়ো রে
বয়স ভাটি গেইল
না হলুং ছাওয়ার মাও

মনে রইলেক্ দুখ।
মৈষাল ছাড়ো, বাথান ছাড়ো রে ॥
মৈষাল ঘুরিয়া আইস বাড়ি
গলার হার ব্যাচেয়া দিম্
ওই না চাকরির করি রে।'

যবতী স্ত্রীকে ঘরে ফেলে পেটের তাগিদে মৈষালের চাকরি নিয়েছে যুবক স্বামী, সন্তান-সন্ততি না থাকায় সংসার তাই শূন্য। যুবতী স্ত্রীর মন লাগে না, স্বামীকে চাকরি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। ঘরে ফিরলেই তো অভাব গিলে খাবে, স্ত্রীকে তার সোনার কণ্ঠহার বিক্রি করে দিতে হবে, তবু প্রিয়জনকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। দিন যায়, মৈষাল আর ঘরে ফেরে না। প্রেমিকার মনে নানান সন্দেহ দানা বাঁধে!

'তখনে না কইচং মৈষাল রে
না যান গোয়ালপাড়া
গোয়ালপাড়ার চ্যাংরীগুলা
জানে ধূলাপড়া।'

মৈষালের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অন্য নারী তাকে প্রেমের আমন্ত্রণ জানায় :
'আমার বাড়ি যান ও প্রাণের মৈষাল
বইসতে দিব মোড়া
বুক্কোতে হেলাসী দিয়া রে
বাজাইবেন দোতরা।
আমার বাড়ি যান্ প্রাণের মৈষাল
বইসতে দিব পিড়া,
জলপান করিতে দিব রে
সরু ধানের চিড়া।
বিরম ধানের খই
ঘরে আছে চম্পা কলা রে মৈষাল
গামছা বান্ধা দই ॥'

বাথান তো চিরস্থায়ী নয়। মৈষালকেও ঘরে ফিরতে হয়। বিদায়কালে মর্মভেদী আকূতি। মৈষালকে সে মনে মনে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে। মৈষাল বিনা সে যেন পতিহীনা-বিধবা।

তোমরা মৈষাল ছাড়ি গেইলেন,
গবুর বয়সে আড়ি রে ॥

প্রত্যুত্তরে মৈষালের উক্তি :

'ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো কন্যা রে
মিছায় তোমার মায়া
ফুলের যৈবন শুকিয়া গেইলে
ভোমরা যায় উড়িয়া।'

এমন মনে করলে অসঙ্গত হবে না যে, মৈষাল-গানে হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার যে প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে এসেছে, তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী কালে [৫০/৬০ বছর আগে হতে পারে—নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন] সঙ্গীত-সমৃদ্ধ পালা গানের উদ্ভব হয়েছে। পালা নিরপেক্ষ মৈষাল ও নিকটবর্তী গ্রামের যুবতী কন্যার গানই সর্মধিক প্রচলিত থাকলেও গ্রামীণ নাটকের আঙ্গিকে মৈষালবন্ধুর পালাও যে অভিনীত হয় তার প্রমাণ আছে। আমরা ঐ-রকম একটি পালার পাণ্ডুলিপি [হাতে লেখা] উদ্ধার করেছি [আখ্যাপত্রের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য]। এটি একটি সপ্ত-দৃশ্য সমন্বিত পালা। তার মধ্যে থেকে মাত্র সপ্তম দৃশ্যটি এখানে উদ্ধৃত হলো।

এই পালাটির রচয়িতা কোচবিহার জেলার খাগড়াবাড়ি গ্রামের জনৈক **ব্রজেন্দ্রনাথ রায়**। নাম—'মইষাল বন্ধু'। পালাটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা যায়নি—প্রথম দৃশ্যটিও খণ্ডিত।

সপ্তম দৃশ্য

বলরামপুর

[রংমালার গান করিতে করিতে প্রবেশ]

গান

গাও খান মোর জ্বলিয়া যায় রে...

[গানের শেষে মণ্ডল ও শাকালুব প্রবেশ]

মণ্ডল : রংমালা, শ্যাস ম্যাস তোর দেখা পাইলং। কি খোজাটায় না খজলং। যা হবার হইছে। এখন বাড়ি চল।

রংমালা : মণ্ডলকাকা, দোহাই তোমার, ও কথা আর না কন। বাড়ি ফিরি যাবার ঘাটা আর মোর নাই। মরিম, সেও স্বীকার, তবু বাড়ি ফিরিম না।

মণ্ডল : কি কইস? লাজ-লজ্জা তোর কিছুই নাই। হর সাধুদার মুখোত কালি দিছিস্। নিসালু প্রধানের উচা মাথা হ্যাট করছিস, সুখত খাইতে তোক ভূতে কিলাইছে।

শাকালু : হয় লতেন কি? কোনটে দশটা গেরামের রাজা নিসালু প্রধানের, আর কোনটে, ছাল নাই চাম নাই বানছা মইযাল। যতন কননা ক্যানে, কুকুরের প্যাটত কি ঘিউ সহ্য হয়।

মণ্ডল : ছিঃ ছিঃ ছিঃ—নে যা করিছিস, করিছিস্ এলা বাড়ি চল্। কানের জল কানোতে শুকাউক।

রংমালা : মণ্ডল কাকা, মুই তোমার টে বুদ্ধি নিবার চাং না। যতয় ক্যানে তোমরা ভাল মানুষ সাজেন না। তোমাক মুই ভাল করি চিনিছোং। বুড়া ধনীর চায়া তোমরা আরো বেশি বজ্জাত।

মণ্ডল : কি? এমন কইস্, তোর এত আস্পর্ধা।

রংমালা . তোমরা মনে করেন, টাকা দিয়া মান্ষেরে পাতচাটা কুকুর করা যায়। এতয় তোমার অহঙ্কার বুড়া ধনীর সোতে মোর বিয়াও ক্যানে দিবার চান। সেটা কি আমরা বুঝি না? মুই পালাং বা না পালাং হালুয়া পেন্টির ডাং কাক্ কয় সেদিন ভাল করি ট্যার পাইলেন হয়। হয়তো খানেক পাইছেন

মণ্ডল : হ্যারামজাদী, মুখ সামলে কথা কইস্? আরে শাকালু, এই শুয়োরের বাচ্ছাটাকে ধরতো, টানিয়া নৌকাত তোল। [শাকালু রংমালাকে ধরিতে উদ্যত]

শাকাল্ . ক্যামন এলয় হইল তো?

রংমালা : [চিৎকার করিয়া] কাঁয় কোনটে আছেন বাবা সকল মোক রক্ষা করো, মোক রক্ষা কর।

শাকালু : তোর দশটা বাপ হুনা দৌড়ি আইসে। ভাল চাইস তো চল, নাতেন ছির দেখছিস—[লাঠি দেখাইয়া]

[সহসা তীর-ধনুক হাতে দুঃখিয়া সর্দারের প্রবেশ]

দুঃখিয়া : এই তোম লোক কাঁয়রে? উসকো ছোড়দে, উ হামার লেড়কি আছে। না ছোঁড়বি তো এই তীরমে তোহার জান এক দম খতম করদিম্।

[ওরে বাবারে বলিতে বলিতে মণ্ডল ও শাকালুর পলায়ন]

দুঃখিয়া : আরে মাইরে, তুই কাঁয়রে, তুই কি হামার বেদিয়া রে? তুই

হামাব বুক হতে ছুটিয়ে গেলু, আর তো হামি তোকে দেখি নাবে? আয় মাই আগ, হামার বুকমে আয়।

রংমালা : বাবা, তোমবা কাঁয়? মোক রক্ষা করো। [পায়ে পড়িল]

দুঃখিয়া : [হাত ধরিয়া তুলিল] ও তুই হামার বেদিয়া না আছিস রে, তুই হামার বেদিয়া না আছিস? ওহোরে মাইরে, তুই কায়রে, কিধাব হোতে আসুলুরে? তুই তো ইধার কা আদমি না আছিস রে?

বংমালা : বাবা, মোব, দুঃখেব কথা আব না কন। দৈবের ফলে অকূল দরিয়ায় ভাসি ছোং। ঐ বদমাইসগুলাব চক্রান্তে আজি মোব এই দশা। একজন বুড়া ধনীর সাতে জোর করি মোর বিযাও দিবাব চায়।

দুঃখিয়া : হুঁ তোর ঘব কাঁহারে?

রংমালা : বাবা মোর বাড়ি বাতলা খাওয়া। একজন মইযালোক ভালবাসিয়া উয়ার বাদে মুই ঘর ছাড়িছোং, পালেযা যাযা এই বিপদে পড়িছোং। বাবা মোক তোমরা আশ্রয় দেও, আজি হাতে মুই তোমার বেটী হনু।

রংমালা : মইষালের যে মোর কি হইল. কবাব পাবং না। নদীর ঘাটত নৌকা নিয়া থাকার কথা। নৌকাত যায়া চোরার হাতোত পড়নু। সাথে মোর দাও ছিল। দাও দেখাইতে চোরা বৈঠা সুদায় জলোত ঝাপে পড়িল। মুই অকূল দরিয়াত ভাসনু। ভাসিতে ভাসিতে তোমার এই ঘাটে আসিছং। বাবা পাবেন যদি মোর মইযালোক মিলি দেও? তোমার পাঁও ধরোং— [পায়ে পড়িল]

দুঃখিয়া : বাঃ বাঃ তুই হামার বেটী হলুরে। বাঃ বাঃ তা মইযাল কোনটে বে? হামার জামাই।

বংমালা . মইষালের যে কি হইল। কবার পাবং না। বাবা পারেন যদি মোর মইযালোক মিলি দেও। তোমার পাও ধরং। [পা ধরিল]।

দুঃখিয়া : [তুলিয়া] আরে মাই, ছিঃ ছিঃ তুই এইসব বাত কি বলিস রে? হামার কাংয়ে নাইরে, হামার কাংয়ে নাই। তুই অমনু বেটী হলু। বেটা জামাই জরুর আনবে। হামার ঘর হাসবে। আঙ্গন হাসবে! ক্ষেত-খামার সব হাসবে রে---সব হাসবে। ভইষ-গরু জাগ জমিন তামাম তোলে লিখিয়া দিম। তোর বেটীব সাথে এই বুঢ়া বয়সে সাদি করিম রে সাদি করিম।

রংমালা : বাবা অত আশা না করেন। মোর নাকার পোড়া। কপালীরটে খালি দুঃখয় পাবেন। দ্যাশে মোর মাও কান্দে, বাপ কান্দে, মইযাল বন্ধু বুঝি মোর পাগল হয়া কান্দিয়া বেড়ায। অমন আশা না করেন বাবা মোর জন্য তোমরাও কান্দিবেন।

দুঃখিয়া : নারে, মাইয়া, হামি কান্দিমনারে, হামি কান্দিম না। হামি হাসিম। আরে মাই আশা না থাকলে কি সমসার বাচে রে? আশার ঝিলিকে চাঁদ জ্বলে, সুরজ জ্বলে তামাম আসমান তারায় তারায় ঝিলমিল করে। উ ঠিকে আসবে রে ঠিকে আসবে। বেটা জামাই জরুর আসবে।

রংমালা : তোমার কথায় যেন সত্য যে বাবা। আর সহ্য হয় না। মনটায় কয় আত্মবধী হয়।

দুঃখিয়া : আরে মাই, ইসব বাত তুই বলিস নারে। ও বাত বলিস না। হামার মনে বড় দুঃকসো লাগে। শুন হামার একটা লেডকী ছিল, ঠিক তোর মতো রে, ঠিক তোর মতো। একদিন দুনিয়াভর বান আসলো, ক্ষেত-খামার মানুষ ভাসলো। তোমারেটা লাগার মাফিক ক্ষেপিয়া উঠিল। ফোঁস ফোঁস ইধার ওধার ছোবল মারতে লাগল। গুম্, গুম্ গুম্, আসমানে বাঘা বাঘা হাঁকতে লাগল। লেড়কি হামার বাড়ি ডরাস এই বুকমে ভাল্লুক মাফিক কাঁপতে নাগলো। ঘুট ঘুট আন্দার হুর হুর পানি---রাতমে কিধার ভাসিয়া গেলরে, বেটা হামার কিধার ভাসিয়া গেল রে, ভাসিযা গেল।

রংমালা : বাবা মুই না বুঝিয়া তোমার মনোত দুঃখ দিনু মোক ক্ষমা করো। মুই তোমাক ছাড়ি কোনটে যাইম না।

দুঃখিয়া : হাঁ-হাঁ বেটী কোনটে যাইস্ নারে, জরুর মরিয়া যাইম। তুই আসলু, তোক পায়া আজ হামি সব ভুলবু তোকে নিয়া আবার ঘর করিম রে আবার ঘর করিম চল বেটা হামার ঘরমে চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

[সনিয়া ও গামারুর প্রবেশ]

শনিযা : গামারু দা, নদীর পাড়ের জঙ্গলগুলা ভাঙিয়া গুড়া করলোং, রংমালাক তো পাইলং না। রংমালার খোজে এপার ওপার তোলপাড় করলং। আধার কোটা ঘুঘুমারী, কড়িশাল, পানিশাল, কোনটে খুজিবার বাকি নাই।

গামারু : আরে, সেই তো কথা। কত কথা কত খবর দিলং কই কাং তো কোন খবর ধরি আসিল না? মুইও হোর তোযা নদীর উজান বায়চেঙ্গা, শিল্‌বাড়ি, পলাশতলী তন্ন তন্ন করি আসলু, কোনটে নাই।

শনিয়া : তা হইলে কি উয়ায় নদীত ঝাপে মরিমে : চলো যম পাট্রা বকোত বান্দি ফিরিয়া যাই।

গামারু : আরে সহজে কি পিছা ছাড়িম। এই পালাম গুর আন্‌ছি এটে যদি না পাই তো ভাইটিয়া যতদূর যাওয়া যায় যাইম—তবু আশা ছাড়িম না। ঐ দেখ বানছা আসির ধরছে। চেংড়াটা একেবারে পাগেলা হয়া গেইছে। উয়ার মুখের ভিতি তুই চায়া দেখিব পারং না। মোর আব কায় আছে বে। তোমরা দুই জন মোর ভাই হইলেও ভাই। ছাওয়া হইলেও ছাওয়া। তুই খানেক উয়াক যুঝা দে। মুই হোর ঐটারী বাড়িগুলা দেখিয়া আইসং। [গামারুর প্রস্থান]।

[গান করিতে করিতে বানছার প্রবেশ]

গান

ও মাই মোর দিল ছিল কালো....

[গানের শেষে দুঃখিয়া ও রংমালার প্রবেশ]

দুঃখিয়া : আরে মাই, তুই হাটি আয নারে? আরে মাস দেখতো রে এই আদমিগুলা কাঁয় আছেরে? ইসব তো এধার কা আদমি না আছে বে।

রংমালা : শনিয়াদা। তোমরায়?

শনিয়া : কায়? রংমালা? তুই—

দুঃখিয়া : আরে মাই, এই আদমিগুলো তোর লাগরে?

রংমালা : বাবা ইমরা হইল শনিয়াদা, আর এই যে তোমার জামাই—মোব মইষাল বন্ধু। তেমোর আশীর্বাদে মোর মরা মালধঞ ফিরিয়া পালু। আমাক আশীর্বাদ করো বাবা। আর যেন জীবনে দুঃখ না পাই। [রংমালা ও বানছা দুঃখিয়াকে প্রণাম করিল]

দুঃখিয়া : [তুলিয়া ধরিয়া] জামাই তুই হামার জামাই রে, তুই হামার জামাই, আজ মোর কি আনন্দ রে, কি আনন্দ। ও বেদিয়া বেটী

তুই কাঁহা ভাগ গেলুরে? হামার দিল...হামার দিল ..না না না [রংমালার প্রতি] তুই তুই হামার বেদিযা, আবে মাই তুই হামার বেদিরা আছিস রে, তুই হামার বেদিয়া আছিস। ঘব কব। গিরস্থি কর। দুযমন সব বরবাদ যাবে। নয়া জমানা আসিয়াছে। জামাই হামার নয়া জামানা আসিছে। চল, চল, হামার ঘরমে চল্ :

[গামাকর প্রবেশ ও গান]

গান

মনের শোভা মনের মানুষ রে.. ইত্যাদি।

কপি : **শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ পাল**। হাজরাপাড়া। কোচবিহাব। ১৬ ৩. ৮১।

পাল মহাশয়েব কাছে আমবা কৃতজ্ঞ।

উত্তরবঙ্গের অপরাপর গ্রামীণ পালাগুলিব মতোই 'মইষাল বন্ধু' পালা অভিনীত হয়ে থাকে। মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে। ব্যানা, মুখাবাঁশি, হারমোনিয়াম, বাঁশি, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দর্শকেরা আসরের চাবদিকে বৃত্তাকারে বসে থাকে। যাকে গ্রীনরুম বা সাজঘব বলে তা এইসব গ্রামীণ পালায় থাকে না। মোটামুটিভাবে আসবের আশে-পাশে এইসব অভিনেতারা দর্শক বা বাদ্যকরদের সঙ্গে মিলেমিশে বসে থাকে। প্রয়োজনমতো উঠে এসে অভিনয় করে আবার পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অনেকে মইষাল বন্ধুর গানের কথা উল্লেখ করলে বা উদাহরণ দিলেও, পালাগানের প্রসঙ্গে আলোচনা বা কোন পালার উল্লেখ করেননি। সেদিক থেকে মইষাল বন্ধুর এই পালাগানের উদাহরণ ও আলোচনা কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।



গ্রামীণ লোকনাট্যক : খন

পুষ্পজিৎ রায়

নাম প্রসঙ্গ :

'খন গানে'র 'খন' শব্দটির উদ্ভব এবং তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুসন্ধানযোগ্য। প্রচলিত অর্থ ছাড়াও, 'খন' শব্দের প্রতিশব্দ, অর্থ এবং ভাষ্য হিসেবে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে—উৎসব, উৎসবকাল, অবকাশ, অবসর, বিরামকাল, আনন্দ প্রভৃতি। মালদহ জেলার বরিন্দ এলাকার চারটি থানার কোথাও কোথাও [গাজোল ও হবিবপুর থানা] স্থানীয় আঞ্চলিক লোকভাষায় 'ফসল' এবং 'নতুন ফসল' অর্থে 'খন' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

এদিক থেকে বলা যায়, 'খন গান' হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসব-কালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান; মালদহের গাজোল থানায় এই গানকে 'খোজাগরি', 'খজাগরি', 'কোজাগরি', খনগান বলা হয়। কোজাগরী-পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মেলার আয়োজন থাকে বা 'মেলা বসে'; বেশ কিছুকাল আগে, এই উৎসবের সময় 'খন' গান অনুষ্ঠিত হত। কৃষিনির্ভর এই এলাকায় চাষবাসের প্রচলিত ধারা অনুসারে বলা যায়, আমন ধান রোপণের কাজ শেষ হলে কৃষক সাধারণের নিয়মিত কাজকর্মের কিছুটা অবকাশ, অবসর বা বিরাম থাকে। এই সময়ে, দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে নানান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই উৎসবের কালে, বিরামের অবকাশে, সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত পালাগানকে 'খন' গান বলা যেতে পারে।

অপর অর্থে, আনন্দের জন্য, আনন্দ লাভের জন্য, আনন্দ উপভোগের জন্য, আনন্দ বিতরণের জন্য, আনন্দ বিনোদনের জন্য যে গান—তার নাম 'খন' গান হওয়াই স্বাভাবিক।

উত্তর দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার অনেক স্থানে পালার প্রধান চরিত্রের নামের শেষে 'শরী' বা 'শোরী' যুক্ত করে খনপালার নামকরণ করা হয়। যেমন মিনতিশরী, পুন্নিমাশরী প্রভৃতি। নামের শেষে এই 'শরী' যুক্ত করার ধারাটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। 'খন' গান বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—শরী-গান, খন-পাঁচালী, রঙ-

পাঁচালী ও পাঁচালী প্রভৃতি। দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনো কোনো এলাকায় 'খন' গানকে 'জংলাগান' বলা হয়।

প্রসঙ্গত, 'খন' শব্দের এক অর্থ হচ্ছে খনন করা বা বিদীর্ণ করা। সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন, সাধারণভাবে 'খন'-এর বিষয়বস্তুতে থাকে— অপ্রকাশ্যে সংঘটিত অনৈতিক প্রণয়-কথা। এইসব অনৈতিক প্রণয়-কথার সত্যতা 'খনন' করে বা চয়ন করে সর্বসমক্ষে পরিবেশন করা হয়। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এর ফলে বিদীর্ণ হন, নিন্দিত হন। বাস্তবে দেখা গেছে, অনেক স্থানে খন গানের অনুষ্ঠান হওয়ায় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নিন্দিত ব্যক্তিবর্গ লজ্জায় অবমাননায় ভিটামাটি পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কখনও বা গ্রামবাসীর হাতে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার, তা হচ্ছে, ইদানীংকালে অবলুপ্ত, এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় পালাগান 'বোলবাহি' গানকেই অনেকে 'খন' গান বলে থাকেন। মালদহ জেলার গাজোল থানার অন্তর্ভুক্ত মাঝরা অঞ্চলের কামালপুর গ্রামের গোপাল সরকার এবং পাইল গ্রামের ইন্দ্র মণ্ডল [দুজনেই 'বোলবাহি' পালাগানের বৃদ্ধ শিল্পী]—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও, অনেক লোকশিল্পী উক্ত অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অনেকের মতে, 'বোলবাহি' পালায় যে বিষয়গুলি পরিবেশন করা হত, সেই বিষয়ের সত্যতায় সংশ্লিষ্ট অনেকের সামাজিকভাবে সম্মানহানি ঘটতো। ফলে, পালাগানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে বিবাদ-বিসংবাদ ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো। অশান্তি এড়াবার জন্য অনেক স্থানে পালাভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। মালদহের হবিবপুর থানার খুটাকাটা গ্রাম ও গাজোল থানার মাতইল গ্রামে এরকম ঘটনা ঘটেছে। দু-একটি ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা-কোর্ট-কাছারিও হয়েছে। সব মিলিয়ে, 'বোলবাহি' পালার প্রচলন হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি, লোকনাট্য হিসেবে 'গম্ভীরা' গান স্বতন্ত্র পালারূপে বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যদিও গম্ভীরা উৎসব ও অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল 'বোলবাহি' বা 'বোলাই' বা 'বোলাবাই' গান। যাই হোক, এই শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী-সমাজ-সংস্কারকদের উদ্যোগে—শহর ও গঞ্জ এলাকায় 'বোলবাহি' পালার নবরূপায়ণ গম্ভীরা গান বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, বরিন্দ এলাকার চারটি থানায়,—বিশেষত গ্রামাঞ্চলে খন গানের প্রচলন আজও দেখা যায়।

প্রচার ক্ষেত্র : উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় 'খন পালাগানে'র প্রচলন দেখা যায়।

উত্তর দিনাজপুর জেলা :

রায়গঞ্জ থানা : শালতলি, বালিযাদীঘি, সুবর্ণপুব, খোক্‌সা, মহারাজা হাট, ডাটোল, মালিবাড়ি, ইটাল, শেরপুর প্রভৃতি গ্রাম।

কালিয়াগঞ্জ থানা : উত্থাহরণ, তরঙ্গপুব, সিংতোর, ধনকৈল, উত্তব মির্জাপুব, সাদিপুর, মাহিনগর প্রভৃতি।

হেমতাবাদ থানা : ভবতপুর, বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণবাটি, ডানইল, কোঠাগ্রাম প্রভৃতি।

করণদীঘি থানা : দোমোহনা, চৌনগরা, গাংজানা, শ্রীপুর প্রভৃতি।

ইটাহার থানা : হাসুযা, কেওটাল, গুলন্দর প্রভৃতি।

চাকুলিয়া থানা : লোহাডার, তবিয়াল, মারিয়াটুলি, চাকুলিযা প্রভৃতি।

চোপড়া থানা : লক্ষ্মীপুর, জালালগছ, জয়পুরা, দাসপাড়া, নাককাটি, চাক্‌লাগছ, মালানি প্রভৃতি।

ইসলামপুর থানা : জোক্তাগাঁও, সর্দারভিটা, মাটিকুণ্ডা, কামারভিটা, মালিটোলা, আটুঘুরিয়া, বোচাভিটা, কাচারিগছ প্রভৃতি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা :

কুশমণ্ডী থানা : উত্তব কোরঞ্জি, মহীপাল, বলরামপুর, আমিনপুর, বাসুদেবপুর, শালবাড়ি, মহাগ্রাম, সারাইপুর প্রভৃতি।

কুমারগঞ্জ থানা : দিশনগর, উদয় পঞ্চগ্রাম, মূলগ্রাম, পাতিতপুকুর প্রভৃতি।

তপন থানা : বামচন্দ্রপুর, লস্করহাট, তপন, কাকনা, সোযাইর প্রভৃতি।

গঙ্গারামপুর থানা : চম্পাতলি, তকিপুর, শিবপুর, পৈতাডাঙ্গি, মথরাপুর, তেঁতুলতলা প্রভৃতি।

বংশীহারী থানা : বাতাসকুরি গ্রাম।

মালদহ জেলা :

বামনগোলা ও *হবিবপুর* থানার বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক প্রচলন ছিল। বর্তমানে বিশেষভাবে গাজোল থানায় প্রচলিত।

গাজোল থানা : চম্পাদীঘি, শুকানদীঘি. পারোল, ধ্যামধেমা, সহিল, দহিল, মহিল, মশালদীঘি, বাবুপুর, চাকনগর, হাটনগর, মাতইল, করকচ, খড়িবাড়ি, জিগিন, ময়না. পাঁচপাড়া প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী : প্রধানত দেশী-পলি-সহ ব্যাপক অংশের রাজবংশী সম্প্রদায় এই লোকনাট্যেব সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান কালে, নানান মিলন ও মিশ্রণের ফলে সমাজেব অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষও যুক্ত থাকেন। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও যুক্ত থাকেন।

দর্শক : এলাকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ দর্শক হিসেবে এই আসরে উপস্থিত হন। আধুনিক সভ্যতায় নাগরিক সংস্কৃতির নানাবিধ উপকরণ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান, তবুও পালাগুলির লোকপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য।

আসর : অন্যান্য লোকনাট্যের মতো বাড়ির খলানে, উঠোনে বা গ্রামের কোনো খোলা জায়গায় এই পালাগানের আসর বসে। চারদিকে দর্শকসাধাবণের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় আসর বসে। ইদানীং কোথাও কোথাও তিন দিক খোলা মঞ্চেও আসর অনুষ্ঠিত হয়। বাদ্য-শিল্পীদের নিয়ে শিল্পীরা গোল হয়ে আসরের মাঝখানে বসেন। কুশীলবদেব সঙ্গে গানের 'দোহারি' বা 'দোয়ারিগণ' বসেন। দলের মূল গায়েনকে বলা হয 'গীদাল'। এছাড়া, ছোটো ছোটো পালা নিয়ে দলবল সহ ভ্রাম্যমাণ পালাভিনয়ের প্রথাও প্রচলিত আছে। শরৎ ঋতু বা হেমন্ত ঋতুর বিকালে বা জ্যোৎস্না-রাতে গ্রামের বাড়ি বাড়ি পালাভিনয় হয়ে থাকে।

বাদ্যযন্ত্র : খোল, ঢোলক, হারমোনিয়াম, বাঁশি, জুড়ি বা কবতাল, তবলা, ছোটো আকাবের সানাই, ব্যাণা [বীণাযন্ত্রের মতো] প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

সাজসজ্জা ও প্রসাধন : সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। নারী-চরিত্র ও জোকার বা বিদূষক চরিত্রের সাজপোশাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওযা হয। সাধারণত পুরুয চরিত্রের হাতে বা কাঁধে গামছা এবং নাবী-চরিত্রের হাতে রুমাল থাকে। পুরুযেরাই নারী-চরিত্রে অভিনয় করেন, তবে, সম্প্রতি, কোনো কোনো দলে নারী-চরিত্রে নারীর অভিনয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেকাপের জন্য খুব সাধারণ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

পরিবেষণ রীতি : পালার প্রস্তুতিপর্বে বাদ্যযন্ত্রীরা কনসার্ট বাজান। যথারীতি আসর বন্দনা হয় এবং বন্দনার পরে মূল পালাগান শুরু হয়। পালার গানগুলি পূর্ব-প্রস্তুত, কিন্তু সংলাপ—সম্পূর্ণত তাৎক্ষণিক। গদ্য-সংলাপের পাশাপাশি গীতিসংলাপের রীতি লক্ষণীয়। আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান ও সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে নাচ পরিবেযিত হয়। গান ও নাচের লয় অতি ধীর। নাচের রীতিটিও বিশেষত্বপূর্ণ। সামান্য অঙ্গসঞ্চালনেব কৌশলে শান্ত-মধুর-

সুষমা পরিস্ফুটিত হয়। বাদ্যকার-কুশীলব সহ মোট ১২/১৪ জনের একটি দল খন পালা পরিবেষণ করে থাকেন।

বিষয়বস্তু : প্রতি বছর নতুন নতুন পালা তৈরির রেওয়াজ আছে। কাহিনী সাধারণত সামাজিক। বর্তমান কালেও, সত্য ঘটনা অবলম্বনে পালা রচনার প্রয়াস অব্যাহত। প্রধানত নরনারীর অবৈধ প্রণয়-কথা নিয়ে পালা রচিত হলেও, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয় না।

'খন পালায়' গম্ভীরা গানের মতো মূল পালা ছাড়াও, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো একটি বিষয় নিয়ে 'ছুট' গান পরিবেষণ করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। জোকার বা বিদূষকসহ ছোকরার নাচের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ভিন্ন একটি বিষয় উপস্থিত করা হয়। যেমন, দেশে প্রথম 'টকি' [সিনেমা] চালু হওয়ার পরে টকি দেখতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে গান, দেশের স্বাধীনতা লাভের [১৯৪৭] বিষয় নিয়ে গান এবং ন্যাশনাল হাই রোড নির্মাণের বিষয়ে গান—প্রভৃতি। স্বতোৎসারিত এই লোকনাট্যের পালাগুলিতে স্থানীয় লোকায়ত সমাজের ছবি খুব সাবলীলভাবে ফুটে ওঠে। বিষয়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক পরিচয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

: কিছু উল্লেখযোগ্য পালার নাম :

উত্তর দিনাজপুর জেলা :

কালিয়াগঞ্জ থানা : টিকিকাটা গোসাই, এক ফায়ার দুই মার্ডার, নয়নশরী-জামালউদ্দীন খাঁ-র ফাঁসি, কারেনশরী-যমবাউদিয়া, সাপুড়িয়া-মাজার, বালুয়া আমেনা, রুমালশরী, বাদিয়া-বাদিয়ানী, লতিফাশরী, বুলশরী প্রভৃতি।

ইসলামপুর থানা : বৌদির চক্রান্ত, সতী হেবলা, ভাই ভাই মমতা, দুরাচার জমিদার, মুক্তিমালা, লোভী জমিদার, ন্যায়-অন্যায়, সর্বহারা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রভৃতি।

চোপড়া থানা : পাতিশরী-বাগান বাউদিয়া, জুলুম-জমিদার, বৌদির সংসার, হাজি শাহের দুষ্টনীতি, অসভ্য চেয়ারম্যান, ঘুটকিয়া মেম্বার প্রভৃতি।

রায়গঞ্জ থানা : বুধাশরী-টেনাবাউদিয়া, পয়মালশরী, বিনোদ-বাসন্তী, চায়নাশরী, হাইলিং-মার্ডার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা :

কুশমণ্ডী থানা : তুফানশরী-বিলাত বাউদিয়া, সাইকেলশরী, বিলাত-

মার্ডার, আড়ি-হাজী, আইশার্বিব, তেভাগা, চল পড়িবা নাই, গাজাং পলিয়া-লালঠিযা তুরুক, নলুয়া-মার্ডার।

মালদহ জেলা :

গাজোল থানা : হেবলা সতী, অমব-মিনতি, ব্রহ্মাশরী, খেতমজুরেব খন, হাগড়ু-ভাদ্‌রী পালা, সীতা-নামোব খন প্রভৃতি।

নিদর্শন

'অমাবস্যা-পুন্নিমা' খন পালাব অংশ

[সুন্দুর জমিদার ও তাব অনুচর লেববচান। সুন্দুব জমিদাব পুত্রেব বিদ্যাশিক্ষায হতাশ, পুত্রেব বিয়ে দেবাব জন্য উদ্যোগ নেন।]

সুন্দুর : মড়াল, এইলা দেখে শুনে মনডা মোর খুবে খারাপ। আব এইডা ছুয়াক পড়ায লাভ নাই। [অর্থ—মোড়ল, এইসব দেখে শুনে মনটা আমাব খুবই খারাপ। এই ছেলেকে আব পড়িয়ে লাভ নেই।]

লেবর : পড়ালা ফর্মে রাখমা পারে না তে। 'এ পাশ করবে খুব'—নেখাপড়া করবে বেতাল। [অর্থ—পড়ার কথা মনেই রাখতে পারে না। ও পাশ করেছে! পড়াশুনায কোনো টান নেই!]

সুন্দুর : [গান] মড়ল রে বড়ই বইচু আশা
বেটাটাক ও মুই দিবা চাহাচু বেহা
মড়ল মনের আশা হয় না পূরণ
বিধির লেখা না হয় খণ্ডন মনের আশা সর্বনাশ
রে মড়ল যার কপালে যাই আছে—
দেখ মড়ল, কারও মনের আশা ভগবান
কুনোদিন পূরণ হবা দিবে নি।

[অর্থ—মড়ল, আমি ছেলেটার বিয়ে দিতে চাই, মনের আশা তো পূর্ণ হয় না, অদৃষ্টের লেখা খণ্ডন হয় না। .....ভগবান কারও মনের আশা পূরণ হতে দেবে না।]

লেবর : হয়তো মালিকদা, তমার যেনং টাকা-পয়সার অভাব নেই, বাউডার যদি মাথাশক্তি রহল হলে, তাহলে তো পড়েলে ডাক্তার না হয় ইঞ্জিনীয়ার হবার পারিল হলে। লোক দে কহে,—'যাব কান ছে তে সনা নাই, আর সনা ছে তে কানে নাই'।

[অর্থ—তাইতো মালিকদা, আপনার যেমন টাকা-পয়সার অভাব নেই, ছেলেটার বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতো।

লোকে বলে 'যার কান আছে তাব সোনা নেই, আর যার সোনা আছে তার কান নেই।']

সুন্দুর : দেখ মড়ল, এইলার তানে মুই মনে করিচু যে, বাউটাক বেহায় দিবার, আর বহুড়া যদি চালাক বুদ্ধিমান আসে যায় তাহলে মোর ঘর-সংসার আর জমিদারীডা বহুডায় চালায় লে যাবে।

[অর্থ—এইজন্যই আমি স্থির করেছি ছেলেটার বিয়ে দেবো। বউটি যদি বুদ্ধিমতী হয়, তাহলে সেই সংসাব আর জমিদারী চালিয়ে নেবে।]

লেবর : হয়তো মালিকদা, তক্‌দির যদি ঠিকছে, মেয়েডা যদি চালাক বুদ্ধিমান আসে তাহালে কোনো চিন্তায় নাই।

[অর্থ—তাহলো, ভাগ্য ভালো হলে আর চিন্তার কারণ নেই।]

সুন্দুর . তাহালে তুই মেয়ে দেখফা যা!

[অর্থ—তাহলে তুই মেয়ে দেখতে যা!]

লেবর : অনং হলে তো মুই আজিয়ে চলে যাউ!

[অর্থ—তেমন হলে তো আমি আজই যেতে পারি।]

সুন্দুর : আজিয়ে কি বে তুই এলায় চলে যা। [অর্থ—আজ কিবে, এক্ষুনি যা।]

এক পয়সা ডিমেন্ট নাই, আর যদি মেয়ে ভালো হয়, তাহলে দুই চারশ' টাকা যদি চালবা হয়, তাহলে চালায় দিম।

[অর্থ—এক পয়সা ডিমাণ্ড নাই। মেয়ে ভালো হলে—দু-চারশ টাকা খরচ করা যাবে।]

লেবর : ঠিকে ছে মালিকদা, মুই এলায় যাছ।

[অর্থ—ঠিক আছে, মালিকদা, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।]

উল্লিখিত 'অমাবস্যা-পুন্নিমা' পালাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানা এলাকা থেকে সংগৃহীত। ভাষাগত এলাকা বিভাজনের ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামপুর থানা উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যেব পূর্ণিয়া জেলার সংলগ্ন। ভৌগোলিক অবস্থানেব জন্য এই এলাকার স্থানীয় লোকভাষায় হিন্দি-ভোজপুরী-মৈথিল ভাষাভঙ্গির শব্দগত উপাদান ও উচ্চারণগত প্রভাব দেখা যায়।

[উদ্ধৃত অংশের শব্দার্থ]

মড়ল—মোড়ল, এইলা—এইগুলা, মনড়া—মনটা, খুবে—খুবই, কইচু—করেছি, দিবা—দিতে, চাহাচু—চেয়েছি, চাইছি; বেহা—বিয়ে,

কুনোদিন—কোনওদিন, দিবেনি—দেবে না; তমার—আপনার, যেনং—যেরকম; রহল হলে—যদি থাকতো; হবা পারিল হলে—হতে পারতো; লোক দে কহে—লোক যে বলে; যার কান ছে'তে সনা নাই—আর সনা ছে'তে কানে নাই—যার কান আছে, তার সোনা নেই, আর যার সোনা আছে তার কান নাই। [প্রবাদবাক্য]। এইলার তানে—এইসব কিছুর জন্য; মনে করিচু—মনে মনে ভাবছি; বাউটাক—ছেলেটাকে; বহুডা—বউটা; দেখফা—দেখতে; যাউ—যাই।

উপসংহার : বিজ্ঞানসম্মত কারণেই লোকায়ত মানসিকতার বিবর্তন অনিবার্য। গ্রামীণ নাটকের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কাঠামোও তাই কিছু কিছু বদ্‌লাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে, যান্ত্রিক কলাকৌশলের অতিসূক্ষ্ম ও বিচিত্র বিস্তার সুদূর গ্রামীণ-মানসিকতায় বিশেষ মাত্রা সৃষ্টি করেছে, সন্দেহ নাই। তবুও, মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্য আজও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। অনেক পশ্চাদ্‌পদতা, অবৈজ্ঞানিকতা এবং অস্বচ্ছ জীবনযাত্রার নানান ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও, গ্রামসমাজ আদৌ অনড় বা অচল নয়। বরং লৌকিক সৃষ্টিশীল ধারাটি আজও বহমান। সংস্কৃতির অত্যাধুনিক মাধ্যমসমূহের প্রবল প্রতাপ আজ সর্বত্র দাপাদাপি করছে, একথা ঠিক; কিন্তু যুগের এই গতিময় পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আত্মস্থ করবার মতো শক্তি লোক-মানসিকতার অভ্যন্তরে নিহিত আছে। প্রচলিত ও উল্লিখিত খন পালাগুলির বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে উক্ত লোকায়ত-মানসিকতার শক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে।

পালা সংযোজন : **ব্রজগোপাল বৈষ্ণব**

উত্তর দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রঙ্গ-রসাত্মক ছোট ছোট ঘটনার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, কিছু কথা, ছড়ার আকারে ধাঁধা ও গান-এর সমন্বয়কে বলে 'লটুয়া'। উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের মাটির নিজস্ব সম্পদ 'খন'-এর রূপভেদ এই 'লটুয়া' গান। 'লট্-ঘট্' শব্দের ভাব রূপান্তরই—'লটুয়া'। আর 'খন্' শব্দের অর্থ হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ বা ব্যক্তিজীবনের কোনো কাহিনী বা ঘটনাচক্রকে নিয়ে, গান ও কথার মালায় যে পালা তৈরি হয়—তাই 'খন' গান নামে পরিচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে 'লটুয়া'-কে কেন্দ্র করে 'খন' গান অর্থাৎ 'খন'টি হচ্ছে 'লটুয়া'। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'খন' গান রচিত হয়েছে এই জেলারই মাটির ভাষায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'খন' গানে মান্য বাঙলা বা হিন্দি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'লটুয়া'তে লোকপ্রবাদ ও প্রবচনেরও মিশ্রণ ঘটেছে। এখানে একটি 'লটুয়া' খন গান-এর উদাহরণ দেওয়া হবে।

প্রথমত আসর বন্দনা করেই এই গান পরিবেশিত হয়। তাই আসর বন্দনা দ্বারাই 'লটুয়া-খন' গানের সূচনা। এই গানে—গান গাওয়া হয় দাঁড়িয়ে নেচে নেচে, পয়ার ছন্দে কথা বলা হয়---হাঁটু ধরে বিশেষ ভঙ্গিমায়—ঘুরে ফিরে---দুইজনে মিলে। অন্য দুইজন নারী ভূমিকায় পাশে সহযোগিতা করে। বাকিরা একপাশে চট কিংবা মাদুর পেতে বসে—সমবেত কণ্ঠে সুর ধরে ও সংগত করে। উদাহরণ :

বন্দনা

১নং গান :

আগে আগে কালী মাই পিছে ভবানী গে
ক্যানে লাগালো এতয় দেরি গে—মাতা কমলা।
হে-হে-চুপ্‌ত-বারে।
পূরবে বন্দনা করি, ধর্ম-ঠাকুরের চইবন্ বন্দি—
তাঁহার চইরনে জানাই---হাজার সেলাম—গে মাতা কমলা।
হে-হে-চুপ্‌ত-বারে।
পশ্চিমে বন্দনা করি—চল্লিশ পীরের চইরন্ বন্দি।
তাঁহার চইরনে জানাই—হাজার সেলাম--গে মাতা কমলা।
হে-হে-চুপ্‌ত-বারে।
উত্তরে বন্দনা করি কালী মায়ের চইরন
কালী মা'ইর চরণে হামার শতেক পরনাম্—গে মাতা কমলা।
হে-হে-চুপ্‌ত-বারে।
দক্ষিণে বন্দনা করি—গাঙ্গি মায়ের চইরন বন্দি
গাঙ্গি মাই, কর গে হামার—কুলেরই উদ্ধার—গে মাতা কমলা।।
হে-হে-চুপ্‌ত-বারে।

[উক্ত বন্দনা গানে 'চইরন্' শব্দে চরণ এবং হে-হে চুপ্‌ত বারে, চুপ্‌ত অর্থে চুপ করা, আর বারে অর্থে সাথী। আবার হে-হে চুপ্‌ত বারে, শব্দকোষ গুলি—গানের ক্ষেত্রে 'তেহাই-এর কাজ করে এবং তাল ও সুরের সামঞ্জস্য বজায় রাখে।]

২নং গান :

[দাঁড়িয়ে নেচে নেচে—ছেলেমেয়ে চারজনে সমবেত কণ্ঠে]

জপেত মৃদঙ্গ ভাইয়া রে মোর মৃদঙ্গে তোল তান্—
কাং গে বইসে কালীমাতা গে মোর—ডাইনে হনুমান।
হে-হে-চুপ্ত-বারে।

কথন

[বিশেষ ভঙ্গিমায় হাঁটু ধরে—চলতে চলতে ঘুরে ফিরে]

১ম ব্যক্তি : একটা মুই শালুক কুড়ায়ে পানু বারে।
২য়.ব্যক্তি : শালুক না শিলুক বারে।
১ম ব্যক্তি : হা-হা শিলুক বারে। [শিলুক অর্থে শ্লোক]
২য় ব্যক্তি : এইড়া কাথার ভর।
১ম ব্যক্তি : মোক কহিতে লাগে ডর।
২য় ব্যক্তি : ইড়া কাথার মানে।
১ম ব্যক্তি : সব লোকে জানে।
২য় ব্যক্তি : যায় নি জানে।
১ম ব্যক্তি : তার নাক'ট ধরে টানে।
১ম ব্যক্তি : তলে মণ্ড, উপর্তি ছায়া
ডাকায় জান্ মালো জাতিয়া ভাইয়া।
২য় ব্যক্তি : ইড ত মুই বুঝবা নি পানু বারে,—
১ম ব্যক্তি : বুঝ'-বা পালোনি বারে—ইড ত ঘুঘ্-ড।
২য় ব্যক্তি : হাদ্দেক—সেচায় ত, ইড ত ঘুঘু-ড।
—ঘোরায় গবর তাল্ লাগাত বারে।

[এখানে মৃদঙ্গ অর্থে খোল, শিলুক বলতে শ্লোক, মণ্ড অর্থে ঘুঘু পাখি ধরার ফাঁদ, উপর্তি বলতে উপরে, ছায়া অর্থে ঘুঘু পাখির ফাঁদের উপর তৃণলতা। ডাকায় অর্থে ডেকে, জান্ মালো—জীবন নিলি, জাতিয়া ভায়া—জাতভাই। হাদ্দেখ অর্থে হায়! দেখ। ঘুঘুড—ঘুঘু পাখি। ঘোরায় গবর তাল—অর্থ আবার গানবাজনা শুরু করা]

৩ নং গান :

কল অজনু সারি সারি, বাগুড়ায় ঘেরিনু বাড়ি—
দয়াল ভাবে—না কাটেন্ পাত রে, হায় রে দারুণ বিধি।
হে-হে-চুপত-বারে।

কথন :

১ম ব্যক্তি . মোব কাথাডা শুন্‌লো তে বারে।
২য় ব্যক্তি . শুন্‌নু ত বারে, বুঝ্‌বা পারন্‌ কাহা।
১ম ব্যক্তি : মুই খাও, গুয়া-পান্‌ তোক লাগে ডর।
২য় ব্যক্তি : ই-কাথার ভর।
১ম ব্যক্তি জান্‌বা যদি চাহিস্‌—যায়ে গুরু চবণ ধর।
টাটিব উপর টাটি,
বিন্‌ ভাতাবে ছুয়া হয়, তাহে বাফেব বেটি।
২য় ব্যক্তি : কাথাডা বুঝ্‌বা কাহা পান্‌ বাবে।

১ম ব্যক্তি . বুঝ্‌বা পালো নি—ইড ত কল-গাছ-ট [অর্থাৎ কলাগাছ]।

[কল অজনু অর্থে কলার গাছ লাগালাম, বাগুড়া একরকমের ছোট গাছ, যা দিয়ে বাড়ির চাবিদিকে ঘেরা দেওযা যায় অর্থাৎ বেড়ার কাজ করে। না কাটেন পাত, কলাগাছেব পাতা না কাটা। টাটিব উপব টাটি অর্থে বেড়ার উপব বেড়া, বিন্‌ ভাতারে মানে স্বামী ছাড়া, ছুয়া হয় অর্থে সন্তান হয়, বাফের বেটি, অর্থাৎ বাপের বেটি। যেহেতু কলাগাছ থেকেই কলাগাছের জন্ম, বংশ বিস্তাবে কলাগাছের বীজের প্রযোজন হয় না। তাই বলা হয়েছে বিন্‌ ভাতারে ছুয়া অর্থে স্বামী ছাড়াই সন্তানের জন্ম।]

৪ নং গান :

কাটাকুটি কাটেলা—এ বাংগেলা বান্ধেলা,
সে বাংগেলা—ঝুল্‌কি দুয়ার গে, মাতা কমলা ॥

হে-হে চুপত বারে।

কথন :

১ম ব্যক্তি : চিকিত্‌ কলে, চাকাত্‌ কলে, মেঘের গর্জন,
আধা দামালত্‌ কুড়ায় পানু—বাফ্‌-বেটার ধন্‌,
কুড়ায় আনে রাখনু চাকার উপর,—হয়ে গেল্‌ পানি,
চাটে-চুটে খালে—কোন্‌ রাইখসানি।
২য় ব্যক্তি : কাথার নি মাথা বারে, ব্যাঙে চুরা খায়।
হালুয়াব নি— জলম হতে—বেটা বয়রাত্‌ যায়।
তোর কাথার মানে—কায় ভেলা জানে।
১ম ব্যক্তি : মোর কাথার মানে—সব লোকে জানে। ইড ত পানি-পরা পথল-ড।

২য় ব্যক্তি : লেদিখোনা—এইডয় আর বুঝবা পারু নি।
—লাগাও ত গবর তাল ডরে।

।কাটিকুটি কাটেলা মানে খড-কুটা কেটে, এ বাংগেলা বান্ধেলা অর্থে, খড় দিয়ে দু-চালা কুঁড়েঘর বেধে, ঝুল্‌কি দুয়ার মানে ঘরের দরজা এত ছোট যে তাহা ঝুলকি মানে জানালার সমান—ঘরে ঢোকা দায়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের চরম পর্যায়। চিকিত্‌ কলে, চাকাত্‌ কলে মানে বিদ্যুতের চম্‌কানি, আধা দামালত মানে বাড়ি আসার পথে অর্ধেক রাস্তায়, কুড়ায় পানু—কুড়িয়ে পেলাম। রাখনু চাকার উপর—চাকা অর্থে মাটির দেওয়ালের তাক্। হয়ে গেল্ পানি—বরফ গলে জল, শিলাবৃষ্টিতে বরফ কুড়িয়ে এনে—মাটির দেওয়ালের তাকে রেখেছিল। বরফ গলে জল হয়ে যাওয়ায়—নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করে রাক্ষসী বলে মনে করে। হয়তো সেই পথে কুড়ানো বরফ খেয়ে ফেলেছে।।

৫ নং গান :

মোর দে সায়া বিদেশ গেল,
মোক নি কহিয়া গেল্
সায়া বিনে মোর—বাংগেলা আন্ধার গে মাতা কমলা।
হে-হে চুপত বারে।

কথন :

১ম ব্যক্তি : লড়-বড়-লড়, খাইতে বড় দড়,
একলাফে গেনু মুই হাত দশ বারো,
শিগ্‌নি শিয়াল, ঝাঁকে উঠে মহীপাল,
নেঙ্গর সট্‌ সট্‌, পুন্দির চাপ,
ই কাম্ কদ্য নি করিম রে বাপ।

২য় ব্যক্তি : ইড কাথার মানে—সব লোকে ভাই জানে,
ইড ত—শিগ্‌নি আর গরু-ডর খন্।

।মোর দে সায়া অর্থে আমার স্বামী, মোক নি অর্থে আমাকে, সায়া বিনে—স্বামী বিনে, বাংগেলা অর্থে খড়ের দু-চালা ঘর। শিগনি মানে শকুন, জ্যান্ত গরু শুয়ে ঘুমিয়েছিল মাঠে। মৃত ভেবে শিয়াল এসেছিল ওকে খেতে, লাফিয়ে লাফিয়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনও উড়ে এসেছিল—লড়-বড়-লড় মানে ওর হৃষ্টপুষ্ট শরীর—মাংস খাওয়ার আশায় এবং ঘুমন্ত গরুর পশ্চাৎদেশে শকুন তার লম্বা গলা ঢুকিয়ে দেয়—গরু শকুনের গলা চেপে

ধরে তার পায়ু দ্বারা। নেঙ্গব অর্থে লেজ, সট্ সট্ মানে সোজা, অর্থাৎ গরু লেজ সোজা করে, পুন্দির চাপ অর্থে পায়ু দ্বারা শকুনের গলা চেপে ধরে। অন্য শকুনেরা ক্ষমা চাওযাতে শেষে গরু শকুনকে ছেড়ে দেয়। শকুন বলে – ই-কাম, এইরকম ভুল কাজ কখনও না।

ই-কাম, কদ্য নি করিস রে বাফ্ অর্থে এইরকম কাজ কখনও করবো না রে বাবা।।

৬ নং গান :

রাধে বেচে দুধ দহি রে মোর—কৃষ্ণ গেনায কড়ি,
এক কড়ি কম হলে রে মোর—লাগাম সাটার বাড়ি।
হে-হে চুপত বারে।

কথন :

১ম ব্যক্তি : সোক্লোত ভোক্লোত দুই বাহা,
চখু টিম্ টিম্—মাথা কাহা॥
লেপিছু মুছিচু সামটাইছু ঘর,
পেন্নাম্ করবোতে মোক্ দূরে দূরে কর।

২য় ব্যক্তি : ইড ত কাঁকড়-ট। আব উউ হোল কুযা-ড আর কাঁকড়-টর 'খন'।

[কৃষ্ণ গেনায অর্থে কৃষ্ণ গোনে। সাটার বাড়ি অর্থে চাবুকের ঘা। সোক্লোত ভোক্লোত অর্থে কাঁক্ড়ার গর্তে হাত ঢোকালে যে শব্দ হয। দুই বাহা অর্থে কাঁকড়ার বড ও মোটা দুইটি বাহু। চখু টিম্ টিম্ মানে কাঁকড়ার ছোট দুইটি চোখ। মাথা কাহা অর্থে মাথা নাই। লেপিছু মুছিচু অর্থে ঘর লেপেছি ও মুছেচি, সামটাইছু অর্থে গুছিয়েছি, অর্থাৎ কিনা কাঁকড়া কাককে বলেছে—যে আমি ঘর লেপেছি, মুছেচি ও গুছিয়েছি—

'পেন্নাম্ করবোতে মোক—দূরে দূরে কর' অর্থে কাঁকড়া কাক-কে বলছে—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে, তোমার কাছে যাবো না। আমাকে প্রণাম করতে হলে—দূর থেকে প্রণাম করলেই চলবে।]

□

গ্রামীণ লোকনাটক : কুশান

পবিত্রকুমার গুপ্ত

এক.

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের ছটি জেলা নিয়ে গঠিত ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ বা উত্তর বাঙলা নামে অভিহিত। অখণ্ড বঙ্গের রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা জেলাও একদা এই উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত ছিলো। এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য। বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, অখণ্ড দিনাজপুর ও বগুড়ায় রাজবংশীদের প্রাধান্য স্বীকৃত। পার্শ্ববর্তী আসামের অখণ্ড গোয়ালপাড়া জেলায় [বর্তমানে ধুবড়ী, কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও] রাজবংশীদের ব্যাপক বসতি।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাজবংশীরা বৃহত্তর কিরাত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে তাঁরা 'বৃহৎ বঙ্গে'-র সাংস্কৃতিক পরিবারের অন্যতম সদস্য। রাজবংশী ভাষা বাঙলা ভাষারই একটি স্থানীয় রূপ। রাজবংশী ভাষাকে কামরূপী ভাষা বলা হয়ে থাকে। কামরূপী বাঙলার একটি সমৃদ্ধ উপভাষা।

দুই.

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে কুশান গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন আসামের বিভিন্ন গ্রামে শ্রোতা হিসেবে কুশান গানে অংশগ্রহণ করেছেন [১৯৭২-১৯৮২]।

নির্বাসিতা সীতার গর্ভে, বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্মীকির শিক্ষায় লব ও কুশ রামায়ণ গান আয়ত্ত করেন। পরে মহর্ষির অনুমোদনক্রমে দুই ভাই রামচন্দ্রের সভায় এসে বীণা সহযোগে রামায়ণ গান পরিবেশণ করেন। রামায়ণ গান প্রচলনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই কুশান গানের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

কুশান গানের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সভায় গীত রামায়ণ গানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ গানই উত্তর বাঙলার কুশান গান। কুশ থেকে কুশান শব্দটির উৎপত্তি। লব ও কুশের ভূমিকায় দুজন বালক মূলত গান করে। উত্তর বাঙলায় প্রচলিত উপভাষার উচ্চারণরীতিতে 'কুশাণ' হিসেবে

উচ্চারিত। কুশের গান থেকেই কুশান গানের নামকরণ হয়েছে। রামায়ণের কাহিনী ছাড়া কুশান গান হতে পারে না। কুশান গানকে কেউ কেউ 'ব্যাণা কুশান'ও বলেন। বেণা [ব্যাণা] সহযোগে কুশান গান গীত হয় বলে এর নাম 'ব্যাণা কুশান' হয়েছে। বেনা বা ব্যাণা শব্দটি 'বীণা' থেকে উদ্ভূত।

তিন.

দশ থেকে পনেরো / বিশজন লোক নিয়ে কুশান গানের দল তৈরি হয়। এর মধ্যে একজন মূল গায়েন। দু-জন পাছ [পার্শ্ব] দোহার। একজন লব। একজন কুশ। বাকিবা প্রয়োজনে অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। ভূমিকা যখন থাকে না, তখন বাদ্যযন্ত্র বাজান। কুশান দলেব সকলেই আসরে দণ্ডায়মান হয়ে আসব রচনা করেন। মূল গায়েনেব হাতে থাকে বেণা। তাছাড়া থাকে চামব। তিনি আসরেব সম্মুখভাগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দল পরিচালনা করেন। তাঁকে দলের সূত্রধারও বলা যেতে পারে। তাঁব দু পাশে দু-জন পাছ-দোহাব তাঁকে সাহায্য করেন। দলেব অন্যান্য সদস্যবা গুণানুযায়ী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসরে অংশ নেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণও করেন।

লব ও কুশের ভূমিকায় দু-জন সুদর্শন বালক অংশ নেন। উত্তম বেশে সজ্জিত বালকদ্বয় আসরেব মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে থাকেন। এঁবা সাধাবণত সুগায়ক হন। দলের সুনাম, বদনাম, দুর্নাম—সবকিছু এঁদেব গানেব ওপর নির্ভর করে। সাধারণত বেণা বাজাতে এঁবা পারদর্শী। বেণায় পাবঙ্গম হতে না পারলেও এদের হাতে বেণা থাকবেই। সুগাযক বালকদ্বয় প্রায় সব গানগুলিই পরিবেষণ করে থাকে। অনেক দলে বালকদ্বয় সুকণ্ঠেব অধিকাবী না হওয়ায় মূল গায়েন গানগুলি পরিবেষণ করেন। তাছাড়া, মূল গায়েনকে আরও অনেক কাজ কবতে হয়। বিভিন্ন চরিত্রের সংযোজক সংলাপ, গান, বর্ণনাত্মক সংলাপ—কথা ও গানের মাধ্যমে মূল গায়েনকে পরিবেষণ করতে হয়।

চার.

বামায়ণেব কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বন করে যাত্রা বা পালার আকারে আজকাল কুশান গান পরিবেষণ করা হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারীরা চরিত্রানুযায়ী পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসরে অভিনয় করেন। মূল গায়েন সূত্রধারেব কাজ কবেন।

বেণা যন্ত্রটি কুশান গানের মূল বাদ্যযন্ত্র। কাঠের বাটি ও বাঁশের দণ্ডযুক্ত একতারবিশিষ্ট যন্ত্র বেণা। তারের ওপর ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে ছড় টেনে টেনে বেহালার মতো বাজানো হয়। বেণা লম্বায় প্রায় দেড় ফুট। বাটিটির ব্যাস ছয় ইঞ্চি। কখনো কখনো কাঠের বাটির পরিবর্তে বাঁশের গুঁড়ি দিয়ে বাটিটি নির্মিত হয়। বেণা থেকে যে সুর বের হয়, তা সুমধুর। বেণা ছাড়া সানাই, ঢোল ও করতাল ব্যবহৃত হয়।

কুশান গান পরিবেশণের কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না। যে-কোনো সময় যে-কোনো অনুষ্ঠানে কুশান গান গাওয়া হয়। পূজানুষ্ঠানের সময় পূজা-প্রাঙ্গণে কুশান গানের আসর বসে।

পাঁচ.

আসর বন্দনা দিয়ে গান শুরু হয়। আসর বন্দনার পর রাম বন্দনা। রামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রামের কাছে অভয় প্রার্থনা করা হয়।

বন্দনা শুরু করা হয় এভাবে .

এইস ওগো প্রভু এইস আমার থানে।
অধমক্ তরাইতে প্রভু আইসেন ত ?েলে।।
আমার আসর ছেইরে গো রাম অন্যের আসরে যাবো।
দোহাই নাগে বিশ্বামিত্রের কৌশল্যার মুণ্ড খাবো।।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন।
আপনার কর গান জগত পালন।।
পুষ্পরথে রামচন্দ্র করাইছে গমন।
অধমের আসরে এইসে দাও দরশন।।
আসরে আসিয়া বসিল দীন দয়াল হরি।
বানর ভুল্লুক তারা বসিল সারি সারি।।
বানরগণ বইসে গেল ভাঙ্গে বৃক্ষ-ডাল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বইসে গেল বিছিয়া বাঘ্রছাল।।
নল নীল বইসে গেল পর্বতের চূড়া।
মধ্যস্থলে বসিলেন বীর জাম্বুবান বুড়া।।—ইত্যাদি

বন্দনার পরের অংশের নাম 'ভুলালি'। দেশ, বিভিন্ন দেবদেবী, গুরু ও আসরে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করা হয়। নমুনা :

প্রথমে অযোধ্যা বন্দ, নন্দী নামে গ্রাম।
ভক্তি করি বন্দ প্রভু দূর্বাদল শ্যাম।।
নমঃ নমঃ বন্দ প্রভু বাল্মীকি মুণির চরণ।
যাহা হইতে হইল সাতকাণ্ড রামায়ণ।।
কোপি কুলের মধ্যে বন্দ বীর হনুমান।
যাহাব দর্পে লঙ্কাপুরী হইল কম্পমান।।
একশত বানর বন্দ গলে ফুলমালা।
দধিমুখে বন্দে গাবো সুগ্রীব বাজাব শালা।।
ভার্গবতী গঙ্গা বন্দ ভার্গের সীমা নাই।
যাহাব গর্ভে জন্ম হইল রাম বাজা গোসাঞিঃ।।
শ্রীরামের পিতা বন্দ দশরথ বাজন।
কৈকেয়ী সুমিত্রা বন্দ কৌশল্যার চরণ।। .
নব কুশর বন্দ বাল্মীকি মহামুণি।
মা জানকী বন্দে গাবো শ্রীরামেব ঘোরণী।।
মিথিলাতে বন্দে গাবো জনক রাজন।
ভক্তি করে বন্দে গাবো ঠাকুব লক্ষ্মণ।।...
উত্তরে কালিকা বন্দ দক্ষিণে সাগর।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাবো আশী হাজার পীর।
যাহার কেরামতে ভাই পাথর হইল চীর।।
আদিগুরু বন্দে গাবো দীক্ষাগুরুর পাও।
হস্ত ধরে সে গুরু শিকালে ডাইন আর বাও।।
মায়ের দুধ স্তন বন্দ অমূল্য ভাণ্ডার।
গয়ায় পিণ্ড দিলে ভাই শুধা না যায় ধার।।..
রাম নামটি বড় ধন শিবে যে নাম জপে।
মুণি ঋষি সেই নাম না পায় ধ্যানে।
কে জানে কে জানে রামের মহিমা জানে কে।
মুখের প্রেমে বনের বানর বন্দী হইয়াছে।
রাম নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মানুষ্য জনম যায় দিনে দিনে।।
রাম নামটি লইলে ভাই যমের দায় তরি।
রঘুনাথের পিতে একবার বল হরি হরি।।... ইত্যাদি

আসর বন্দনা, দেব বন্দনা, রাম বন্দনা ইত্যাদির পর মূল গায়েন সেদিন কোন্ পালা গাইবেন তা জানিয়ে দেন। রামায়ণের বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করে নির্দিষ্ট পালা রচনা করা হয় রাজবংশীদের আঞ্চলিক উপভাষায়। এই পালা সাধারণত স্বতস্ফূর্ত [Extempore] ভাবে গাওয়া হয়। এ-ভাষা লৌকিক।

ছয়.

এই পালাগান যে ভাবে রচিত হয়, তাতে কাব্যগত উৎকর্ষ তেমন পাওয়া যায় না। সাধারণত গ্রামের প্রায় অক্ষরজ্ঞানশূন্য কিংবা স্বল্প অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন রাজবংশী-সম্প্রদায়ের মানুষের মূল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে পয়ার ছন্দে কথ্যভাষায় পালা রচনা করেন। রচনা তাই স্বাভাবিকভাবেই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে না। আসর জমানোর জন্য অনেক সময় দু-একটি কাল্পনিক চরিত্রেরও আমদানী করা হয়। এই চরিত্রগুলি মূল গানের ফাঁকে গান ও কথার মাধ্যমে শ্রোতাদের একঘেয়েমি দূর করে। ফলে বেশ কিছু স্থূল রসিকতাও পরিবেষিত হয়। তবে এগুলি গৌণ। কুশান একান্তই রামায়ণ গান। মহাকাব্যের মূল ধারাটিই এখানে প্রাধান্য লাভ করে।

প্রবন্ধ লেখক হিসাবে আমি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে কুশান গানের আসরে পরিবর্তনের ধারা প্রত্যক্ষ করেছি। যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুশান গান বা পালা বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে যে ভাবে পরিবেষিত হতে শুরু করেছে তাতে আধুনিক নাটকের ছোঁয়া লাগছে। ফলে কুশান গানের সাঙ্গীতিক মাধুর্য ও লালিত্য অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। আবার আধুনিক রুচিও বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে পালাগানের চরিত্রই বিঘ্নিত হচ্ছে। কুশান গানের লৌকিক চরিত্র বজায় না রাখতে পারলে এর নিজস্বতা কীভাবে রক্ষিত হবে? আবার যুগের মর্জি বদলের সঙ্গে পালাগানেরও আঙ্গিকের পরিবর্তনকে অস্বীকার করাই বা যাবে কেমন করে?

□

গ্রামীণ লোকনাটক : বোলান

লীনা চাকী

বাঙলা বছরের শেষ মাস চৈত্র—'চৈতি উৎসবে'র জন্য চিহ্নিত। লোকবিশ্বাস—এটা শিবের বিয়ের মাস। সে সময় গ্রামবাঙলার বেশ কিছু অঞ্চলের শিবপূজাকে উপলক্ষ করে নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বোলান'।

চৈত্রের শেষ চারদিন শিবঠাকুরের। তাঁর উপচার সাজানোর সাড়া পড়ে যায় ভক্তদের মধ্যে। নীল ও গাজনকে কেন্দ্র করে যে শৈব আবহাওয়া তৈরি হয় তারই রেশ ধরে আসে বোলান। বোলান মূলত শিবপূজাকেন্দ্রিক হলেও গ্রামের মানুষদের মধ্যে এর রেশ ধরা থাকে বেশ কিছুদিন। নানা বোলান দল তাদের নিজেদের তৈরি পালা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে, এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় লোকনাটক বা পালার গ্রামীণ রূপ।

'বোলান' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত। অধ্যাপক সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ জানাচ্ছেন 'বুলা' ধাতু থেকে বোলান শব্দের উৎপত্তি। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে গাজনের সন্ন্যাসীকে 'বালা' বলা হতো। পরে তাদেরই গাওয়া গান হয় বোলান। যাইহোক, এ বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলা হয় 'বোল' বা 'বুলা'-র সঙ্গে উচ্চারণের ভারসাম্য রাখার জন্য কিংবা গ্রামীণ উচ্চারণের কারণে বোলান বা বুলান। তবে নদীয়া অঞ্চলের মানুষদের মুখে বুলান শব্দটি শোনা যায়। বোল অর্থ গ্রামের মানুষদের কাছে কথা বা বলা। আবার 'বোল' অর্থ ধ্বনি। সেক্ষেত্রে ভাবা যেতে পারে 'বোলান' শব্দ কোন কিছু বলা থেকেই এসেছে। ঠিক যেভাবে গ্রামের কথায় বলে 'গান বলছে', তেমনই 'বোলান বলছে' কথার চল আছে। প্রাচীন বোলান গানে আছে 'এসো মা গো সরস্বতী বসো মাগো রথে, বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে।' বোল বা বুলা-র সঙ্গে 'ন' গ্রামের মানুষদের উচ্চারণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যুক্ত বলা যেতে পারে। তাই বোল থেকে বোলান।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের মোট চারটি জেলায় বোলানের চল আছে। যেমন . নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান। তবে জেলার সর্বত্র নয়। চারটি জেলার কেন্দ্রস্থলটি বোলানের উদ্ভবের স্থান বলা

যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার সংলগ্ন অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে বোলান গানে বা পালায়। তবে বোলানের বেশি চল নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে। নদীয়া জেলার করিমপুর, তেহট্ট, কালীগঞ্জ এলাকায় এবং মুর্শিদাবাদের ডোমকল, কান্দি, পাঁচথুপি, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর অঞ্চলে প্রচুর বোলানের দল দেখা যায়। এছাড়াও বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম, নানুর ও বীরভূম জেলার কান্দরা, লাভপুর, আহমেদপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বোলানের দল।

বোলান আগে গান পরে লোকনাটক। বলাও হয় বোলান গান। প্রাচীন বোলান রচয়িতাদের রচনায় বোলানের গানই পাওয়া যায়। দুজন বা তিনজন পালাক্রমে গান করে থাকে। সে গানও গায় গাজনের শিবভক্তরা। যদিও শিবপূজাই বোলানের উপলক্ষ তথাপি এর গান রচনা হয় রামায়ণ বা মহাভারত কিংবা পুরাণের কাহিনী ধরে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিন্দাপুরে থাকেন বোলান রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। তিনি শুনিয়েছিলেন বোলান গান; [—বেশ পুরানো দিনের গান।]

গানটি হল :

চন্দ্রাবলী : যদি পেলাম পথে যেতে তোমায় ছাড়ব না
চল শ্যাম কুঞ্জে চল হে
আজকে তোমায় ছাড়বো না।

কৃষ্ণ : যাবো যে আজ নিশিথে
শ্রীরাধার মন খুশিতে
আজ তো আমায় পাবে না।

এভাবেই দুজন পালাক্রমে শুনিয়েছিলেন 'কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলী কথা'। এর পর যখন বোলান গানের প্রসার ঘটলো, মন্দির ছেড়ে গ্রামের পথে এসে দাঁড়ালো, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো তখনই তাতে সঞ্চারিত হতে থাকলো নাটকীয়তা, সংলাপের সচেতন ব্যবহারে আস্তে আস্তে গানের অংশ ছোট হয়ে এলো, এলো সংলাপ। এখন বোলান গান অনেকটাই যেন যাত্রাপালার অনুষঙ্গী। তবে এই পরিবর্তন এসেছে কালের স্বাভাবিক নিয়মে—কেউ তা চাপিয়ে দেয়নি। বোলান রচয়িতারা দর্শক ও দলের মনোভাব ও চাহিদা অনুযায়ী লেখা শুরু করেছিলেন বোলান পালা। সে

কারণেই বোলানের মূল অবলম্বন ও সম্প্রচার গানে গানে হলেও পরবর্তীকালে বোলান লোকনাট্য। অবশ্য যেহেতু নাটকের ধারাতেই পালা গাওয়া হতো সে কারণেও বোলানকে লোকনাট্য বলতে দ্বিধা নেই।

কান্দীর কাছে অমৃতমুনী গ্রামে বোলান একবার দেখেছিলাম, যা যাত্রার ঢঙে সম্পূর্ণ লোকনাটক। সেখানকার 'শ্রীদুর্গা বোলান গোষ্ঠী' বোলান গান নয় বোলান লোকনাটকেই স্বচ্ছন্দ। তবে এই মুহূর্তে প্রচলিত বোলান—লোকনাটক। গ্রামে গ্রামে যে অজস্র বোলান দল আছে তারা লোকনাটকই পরিবেষণ করে। গান নয়। প্রবীণ কিছু মানুষ গানের প্রাচীন ধারা ধরে রাখলেও তা এখন আর অনুসৃত হয় না।

বোলান পরিবেষণে কিছু নিজস্বতা আছে যা তাকে অন্যান্য লোকনাটক থেকে আলাদা করে রেখেছে। বোলানের প্রাচীন মূল রীতিটি এই রকম :

অর্ধচন্দ্রাকারে দু-দিকে চারজন করে দাঁড়াবে। মাঝখানে থাকবে বাজনদার, প্রম্পটার, লাইট ম্যান। চক্রাকারে সবাই গানের ছন্দে এগোবে—পিছোবে। এখন এই নিয়ম খুব মানা হয় না, নাটকের রীতিতে অভিনীত হয়। গানের অংশ একক বা সমবেতকণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে। মোটামুটি ঘন্টাখানেকের পালা। বোলানের চার পদক্ষেপ। **আসরবন্দনা, বোলান পালা, পাঁচালি, রঙ পাঁচালি**। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা অঞ্চলের বিশুরপুকুর গ্রামের শিল্পীরা প্রথমে শুনিয়েছিলেন আসরবন্দনা। বন্দনা করা হয়েছিল সরস্বতীর। তারপর বোলান পালা। শেষে পাঁচালি। রঙ পাঁচালি হয় তাৎক্ষণিক, বিষয় সামাজিক বা রাজনৈতিক। রঙ পাঁচালির বিষয় যেহেতু স্থূল তামাশা, তাই শিষ্টজনের সামনে রঙ পাঁচালি গাওয়ায় বাধা ছিল। রঙ পাঁচালি গান—সংলাপ নয়। সেখানে শুনেছিলাম জামাইবাবু ও শালীকে নিয়ে রসিকতা। বোলানের পালা লেখেন গ্রামের চারণকবি বা পালাকার। সেই পালাটি দলের পছন্দ হওয়ার পর ঠিক হয় গান। কোন বিশেষ সুর নির্দিষ্ট করে বলেন বোলান শিল্পীরা। সেই সুরে রচয়িতা গান লেখেন। তা কোন হিন্দি বা বাঙলা সিনেমার জনপ্রিয় গানের সুরও হতে পারে। এখন এই প্রবণতাই বেশি। আগে এক ধাঁচের একঘেয়ে সুর ছিল। এখন সেই একঘেয়েমিকে ভেঙে দিয়েছে আধুনিকতা। পালাগুলি লেখা হয় পৌরাণিক কোন দেবদেবীর কাহিনী বা এখনকার কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে। যেমন : নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন, মহাসতী অনসূয়া,

গবিবের মেয়ে, সতীলক্ষ্মী বেহুলা—যে-কোনও পালাই বোলানে গ্রহণযোগ্য। তবে এখন সামাজিক পালার দিকেই ঝোক বেশি। বোলান দলে ছেলেরাই মেয়ে সাজে। এখনও সে নিয়ম চলছে। তবে আলকাপেব মত এখানেও নারীচরিত্রে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানোর চেষ্টা তলে তলে রয়ে গেছে।

বোলান গাওয়ার সময় চৈত্র মাসের জাগবণের দিন থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত। যতদিন না বর্ষা আসে ততদিন বোলান চলে।

জাগরণেব দিন বিভিন্ন বোলান দল সাজগোজ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কোন মন্দির চত্বরে বা চৌরাস্তার মোড়ে সব জমায়েত হয়। সেখানেই এক এক দল তাদেব পালা দেখায়। তারপরে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন গ্রামে। দুমাস ধরে চলে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা। বায়না হলে খুবই ভাল, না হলে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরে। গ্রামের মাতব্বররা কোন দলের পালা ভাল লাগলে পরে তার গ্রামে গিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। কোথাও কোথাও বিভিন্ন দল এক রাত্রে পালা করে। কখনো কখনো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় আজকাল। ফলে দলগুলি নিজেরা নানাভাবে সমৃদ্ধ হতে চেষ্টা করে।

বোলান দলে থাকে ১২ থেকে ১৪ জন শিল্পী। রচয়িতা সাধারণত দলের বাইরের হয়। এ ছাড়া থাকে প্রম্পটার, লাইট ম্যান [অর্থাৎ তিনি হ্যাজাক বা টর্চ নিয়ে আলো দেখান] শিল্পী, বাদক, ম্যানেজার। মহিলা যাবা সাজে তাদের অনেক সময় বাইরে থেকেও আনা হয়। শিল্পী দল অনুযায়ী।বাজনদারেরাও প্রায় তাই। মূল বাজনা ঢোল, সানাই। এ ছাড়াও থাকে তবলা, হারমোনিয়াম, ক্ল্যাবিওনেট, মন্দিরা, ফ্লুট। পাতার বাঁশি বাজাতে দেখেছি বিশুব, পুকুরে। যে দলেব যেমন ক্ষমতা সেই অনুযায়ী বাজনদারের ব্যবস্থা।

বোলান দলের সদস্যরা সকলেই প্রায় খেটে খাওয়া মানুষ। চাষবাস প্রধান জীবিকা। বোলান দরিদ্র মানুষদের বিনোদনের উপকরণ। বোলানের অভিনেতা, কলাকুশলী প্রায় সবাই কৃষিজীবী এবং সবদিক থেকে বিচারে এদের দরিদ্রই বলা যায়। পৌষ মাসে ধান কাটার পর কৃষিজীবীদের অবসরের কাল ছিল প্রায় আষাঢ় মাস পর্যন্ত। সে সময়ে গ্রামের মানুষরা বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যদিও বিনোদনের অনেক উপকরণ বর্তমানে গ্রামে পৌঁছেছে, তবুও তাঁরা তাঁদের মূল ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না। তবে ঐতিহ্যকে বাঁচাতে হলেও

নানা সমস্যা ও অসুবিধাকে অতিক্রম করতে হয়। যেমন পোশাক। সাধারণত পৌরাণিক পালা হলে নানা ধরনের পোশাক ভাড়া করতে হয়। বাজনদার পিছু বেশ কিছু খরচা আছে। দিতে হয় বোলান রচয়িতাকেও। যাতায়াত, খাওয়াখরচ ইত্যাদি। যে দল নামকরা তাদের বায়না আসে। পুষিয়ে যায় তাদের সেই টাকায়। বেশির ভাগই নামমাত্র টাকায় বোলান পালা দেখায়। অমৃতমুনী গ্রামের 'শ্রীদুর্গা বোলান গোষ্ঠী'র শিল্পীরা নিমাই বিত্তার, ওবম বিত্তার, বৃন্দাবন মণ্ডল, রামাপদ মাহারা, মরিবাম বিত্তার সকলেই খেতমজুর, অন্যের জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। তাঁরা নিজেদের গ্রামেই দুর্গাপূজা ও শিবপূজার সময় শিবের থানে বোলান দেখান। এঁদের কোন বায়না আসে না, কেবল ভালবাসার টানে এঁরা বোলানকে কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছেন।

এ-ছাড়াও বিন্দাপুরের মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ চাকরি করেন একটি প্রাইমারি স্কুলে, সহদেব ঘোষও চাকুরি করেন। বিজয়কুমার ঘোষ, ধনেশ্বর ঘোষ, সমর মাঝি সকলেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত।

কানন দাস থাকেন মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর কাছে ফোপরা গ্রামে। তাঁর দলের নাম 'কালীমাতা বোলান দল'। কানন দাস ছাড়াও দলের সুকুমার দাস, নীলমাধব ঘোষ, আনন্দ ঘোষ, জনার্দন দাস সকলেই কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এদের দলের বেশ নাম আছে। বায়না পায় ভালই। কানন দাস নিজেই পালা লেখেন। পৈতৃক সূত্রে তিনি এই গুণটি পেয়েছেন।

অপরাপর গ্রামীণ নাটকের মতো বোলানও অপেরাধর্মী—গীতিপ্রধান। সূচনায় আছে আসর বন্দনা আর অন্তে রয়েছে রঙ পাঁচালি। মাঝের অংশটুকু পালা বা সংলাপ,—এখানেও রয়েছে গানের বাহুল্য। বোলানের গান গাওয়ার নিয়ম অনেকটা কীর্তনের মত। মূল গায়ক একটা কলি গাওয়ার পর সেটি সমস্বরে আবার গায় দোহারকিরা। 'আসর বন্দনা'য় প্রাচীন গানের সুর অনুসৃত হলেও পালার মধ্যের গানে রকমফের থাকে, যদিও প্রতিটি গানের সুর প্রায় একই রকম রাখার একটা প্রবণতা আছে।

বর্তমান কালে রঙ পাঁচালি গাওয়ার প্রথা অনেকটাই কমে এসেছে, এখন আর বিশেষ নেই, এর প্রধান কারণ বোধ হয় সুরের একঘেয়েমি। এবং এই একঘেয়েমি কাটাবার জন্যেই বোধ হয় বাজার চলতি হিন্দী ও বাঙলা গানের সুর ধার করে এনে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়।

পালার নায়িকা বা নায়ক পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মনের কথা গানে ব্যক্ত করে,—আর সে-গানে অংশ নেন সবাই, এমনকি 'ভিলেন' পর্যন্ত। যেমন 'কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলী পালায়'। কৃষ্ণ যা বলছেন গানে চন্দ্রাবলীও সেটাই বলছেন। শহুরে কানে সেটা শ্রুতিকটু লাগলেও এটাই লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য।

বোলান চার রকমের। ১. ডাক বোলান, ২. পোড়ো বোলান, ৩. পালাবন্দী বোলান, ৪. সাঁওতালি বোলান।

ডাক বোলান ও পালাবন্দী বোলানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। অন্তত গ্রামের শিল্পীরা তেমন কোন বৈসাদৃশ্য দেখেন না দুটির মধ্যে। তাই ডাক বোলান ও পালাবন্দী বোলানকে একই বলায় বাধা কোথায়? পালাবন্দী বোলান খুবই জনপ্রিয় এবং সংলগ্ন চারটি জেলায় এই বোলানই সর্বাধিক প্রচলিত এবং পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে তা এই পালাবন্দী বোলানের মধ্যেই। এই পরিবর্তনের কথা আমরা আগেই বলে এসেছি।

'পোড়ো' বা 'পড়ি' বোলান বিশেষ দু-একটি অঞ্চলে দেখা যায়। পালাবন্দী বোলান যেমন দীর্ঘস্থায়ী, পোড়ো বোলান তা নয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মড়ার মাথা নিয়ে এসে নাচগান করাকে বলে পোড়ো বোলান। মড়ার মাথা নিয়ে শিল্পী নেচে নেচে গান করেন। এছাড়াও মুখকে চিত্রবিচিত্র করে বীভৎস রূপ দিয়েও পোড়ো বোলান করা হয়। পোড়ো বোলান শিবপূজার অঙ্গীভূত এক ধর্মীয় আচার। চৈত্র মাস শিবের বিবাহের মাস—আর পোড়ো বোলানের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের শিবের বরযাত্রী বলে মনে করেন।

সাঁওতালের মত মাথায় পালক গুঁজে, গলায় পুঁতির মালা পরে খালি গায়ে কালো হাফ প্যান্ট পরে, কালো রঙ মেখে যে বোলান গাওয়া হয় তাকে সাঁওতালি বোলান বলে। গলায় ঝোলানো থাকে মাদল। হাতে তীর, ধনুক বা বল্লম। এই বোলান দেখা যায় প্রধানত নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ অঞ্চলে।

ধর্মীয় আচারের অনুষঙ্গে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ লোকনাটক 'বোলান' আজ সমাজ বিবর্তনের ধাক্কায় নিজের রূপ অনেকটা পাল্টালেও এর অখণ্ড চরিত্র-বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না—যথার্থ লোকশিল্পানুরাগীর। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ভালোবাসা দিয়ে তৈরি এই পালা-গান আধুনিক উপদ্রব-ক্ষত সামাজিকদের ক্ষণিকের হলেও অপরিমিত আনন্দদান করে।

সংযোজন : তপোময় ঘোষ

নামব্যাখ্যা :

'বোলান' মধ্যবাঙলায় প্রচলিত একটি গ্রামীণ লোকনাটক। বোলানের আভিধানিক অর্থ হল 'বোল' বা ডাক। মনে করা হয়ে থাকে 'গাঁ-জন' অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষ শিববন্দনার জন্য যে বাঁধি 'বুলি' 'গর্জন' করে আওড়া, তা থেকেই 'গাজন' এবং 'বোলান' শব্দের উৎপত্তি। চৈত্রশেষের দিগম্বর প্রকৃতির উদাসীনতা এবং শিববন্দনার মতো লৌকিক উৎসবের অনুষঙ্গে বিষয়টি যথার্থই ওতপ্রোত হয়ে আছে। মধ্যবঙ্গের একটি বোলান অধ্যুষিত জনপদ হল কাটোয়া এবং সন্নিহিত এলাকা।

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হয় যে, বোলানের ভৌগোলিক অবস্থান এই রকম : উত্তর ও পূর্ব রাঢ়ের কয়েকটি অঞ্চল : যেমন বর্ধমানের কাটোয়া, কেতুগ্রাম, কুড়মুন, বেলুন; নদীয়ার কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, তেহট্ট; বীরভূমের লাভপুর, নানুর, কীর্ণাহার, মুর্শিদাবাদের কান্দী, ভরতপুর, সালার, কাগ্রাম সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজন হল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বোলান তারই পরিপূরক আবহ সৃষ্টিকারী একটি সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি। এখনও অসংখ্য মানুষ মেতে ওঠেন এই সমবেত লোকানুষ্ঠানে।

কাটোয়া এলাকার কয়েকটি বোলান অধ্যুষিত গ্রাম হল সুদপুর, টিকরখাঁজি, নারানপুর, গোয়াই, খার্সপুর, দেয়াসীন। কেতুগ্রাম এলাকার শিবলুন - গোমাই - চরখী - কেঁউগুড়ি - পাঁচুন্দী - উদ্ধারণপুর - মুরুন্দী - বালুটিয়া প্রভৃতি। সালারের সোনারুন্দি দক্ষিণখণ্ড-জলসুতি। নানুর থানার কীর্ণাহার-পাকুরহাঁস-কালিকাপুর-দাসকলগ্রাম প্রভৃতি। লাভপুরের চৌহাটা। ভরতপুর -মসিমপুর-বাজারসো। কাটোয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গাজন হল শ্রীখণ্ডের ভূতনাথতলা, কাটোয়া শহরের নিশানতলা বা পঞ্চাননতলা, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বনাথতলা, উদ্ধারণপুর নৈহাটির কালারুদ্রতলা, গঙ্গাটিকুরীর বুড়োশিবতলা, নিরোলের ঈশানতলা, সিলুড়ির জটাধারীতলা প্রভৃতি। এছাড়া শিবলিঙ্গ থেকে শিবলুন নামের উৎপত্তি থেকে বোঝা যায় শিবলুন গ্রামেও গাজনের বেশ তোড়জোড় ছিল, আজও অবশ্য আছে। এছাড়াও এই এলাকার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই শিবের মন্দির তথা 'গাজনতলা' থাকায় ২৭ চৈত্র বিকাল থেকে এই লোকানুষ্ঠানের আয়োজন আরম্ভ হয়। স্থানীয়ভাবে এই রাত্রিকে তাই বলা হয় 'জাগরণের রাত'। গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে লোকনাট্যের দলগুলি তাদের পালাগানের অনুষ্ঠান পরিবেষণ করে বেড়ান। গাজনের আসরে আসরে লোকসমাগম হয় প্রচুর। স্ববাসী, প্রবাসী অনাবাসী গ্রাম জনতা এই সময় উপস্থিত হন স্বগ্রামে। স্বমহিম এই ধর্মীয় বাতাবরণে এই লৌকিক অনুষ্ঠান সমবেত মানুষকে বিনোদনের শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

বোলানের প্রকারভেদ ঃ

বিষয় ও আঙ্গিক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকার বোলানকে দুভাবে ভাগ করা যায়। **এক.** ডাক বোলান; **দুই.** পোড়ো বোলান বা শ্মশান দল। প্রথমেই বলা হয়েছে 'বোল' বা 'ডাক' শব্দ থেকে যেহেতু বোলান শব্দের উদ্ভব। সেইহেতু 'ডাক বোলান'-ই প্রকৃত বোলানের মূলস্রোত। এই বোলানের কুশীলবরা সাধারণ পোশাকে অথবা পালার চরিত্রানুগ সাজসজ্জা করে। দেখা যায় কখনো সাঁওতাল সেজে—দলকে দল সবাই মাথায় পাখির পালক গুঁজে তীর ধনুক কাঁধে মাদলিয়া তালে তালে নাচতে নাচতে আসরে ঢুকছে; কখনো সকলেই গেরুয়া পোশাকে মস্তক মুণ্ডন করে, টিকি রেখে 'বাবাজী' সেজে হাতে কমণ্ডলু নিয়ে চলেছেন; কখনো 'নৌকা বিলাস' বা গোপিনীর বস্ত্রহরণ পালার গোপিনী সেজে সার বেঁধে কলসি কাঁখে চলেছে। এই ডাক বোলান সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, কখনো বা বসে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ-প্রস্থানের মাধ্যমে পরিবেষিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়, পোড়ো বোলান বা শ্মশান দল। এই দলগুলি বেশ কৌতুকাবহ এবং বলা যেতে পারে আজো অবিকৃত রয়ে গেছে। এই বোলানের কুশীলবদের বিচিত্রবর্ণের এক পোশাকই শুধু দেখা যায় না, এর শিল্পীরা বিচিত্র ধরনে মুখও আঁকেন। দলে একটি বা দুটি মড়ার খুলি থাকে। সে দুটিকে আসরের মাঝখানে রেখে বা শিল্পীদের মধ্য থেকে কাউকে 'মড়ার' মতো শুইয়ে বুক চাপড়ে বিলাপের নাকি সুরে পালা গাইতে থাকে। পালাও রচিত হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট পৌরাণিক বিষয়ে। এই পালাগুলি হল : 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'সিন্ধু বধ', 'বালী বধ', 'রাবণ বধ', 'মেঘনাদ বধ', 'তরণীসেন বধ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল, 'অভিমন্যু বধ' 'দাতা কর্ণ' প্রভৃতি।

শোকের আবহে, শ্মশানের প্রেক্ষিতে, বিলাপের সুরে শুধুমাত্র ঢাকের তালে পালাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। কেতুগ্রামের কয়েকটি পোড়ো বোলানের দলের বৈশিষ্ট্য 'শকুনি নাচ'। মৃতদেহকে ঘিরে শকুনদলের বিচরণের ভঙ্গিতে এই নাচ বিশেষ আকর্ষণীয়। এইসব দলের বিচিত্র পোশাক এবং

রাক্ষসের মতো মুখ আঁকার কারণ হিসাবে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে, যেহেতু রামায়ণের পটভূমিকায় 'রাবণ বধ', 'মেঘনাদ বধ', 'তরণী সেন বধ', 'কুম্ভকর্ণ বধ' ইত্যাদির মতো পালা থাকে, তাই সুদূর অতীতে কোন বিচক্ষণ দল-পরিচালক তাঁর কুশলী ভাবনায় রাক্ষসের মতো 'মুখ এঁকে', রাক্ষসের সাজে, ফেঁসো চুল দিয়ে তৈরি করে এলোকেশী মন্দোদরী বা প্রমীলার মতো অভিনেত্রীদের এই রূপসজ্জা দিয়েছিলেন। 'বালী বধ' পালায় হনুমান সাজাও বিচিত্র নয়। এছাড়া এই পালাগান শুনতে শুনতে মনে হয় শ্মশানে যেন কাঁদছে রাজা হরিশচন্দ্র-শৈব্যা; অথবা শোকার্ত পাণ্ডব ভ্রাতারা, বা রামের অনুচর হনুমানবৃন্দ বা রক্ষকুল। মড়ার মাথা বা শায়িত অভিনেতা যেন নিহত সিন্ধু, রোহিতাশ্ব, অভিমন্যু, লক্ষ্মণ, মেঘনাদ বা তরণীসেন। এছাড়াও শ্মশানচারী শিবপূজার প্রেক্ষিতে এই দলের তাণ্ডব নৃত্যও অনেকটা মানিয়ে গেছে সামগ্রিক অভিযোজন রচনায়। তবে উদ্বেগের বিষয়, যেহেতু এই বোলান আদি এবং অবিকৃত অবস্থায় আছে, আঙ্গিকে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটায়নি সেইহেতু এই শ্রেণীর বোলানদল ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। তবে শিবলুন, গঙ্গাটিকুরী, উদ্ধারণপুরের মতো কয়েকটি সীমিত এলাকায় দু-একটি গ্রামে এর নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়। ডাক বোলানের সঙ্গে এর আরেকটি মূল পার্থক্য এই বোলান শুধুমাত্র ঐ জাগরণের বা শ্মশানের রাত্রেই গাওয়া হয়। এই এলাকায় শিবপূজার ভক্ত সন্ন্যাসীরাও ঐ রাত্রে শ্মশান নাচ করেন তারই পরিপূরক এইসব পালা। ডাক বোলান পরে ধর্মরাজ পূজা উৎসব বা অন্যান্য উপলক্ষে গীত হলেও পোড়ো বোলান শুধু শিবগাজনের।

বোলানের পালা :

'বোলান' পালায় এখনো 'বন্দনা' অংশটি আবশ্যিক শুধু নয়, গৌরচন্দ্রিকার মতো প্রারম্ভিকও। পৌরাণিক পালায় তো বটেই, 'চণ্ডীদাস রজকিনী', 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর মতো ঐতিহাসিক পালাও ভক্তিমূলক। বোলানের এমনকি বর্তমান সময়েও এই লেখক যে পালাগুলি সংগ্রহ করেছেন তার বেশির ভাগই পৌরাণিক। যেমন : 'সিন্ধু বধ', 'রাবণ বধ', 'সীতাহরণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'গোপিনীর বস্ত্রহরণ', 'নৌকা বিলাস', 'কৃষ্ণ-কালী', 'শকুন্তলা', 'কংস বধ', 'রামের বনবাস', 'লব-কুশ', 'অশ্বমেধ-যজ্ঞ', 'সতীর দেহত্যাগ' প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কতকগুলি পালা যেমন 'গোপিনীর বস্ত্রহরণ', 'চণ্ডীদাস রজকিনী', 'নৌকা বিলাস' প্রভৃতি পালায়

বিষয়কে আরেকটু লৌকিকতা মিশিয়ে আদিরসাত্মক করা হয়। খেউড়ের পর্যায়েও চলে যায় অনেক পালা। এছাড়া বোলানের সঙ্গে অবশ্য গেয় যে পাঁচালি তাতে রঙ্গরস এত বেশি পরিমাণে থাকে যে, তাকে 'রঙ পাঁচালি'ও বলা হয়। এক্ষেত্রে বৌদি-দেওর, শালি-জামাইবাবু, শাশুড়ি-জামাই ইত্যাদি লৌকিক চরিত্রের মাধ্যমে শ্লীলতাকে অতিক্রম করা হয়।

এছাড়া কিছু পালার বিষয় আধুনিক। সমসাময়িক ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে এইসব পালা রচিত হয়। এইসব পালার উদ্দেশ্য হল সমাজকে সচেতন করা। সংশ্লিষ্ট মহলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক মারা। এগুলো হল ১. ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ২. শিক্ষিতা মহিলাদের দাম্ভিকতা ৩. বালবিধবাদের দুঃখযন্ত্রণা ৪. পণপ্রথার কুফল ৫. মাতলামো ৬. শিক্ষিত যুবকদের আচরণ এবং মা-বাবাকে অগ্রাহ্য করা। ৭ ধর্মীয় ভণ্ডামি ৮. রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শহীনতা ৯. ভোটরঙ্গ ১০. সামাজিক এবং ১১. মহাজনী শোষণ ইত্যাদি। এইসব বিষয় সমন্বিত পালাগুলি নিম্নলিখিত শিরোনামায় পাওয়া গেছে 'কলির হাওয়া', 'কলির মেয়ে', 'কলির বউ', 'যুগের হাওয়া' ইত্যাদি। 'আটাত্তরের বন্যা', 'কার্গিলের যুদ্ধের' মতো পালাও পাওয়া গেছে। এইসব পালায় সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে গণ-শিল্পীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, চেতাবনি ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে এই কুশীলবরা সামাজিক অগ্রগতি, প্রযুক্তি প্রয়োগ ও আধুনিকতার বিরোধী। যেমন মেয়েদের কলেজে যাওয়া, বউদের সিনেমা দেখা, ছেলেদের রেডিও শোনা, ঘড়ি পরাকে পালার মাধ্যমে এক সময় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হত। কিন্তু বর্তমানে ট্রাক্টর-শ্যালো-মেসিনে চাষবাসকে স্বাগত জানিয়ে [এবং সামাজিকভাবে নিজেরাও তাতে সংযুক্ত হয়ে] পালাগান গাইছেন। দেখা যায় আধুনিক পালার কিছু জাতীয় চেতনাসম্পন্ন ও কিছু গণচেতনামূলক পালাও রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এছাড়া বোলানের সঙ্গে পরিপূরক এক বা একাধিক পাঁচালি থাকে। এই পাঁচালি রঙ্গরসে ভরা হলে তাকে 'রঙ পাঁচালি' বলে।

বোলানের পালাকার :

সমগ্র বোলান লোকনাটকের মতো তার পালাকাররাও উপেক্ষিত। অথচ এই পালাকারকে ঘিরেই উপস্থাপক দলটি গড়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের উৎকর্ষতার পেছনে পালাকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বোলানের পালা রচয়িতারা স্থানীয় মানুষ। অভিজাত বা কুলীন নন। তাদের বেশির ভাগ খুব

বেশি শিক্ষিত তো ননই। এমনকি অনেকে নিরক্ষর। তাঁরা ছন্দ কেটে মুখে মুখে গান বলে যান। লেখাপড়া জানা কেউ খাতায় সেই গান লিখে নেন। মধ্যশিক্ষিত পালাকারের সংখ্যাই বেশি। সংশ্লিষ্ট এলাকার অনতি-অতীতের কয়েকজন পালাকারের নামোল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। [যদিও এই উল্লেখ অসম্পূর্ণ] এঁরা হলেন : কাটোয়ার খাজুরডিহি গ্রামের প্রয়াত মধুসূদন ঘোষাল, নানুরের কালিকাপুরের অহিভূষণ মণ্ডল, কেতুগ্রামের আমগড়িয়ার সনৎ বিশ্বাস, পাণ্ডুগ্রামের দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা বেশির ভাগই চারণ কবি। কারো কারো বৃত্তি কৃষি বা বড়জোর ছেলে পড়ানো। এই শ্রেণীর ও প্রজন্মের কয়েকজন তরুণ পালাকারের নাম : গোসাই গ্রামের স্বপন রায়, গুড়পাড়া গ্রামের মানিক মণ্ডল, দেয়াসিন গ্রামের কার্তিক মণ্ডল, কুলাই গ্রামের কেষ্ট মুখার্জী প্রমুখ। এঁরা সারাবছর গ্রামেই থাকেন। সারা বছরের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পালার মাধ্যমে প্রকাশ করেন, বিশেষত আধুনিক সব পালায়। পৌরাণিক পালার ক্ষেত্রে অবশ্য এঁদেরকে সমৃদ্ধ করে পুরাণকথা, রামায়ণ, মহাভারত, কবিগান, কথকতা, এমনকি আজকের দূরদর্শনের ধারাবাহিকগুলি। কারো কারো সৃষ্ট দু-একটি পংক্তি বা গানের কলির ব্যঞ্জনা বা কাব্য সৌন্দর্য আমাদের চমকিত করে,—বিশেষত, আজকের আধুনিক বাঙলাগানের দীনতা মনে রাখলে এই তুলনা আরো স্পষ্ট হয়।

বোলানের কুশীলব :

গ্রামের নিচুতলার মেহনতি মানুষেরাই এর কুশীলব এবং পৃষ্ঠপোষক। বড়জোর সাধারণ গৃহস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা এই দলে থাকতে পারেন। তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী একে পরিহার করেই চলেন। কখনো কখনো শখ মেটাতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে খুব হালকা আনন্দোপকরণ হিসাবে একে গ্রহণ করেন।

এই পালার কুশীলবেরা, প্রায় প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ। সারা বছর কৃষিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং সুর তালের চর্চা করে শেষে একটা মরশুমি প্রযোজনায় নিজেদের যেন উজাড় করে দেন। এঁদের সামাজিক অভিজ্ঞতা বলতে অতীতে ছিল রামায়ণ-কবিগান-কথকতা আর এখন সিনেমা-রেডিও-টিভির নানা অনুষ্ঠান দেখা-শোনা। এখান থেকে সুর সংগ্রহ করে এঁরা পালাকে শ্রুতিমধুর করার চেষ্টা করেন। নৃত্যভঙ্গিমাও কখনো প্রচলিত, কখনো বা সর্বশেষ ফিল্মের জনপ্রিয় নৃত্য দৃশ্য।

বর্তমান লেখক ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় যে কয়জন দলপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ : সার্থক হাজরা [হাড়ি], দীনবন্ধু বাগদী, বঙ্কিম মেটে [বাগদী], ব্রহ্মানন্দ মাঝি, সুধাকর মাঝি [বাগদী], সুবল থান্দার [ডোম] আস্তিক ঘোষ, দীনবন্ধু মণ্ডল [সদ্‌গোপ], কাশীনাথ ঘোষ, শ্যামল ঘোষ [গোয়ালা]। মধ্যবঙ্গের উল্লিখিত অংশের জনজাতির গোষ্ঠীবিন্যাস অনুযায়ী এটা সহজেই অনুমেয় যে, এঁরা কারা, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এঁদের অবস্থান কোথায়?

উপরোক্ত দলপতিরা তাঁদের সম্প্রদায়ের দশ থেকে কুড়ি জনকে নিয়ে দল গঠন করেন, যারা সামাজিকভাবে একই স্তরের। দলপতির দলের গায়ক-অভিনেতারাও স্থানীয় পাড়া বা গ্রামের বাসিন্দা [অতিথি শিল্পী থাকলেও সংখ্যায় খুবই কম]। তাঁদের মধ্যে যাঁদের গলায় সুর আছে গায়কীতে মুন্সিয়ানা আছে তাঁরাই মূল চরিত্রে অভিনয়, এমনকি 'মূলগায়েনে'র ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হন। অদক্ষ এবং অর্ধদক্ষরাও 'দোয়ারকি' হিসাবে দলকে পুষ্ট করেন; বাজনদারও পাড়া বা এলাকারই কেউ। বাদ্যযন্ত্র বলতে ঢোল, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, মাদল, কখনো কখনো তবলা-বাঁয়া আর হার্মোনিয়াম। দলের মাস্টারই হার্মোনিয়ামে সুর মেলান। থাকেন একজন স্মারক। সাধারণত পাড়ার শিক্ষিত যুবকেরাই এই ভূমিকাটি পালন করেন। আসরে আসরে এঁদের গলায় আকন্দ ফুলের মালা পরানোর একটা 'রেওয়াজ' আছে। এঁদের 'মহুরী' বলা হয়।

কুশীলবদের সাজসজ্জা :

পালা এবং চরিত্রানুগ আটপৌরে বা জাঁকালো সাজপোশাক এঁরা ব্যবহার করেন। কিন্তু কাটোয়া এলাকার কিছু দলে দেখা যায় বেঢপ সব পোষাক। 'সঙ' সাজার মতো কেউ কেউ পাড়ার বৌদির কাজ থেকে ব্লাউজ-শাড়ি-ওড়না বা মেয়েদের কাছ থেকে গাউন-চুড়িদার সংগ্রহ করে পরে নেন। কেউ কেউ পরচুলা বানিয়ে বা কিনে পরেন। সস্তার চুড়ি-মালা-গয়না কিনেও চরিত্রানুগ বা বেমানান পোশাক পরে হাসির খোরাক হন। তাছাড়া কখনো সবাই হাফপ্যান্ট, পায়ে কেডস পরে, কখনো 'রণপা' পায়ে আসরে হাজির হন।

দল গঠনের গোড়ার কথা :

আগেই বলা হয়েছে বেশির ভাগ দল মরশুমি এবং অস্থায়ী। ফাগুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে উদ্যোগ শুরু হয় চোত-গাজনে গাইবার জন্য। এই

সময় দলপতি বা কয়েকজন উদ্যোগী যুবক মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, এবারও 'বোলান হবে'। এরপর সুর দেওয়া, তারপর পালা ঠিক করা এবং পালাকারের কাছ থেকে সুর অনুযায়ী তা লিখিয়ে নেওয়া। দলে পালাকার থাকলে কাজটি সহজ হয়। এরপর বাদ্যকরের সঙ্গতে সান্ধ্য অবসরে নৃত্যগীতের মহড়া।

এই গানের সুর নির্বাচিত হয় বিচিত্রভাবে। কখনো প্রচলিত লোকগীতি, বাউল, কীর্তন, কখনো জনপ্রিয় ফিল্মিগানের সুরই গৃহীত হয়। কেউ কেউ মনে করেন সুরের ক্ষেত্রে বোলান তার ঐতিহ্য ও নিজস্বতা হারাচ্ছে। অতীতের লোকসুরের বদলে আধুনিক ও ফিল্মি গানের সুর আরোপিত হচ্ছে। কিন্তু এই বিচ্যুতির সূচনা অনেক আগে। পাঁচের দশকে 'আনারকলি' বা ঐ ধরনের হিন্দী ছবির লা রে লা প্পা গানের অনুকরণ শুরু হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় এ বিদূষণ শুধু বোলানে নয়, দেড়শ বছর আগে ব্রাহ্ম গানেও হয়েছিল বলে জানা যায়। ব্রাহ্ম গানেও টপ্পার সুর ঢুকেছিল। ব্রাহ্ম গানে টপ্পার সুর অনেকের পছন্দ হয়নি। খ্যাতনামা সঙ্গীততত্ত্ববিদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতসূত্রসার' [তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৫] গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন : 'ইদানীং ব্রহ্মগীত প্রায়ই টপ্পার সুরে রচিত হইতে দেখা যায়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়'।

বোলান দলের অন্যান্য দিক

বোলান দলের অন্যান্য দিক যেমন আয়-ব্যয়ের হিসাব, অনুষ্ঠান সূচী নির্ধারণ, এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি দলপতি কয়েকজনের সহযোগিতায় করে থাকেন। কোন দিকে গিয়ে কোন কোন গ্রামের আসরে অভিনয় হবে তা নিয়ে যেমন মতদ্বৈধতা থাকে, তেমনি থাকে সুর, পালা এবং পালাকার নির্বাচন নিয়েও। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য আর পাঁচটা সংস্থা বা সংগঠনের মতো মতভেদের জেরে দল ভাঙে এবং নতুন দলেরও সৃষ্টি হয়। বোলান দলের আয় আসরে নৃত্যগীত পরিবেষণ করার পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক। তার আগে বাদ্যযন্ত্রের, পোশাকের, পালা আনার জন্যে খরচ করতে যায়। বেশির ভাগ দলে কোন স্থায়ী কোষ বা গচ্ছিত টাকা থাকে না। তাই সদস্যরা প্রারম্ভিকভাবে নিজেরা চাঁদা দিয়ে দল তৈরির কাজ আরম্ভ করেন।

বোলানে সমসাময়িক প্রসঙ্গ :

অন্যান্য লোকনাটকের মতো বোলানও পুরাণকথা এবং ধর্মীয় উপাখ্যানকেন্দ্রিক। তথাপি চলমান সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত এবং আর্থ-

সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পালা রচয়িতারা বাদ দিতে পারেন না। বোলান স্রষ্টারা যেহেতু আলাদা কোন সত্তা নন, সময় ও সমাজেরই প্রতিনিধি এবং শ্রমজীবী তাই বোলানেও অন্যায়-উৎপীড়ন-ব্যভিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে পালা সাজানো হয়। কাটোয়া থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বোলানের উদ্ধৃতি দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। এগুলি ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের সপক্ষে গণবিক্ষোভের একটি নমুনা :

দিনের আলো নিভিয়া আসিছে, আঁধার আসিছে ঘিরে।
ওরে ও ভাই গরীব দুঃখী, দাঁড়াও উচ্চশিরে।।
মাঠে নাই কাজ বেকার সব আজ অনাহারে রয় পড়ে
চাল তেল মসলা সব ছেড়ে আসা, রোদন করিছে ঘরে।
জাগো রে ও ভাই গরীব সবাই দলে দলে নরনারী
ঝাঁপিয়ে পড়ো ধনীর ঘরে খাও লুটপাট করি।
সরকার ধরিবে জেলেতে পাঠাবে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবে
তবু জঠর জ্বালা কিঞ্চিত উসলা, হাজতে বসিয়া পাবে।।
[ভূতনাথ দাস : কাটোয়া][১]

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৭২ সালে লেখা একটি বোলানের অংশবিশেষ :

স্বাধীন হয়ে কি দিন এলো কিছুই বুঝতে পারি না।
এ ভারতে বাস করে আর কোন শান্তি পেলাম না।।
বাজার দরে উঠল আগুন
যা ছিল তার হল চারগুণ
[আবার] তিনটাকা কেজি হল নুন চাটনি খেতে পেলাম না।
এ ভারতে.....

সরষের তেলের বাজার চড়া
খেতে পাইনা ভাজা পোড়া
চপ-বেগুনি আর ঝাল বড়া, পাঁপড় খেতে পেলাম না।।
এ ভারতে.....

নারকেল তেল ভেজাল দিলে
পঁচিশ টাকা কেজি নিলে
বউ গিন্নির চাঁচর চুলে, নেচা বেঁধে ছাড়ে না।।
এ ভারতে .....

কেরসিন তেল দেয় না মূলে
বসে থাকি বাতি জ্বেলে,
অন্ধকারে মশায় খেলে, জ্বলন তো আব থামে না।।
এ ভারতে . . .

একশ টাকা এক জোড়ার দাম
কিনতে কাপড় বেরল ঘাম
ধান চেলের হল বেশি দাম, খেয়ে দেয়ে বাঁচে না।
এ ভারতে . .
[অহিভূষণ মণ্ডল . কালিকাপুব]

সাতের দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ও গণটোকাটুকির চিত্র সম্বলিত বোলানের পয়াব .

কলেজেব প্রফেসারে, লেকচার ঝাড়ে উচ্চৈস্বরে
ভাইরা আমাব শোনেও না তা কানে
তারা মশগুল হয়ে গল্প করে যত বন্ধুগণে।।
করে না কো লেখাপড়া, ফাঁট দিয়ে বেড়ায় তারা নিজ নিজ মনে
'আমরা' না পড়েই তো পাশ করিব খেটে মবব কেনে?'
পরীক্ষার সময় হলে যুক্তি করে সবাই মিলে
বলে একতা ভেঙো না
মোবা চুরি করতে না দিলে আর পরীক্ষাই দেব না।।
এ তো মজার লেখাপড়া গো, হচে বাবার দফা সাবা গো... [ঐ]

সাক্ষরতাব মতো সামাজিক আন্দোলনের সচেতনতা সৃষ্টি করতে :

সাক্ষরতার প্রদীপ এসো সব হৃদয়ে জ্বালাই
অজ্ঞানতার অন্ধকার, বলুক, পালাই পালাই।

ফসল কাটা, কাজকর্মের অজুহাতে যারা এই আহ্বানকে উপেক্ষা করে, তাদের প্রতি আবো মোলায়েম সুরে :

ফসল তুলতে হবেই তো ভাই করতেও হবে পড়া
গরীব মানুষ তাই তো জীবন শ্রম দিয়েই তো গড়া।
সারাবছরই কাজকর্ম এখন গঞ্জে গাঁয়ে
তারই ফাঁকে পড়তে এসো আড্ডা রাখো বাঁয়ে।।

সব শেষে একটি পৌরাণিক পালা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

রাবণ বধ

বন্দনা

১ গণেশ চরণ হৃদে ধরে, এসেছি মোরা আসরে হৃদয়ে এসো দেবতা।
আমারে কৃপা করি।

২ আজিকার এদিনে, ফুল দেব রাঙা পায়ে, আমার ভক্তি মালা।
হৃদি পদ্ম ফুলে গেঁথেছি মালা।

৩. আমি তো হায় পূজতে পারলাম না গো ঠাকুর
আমি তো আর চরণ পেলাম না।
মনের দুঃখ রয় মনেতে, তোমায় হারালাম হেলাতে ।।
আমার এখন তোমার সাথে দেখা হল না গো ঠাকুর।

৪. বহুদিনের আশা গো প্রভু, আশা আর পূরণ হল না।
এত দিনের আশা ভেঙো নাকো। তুমি ভেঙে দিও না।

৫ না না না ছাড়ব না, রাঙা চরণ ছাড়ব না।
মানুষ হয়ে জন্মিয়ে যদি, ভজতে না পারি আমি।

৬. তোমাকে সামনে রেখে, আমি আজ মনের সুখে,
তোমায় করিব পূজা বসাব হৃদয়-মাঝে।
এ অধম অভাগা জেনে, আমায় নিও কাছে টেনে।
আমায় অধম বলে। নেবে কোলে তুলে সারাজীবন থাকব কাছে।

৭. আয় গো মাতা বীণাপাণি, আয় গো কাছে আয়।
বাগ বাদিনী বীণাপাণি, পূজব রাঙা পা দু খানি
পায়ে দেব পুষ্পাঞ্জলি, পূজিব রাঙা পায়।
মোরা পূজিব ভোলা মহেশ্বর বসে আছেন দিগম্বর
হাজার হাজার লোকে আজি পূজে ভোলা মহেশ্বর ॥

প্রথম কলি

।। রাম ।।

১. রাবণ রাজারে জয় করে, আনিব সীতা উদ্ধারে।।
অশোক বনেতে সীতা ভাসিছে অশ্রু নীরে।

২. আমার আশায় সীতা, আছে যে বাঁচিয়া, আমার আশার পথে
সীতা উদ্ধার করে আনিব আমি। সে আছে আমার আশাতে।

৩ আমি কি তার দেখা পাব না গো মিতা, আমি কী আর সীতা পাব না।
পঞ্চবটি বনে থেকে, রাবণ আনে মোর সীতাকে
আমি তখন ঘরে ছিলাম না গো, মিতা।
৪ কেমন করে রাবণেরে, কেমন করে মারব বল না
তুমি আমায় বল না। মিতা গো ॥ তুমি আমায় বল না।
৫ না-না না, বলবে না, মিতা কথা বলবে না।
সীতা উদ্ধার করতে যদি না পারি আমি আজি।

॥ বিভীষণ ॥

৬ আগুনকে সাক্ষী রেখে, যে প্রতিজ্ঞা করেছি ডেকে
তোমায় বলি পারেন তোরে রাবণকেও বিনাশ করো।
এ জীবন যদি যায় চলে তোমাকে যাব মিতা বলে
রাবণকে মেরে আনিব সীতা উদ্ধার করে।
৭ দেখবে যদি চল হে রাম, দেখবে যদি চলো।
আছেন রাবণ রাজা লঙ্কাপুরে, আছে মন্দোদরী ওই অন্দরে।
মৃত্যুবাণ আছে তার ঘরে। সে বাণ কে আনবে বল।
॥ হনুমান ॥
তোরা কে যাবি আনিতে বাণ, বলে এসে হনুমান।
পদধূলি দাও গো প্রভু, আমার গায়ে আছে বল।

দ্বিতীয় কলি

১ হনুমান বলিছে রামের কাছে। আনিব বাণ নয়কো মিছে।
আমারে দাও গো আদেশ নিবেদন তোমার কাছে।
২. যাবার বেলায় পদধূলি নিয়া যাই, তোমার আশীর্বাদ নিয়ে।
রাবণগৃহে যাব। আনিব ঐ বাণ, কৌশলে আসিব নিয়ে।
৩ বাণ আনিতে হনুমান চলে কৌশলে
মন্দোদরীর অন্দরেতে, হনুমান যায় ছলনাতে
ব্রাহ্মণবেশে হনুমান চলেছে কৌশলে ॥
৪. মন্দোদরীর ঘরে গো হনু আজ করে কত ছলনা, ছলনা আজ কত করে গো
৫ না না না পারবে না, আমায় চিনতে পারবে না।
৬ ওই রাবণের মৃত্যুর জন্যে, সীতা উদ্ধারের জন্য
ব্রাহ্মণ সেজেছি ভাল, বামুন আমি নকল
ঢুকে যায় অন্দর মহলে জয় হোক রাবণের বলে।

'হোক রাবণের জয়' ব্রাহ্মণ কয় মোর আশিস সত্য ফলে।

।। মন্দোদরী ।।

৭ দেখবি যদি আর গো তোরা, দেখবি ছুটে আয়।
ব্রাহ্মণ এলেন মোর গৃহেতে, বলছে গণনাতে।
মৃত্যুবাণ পূজা করিলে, মহারাজের হবে জয়।
বলছে তখন মন্দোদরী, 'বল প্রভু দয়া করি
রাজার কল্যাণ হবে কিনা সেইটাই বল মহাশয় ।।'

তৃতীয় কলি

হনুমান ।। ১ ব্রাহ্মণ বলিছে রাণীর কাছে, ও বাণে ধরেছে মচে
মন্দোদরী ।। ২ রাণী বলে আনি বাণ, আমার কাছে আছে।
হনুমান ।। ৩ যাবার সময় আমি বলে দিয়ে যাই
আমার হাতে এ বাণ
'রাম রাম' বলে যেতেছি চলো, এবার মরিবে রাবণ।
৪ আমি তো আজ বাণ এনেছি গো রঘুনাথ
আজকের যুদ্ধে দশাননে বধ করুন মৃত্যুবাণে।
এই দেখ বাণ এনেছি গো রঘু...।
৫. বহুদিনের লুকোনো গো বাণ, এতদিনে এনে দিয়েছি
এত দিনে লুকনো ছিল বাণ গো, আমি আজকে এনেছি।
৬. না না না ছাড়ব না। রাবণকে আজ ছাড়ব না।
এ বাণ দিয়ে রাবণ বিনাশ করো গো তুমি।
রাম ।। ৭ রাবণকে বলছে ডেকে, মৃত্যুবাণ মোর হাতে
তোমারে বলছি রাজা, তুমি পাবে ভীষণ সাজা
ও জীবন তোমার যাবে চলে, তুমি আমার কাছে এলে
তোমায় বিনাশ করে লঙ্কাপুরের রাজা
করিব মিতা বিভীষণে।
৮. দেখবি যদি আয়রে রাবণ, দেখবি যদি আয়।
তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে,
দাঁড়াও রাজা বুকটা পেতে।
যমের বাড়ি যাবে তুমি দেরি তো আর নাই।
মরবি রে তুই লঙ্কেশ্বর, ইষ্ট নামটা জপ কর
পুত্রগণ মরেছে তোর এবার তোর নিস্তার নাই।

চতুর্থ কলি

।। বাবণ ।।

১ বাবণ বলিছে রামকে ডেকে, এসেছি তোমাব সমুখে।
ও বাম তুমি নাবায়ণ, ডাকিতেছি মনের সুখে।

২ যাবার বেলায় আমি প্রণাম করে যাই, আমারে যেন ভুলো না।
নাও বাণটা তুলে তোমার হাতে ওই বাণ মোর বুকে মারো।

৩. দুই দলে ভীষণ লড়াই হয় গো লড়াই। বাম আব রাবণেতে হয়
মৃত্যুবাণ লয়ে হাতেতে, মারে বাম রাবণ বুকেতে।
রাবণ বধ এই খানেতে হয়।

৪ 'রাবণ বধ' গানের পালা আজ সমাপন হইল
এতক্ষণে সাঙ্গ হইল গো, পালা সাঙ্গ হইল।

৫ না না না বাড়াব না, পালা সাঙ্গ আজ করি।
নিমাই দাস গান বেঁধেছে অম্বলগ্রাম বাড়ি।

৬ দলপতি বলে ডেকে, 'যেতে হবে এই রাতে'
গান গাহিতে চলো নিয়ে যাবো বোলান দলে।
সার্থক হাজরা এই দলে, দলপতি হয়ে চলে
মোদের মহুরী খাতাটা ধরি সারারাত্রি বই বলে।

৭ দাও গো তোমবা ফুলের মালা, দাও গো গলায় দাও।
নামটি তাহার সুকুমাব হচ্ছে শিবলুন গ্রামেতে বাস করিছে
সুরশিল্পী ফড়িং মাঝি সবাই শুনে নাও।
বাজনা বাজায় সনাতন নেচে নেচে আজ এখন
হাজাব হাজাব শ্রোতাগণে হরি হবি বলুন ভাই ।।

পালার পাঁচালি

ধুয়া ।। ও বাবণ, ভাবি গো মনে, কেমন করে বাঁচাবি পরাণে
গোনা দিন ফুরায়ে এল যাবি রে শমন কাল ভবনে।

১ শিযরে তোর বাম গুণধাম, মুখে লয়ে শ্রীবামের নাম
নব দূর্বাদল শ্যাম মুক্তি দেবে সেই নিদানে ।। .

২. রামেব সীতা করলি চুরি, নিয়ে এলি লঙ্কাপুরী
সীতা নয় সামান্য নারী, আটকে রাখলি অশোক বনে ।।

৩ সূর্পনখার কথা শুনে, গেলি পঞ্চবটির বনে
রামের সীতা হরে এনে, যাবিরে তুই কাল ভবনে।। .
৪. সাগর বেঁধে গাছ পাথরে, রাম এলেন লঙ্কাপুরে
বানর সৈন্য সঙ্গে করে মিতা পাঠায় বিভীষণে।।. .
৫. এক লক্ষ পুত্র মরলো, সোয়া লক্ষ নাতি গেল
এবার তোমার পালা এল, ধর গিয়ে রাম চরণে।।...
৬ দুধের ছেলে তরণী রে, যুদ্ধে পাঠাইলি তারে
রামের কাছে গেল মরে, মুক্তি পেল শেষ নিদানে।।. .
৭ রাম নয় সামান্য ব্যক্তি, ধবলে চরণ পাবে মুক্তি
আমার এখন ধরো যুক্তি, যাও আজ মুক্তি সন্ধানে।।.
৮. রাম বলে বাবণ রাজা, পাবি এবার উচিত সাজা
আজকের যুদ্ধে দেখবি মজা, যাবি যে শমন ভবনে।। .
৯. মৃত্যুবাণ আজ আমার হাতে, চেয়ে দেখ রে নয়নেতে।
মারব আমি তোর বুকেতে, আজিকাব ভীষণ রণে।।..
১০. রাম-রাবণের যুদ্ধ হল, রাবণ রাজা মবে গেল
বিভীষণে রাজ্য দিল, সীতা উদ্ধার করে আনে।।..
১১. 'রাবণ বধ' গানের পালা এইখানে আজ গেল বলা
সমাপ্ত পাঁচালির পালা, সাঙ্গ হল আজ এখানে।।...
১২. নিমাই দাস আজ রাম-চরণে, ভিক্ষা মাগে সেই নিদানে।
স্থান দিও অধম সন্তানে নিদানে শেষের দিনে।।
১৩ পাঁচালি গান আমরা করি, শিবলুনেতে মোদের বাড়ি
বাহু তুলে বলুন হরি, গতি নাই আর হরি বিনে।।...

[রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলেন। যেটি পরিশিষ্টে ছাপা আছে। প্রয়োজনে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে।] — সম্পাদক

□

গ্রামীণ লোকনাটক : বনবিবির পালা

সনৎকুমার মিত্র

১.

বনবিবি। 'বনের বিবি' অর্থাৎ অরণ্যের-জঙ্গলের যিনি 'বিবি'। এর মধ্যকার প্রথম পদটির বাঙলা অর্থ গাছ-পালা-বৃক্ষাদির ঘন-সমাবিষ্ট অঞ্চল। এবং দ্বিতীয় পদটি বাঙলা শব্দভাণ্ডারে আগন্তুক বিদেশি ফারসি শব্দ। অর্থ : মুসলমানের কুলবধূ বা কুলীন স্ত্রী, মুসলমানের স্ত্রী, মুসলমান মহিলা বা স্ত্রীলোক, মুসলমানের বিবাহিতা কন্যা। অতএব বলা যেতে পারে যে, এই 'বনবিবি' শব্দটির মধ্যে দুই ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

২.

এমন যে 'বনবিবি' তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বা বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার দক্ষিণ দিকস্থ সদর [আলিপুর]-সহ বারাসত, বসিরহাট এবং ডায়মন্ড-হারবার মহকুমার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ইত্যাদি একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকের কয়েকটি থানাঞ্চল বাদে প্রায় সর্বত্রই পূজা পেয়ে থাকেন। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থ খুলনা জেলার [অধুনা 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র] দক্ষিণাংশ বা তাকে ছাড়িয়েও এই দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। এ-বিষয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধান [field work] করে দেখা গেছে যে, খুলনা থেকে আসা এবং এখানে বসতি স্থাপন করা অধিকাংশ মানুষই জঙ্গলের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন। এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুন্দরবনের বিশেষ জেলা হিসাবে একদা খুলনা জেলাকে তৈরি করা হয়েছিল, —সঙ্গে ছিল গোটা ২৪ পরগণার একটি, যশোহরের দুটি মহকুমা। অতএব এ অঞ্চলের মানুষ জনের সঙ্গে মা বনবিবি বা বিবিমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। সুতরাং এখান থেকেই বনবিবির মাহাত্ম্য এবং তৎ-বিষয়ক যা কিছুর সূচনা হওয়া সম্ভব।

৩.

'বনবিবি', —এই লোকদেবীর আকৃতি উগ্র বা রুক্ষ নয়। স্বভাবে ইনি প্রতিহিংসা-পরায়ণা বা মনসার মতো ক্রূর [Malignant type of Deity] নন। ভক্তদের সঙ্গে এঁর প্রীতি ও ভালবাসার এবং অভয়দাত্রীর সম্পর্ক। ইনি দয়াবতী ও ভক্তবৎসলা। সেই কারণেই বোধহয় মূর্তিশিল্পীরা যখন এঁর

মূর্তিকে কল্পনা করেছেন, তখন এঁকে সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী রূপেই নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এঁর মূর্তির রূপভেদ রয়েছে। যেমন · ক কোথাও অবাঙালি মুসলমান নারীর পোষাক পরিহিতা মূর্তি। অর্থাৎ বুনো ফুল লতাপাতা আঁকা জরির টুপি মাথায়। চুল বিনুনি করে ঝোলানো, ওপর কপালে টিকলি ঝুলছে। গলায় সোনার বা পুঁতির বা বনফুলের মালা। নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা বা পায়জামা এবং উপরাঙ্গে শালোয়ার। দু কাঁধে ওপর থেকে মলমলের ওড়না মালার মতো ঝুলে পড়ে বক্ষোদেশ আবৃত করে রেখেছে। হাতে সাধারণত কোন প্রহরণ দেখা যায় না। তার পরিবর্তে এক হাতে একটি বালককে কোলে করে নিয়ে আছেন—অন্য হাতে বরাভয় বা একটি ফুল। কোথাও কোথাও বা 'আসাবাড়ি' বা ঝাণ্ডা দেখা যায়। আবার কোথাও বা কোলে বালকের পরিবর্তে দেবীর এক হাতে বরাভয় এবং অন্য হাতে ফুলও লক্ষ্য করা যায়। এঁকে কোথাও বাঘ অথবা মুরগির ওপর আসীন দেখা যায়। কোথাও বা এঁর কোন বাহনই নেই, কাঠামোটির ওপর এমনিই দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় যে, দেবী বাঘের ওপর বসে আছেন, কোলে একটি বালক এবং তার ডান পাশে যোদ্ধা বেশে এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন- হাতে তার 'খাগড়া' বা বন্দুক। ইনি বিবির ভাই শা-জঙ্গলী। খ. হিন্দু ধারণায় তৈরি বনবিবির মূর্তি ঠিক শীতলার মতো—কেবল গাধার বদলে বাঘ বাহন, বাঁ-কোলে একটি বালক, ডান হাতে ফুল বা বরাভয়। পেছনের চালচিত্রের বন-জঙ্গল-লতাপাতার ছবি। এছাড়াও কোনো কোনো মূর্তিতে কোলে বালক অনুপস্থিত অর্থাৎ কোল শূন্য।

৩.১.

বিবিমার এই হিন্দু বা মুসলমান মূর্তি-পূজার অঞ্চল কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান অধিবাসীর ন্যূনাধিক্য-নির্ভর নয়। বনবিবি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই উপাস্য দেবী। সুন্দরবনের অরণ্যে উভয়কেই জীবিকার প্রয়োজনে প্রবেশ করতে হয়—এবং সুন্দরবনের 'আতঙ্ক' উভয়কেই সমানভাবে পীড়িত করে। তাই ভক্তরা যে যেখানে যেমনভাবে পেরেছেন তেমনিভাবে আপন হৃদয়ের ভক্তি-বিশ্বাস দিয়ে এই দেবীর মূর্তি নির্মাণ করেছেন। এবং সুন্দরবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সেই দেবী-মূর্তির পায়ে আপন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ফলে, এখানে মুসলমান নারীর অনুকরণে মূর্তি নির্মিত হয়েছে—অতএব এখানে মুসলমানের

বাসাধিক্য; আবার ওখানে হিন্দুদেবীর মতো করে বনবিবির মূর্তি তৈরি হয়েছে—অতএব ওখানে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় বাস করেন—এমন মন্তব্য করা সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত হবে বলে মনে করি না।

৩.২.

বনবিবির মূর্তিকল্পনা রীতিমতো অর্বাচীন। আদিতে এই লোকদেবী অন্যান্য লোকদেবীর মতোই ছিল মূর্তিহীন। এখনো সুন্দরবনের বহু বন-বাদাড় অঞ্চল দেখা যায় যেখানটা কেবলই মা-বনবিবির 'থান' নামে পরিচিত। সেখানে কোনো মূর্তি নেই—মন্দির নেই—এমনকি সামান্য একটা বেদীও নেই। অর্থাৎ নিরবয়ব হিংস্র গহন-গভীর অরণ্য বা দ্বীপই মা-বনবিবির 'থান' বা জঙ্গল নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন সুন্দরবনের অতি-পুরাতন ভয়ঙ্করতা আদিতে কোনো মূর্তি লাভ করেনি। আজ-পর্যন্ত তাঁর প্রচলিত মূল পূজা-পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমাদের এই বক্তব্য সত্য বলে প্রতিপাদিত হবে। সুন্দরবনের আদি প্রবেশকদের প্রথম ও প্রধান যে ভয়ের মুখে দাঁড়াতে হয়েছিল—তা হচ্ছে বাঘের ভয়। এই ভয়ানক বাঘকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তাদের সেদিন কিছু খাদ্য 'বলি' রূপে এগিয়ে দিতে হয়েছে। সেই খাদ্য প্রথম স্তরে ছিল অবশ্যই মানুষ [স্মরণীয় দুখের কাহিনী], পরবর্তীকালে বা অভাবে মনুষ্যেতর কোনো জীব। সুন্দরবনে বাঘের মুখে পরিত্যক্ত দুখের দুঃখ নিয়ে রচিত কাব্য অর্বাচীন হলেও এর মৌল মানসিকতার প্রাচীনতা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় স্তরে মুসলমান আধিপত্যের ফলে বনদেবী 'বনবিবি'তে রূপান্তরের অনুষঙ্গে এসেছে মুরগী 'বলি' বা উৎসর্গ।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আদি নিরাকার আরণ্যক [sylvan] ভয় ধীরে ধীরে এক লৌকিক দেবী-ভাবনার সৃষ্টি করেছে, যার ওপর প্রথমে হিন্দু ও পরে ঐসলামিক সংস্কৃতি সমন্বিত হয়ে বনবিবির আকারকে গঠিত করেছে। এ-প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে এই যে, মূর্তিপূজা বা পীর বা গোর-পূজা শরিয়তী ইসলাম বিরোধী কাজ। তবুও সাধারণ মানুষ, দীন-দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ, ক্ষুধার জ্বালায়, জীবনধারণের প্রশ্নে ধর্মের নিষেধ-কানুন-বিধি-বিধানের দিকে না তাকিয়ে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক যৌথ জীবন-চেতনার অংশীদার হয়ে, অধিকাংশের গৃহীত দৈবী আশ্রয়ের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব কতখানি রইল বা মুসলমানের শরিয়ত কতখানি নষ্ট হল, তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

এবং এইখানেই লৌকিক ধর্মের বিশেষত্ব, বাঙলার লোকাচারের সর্বজনীনতা বা অসাম্প্রদায়িক চরিত্র-পরিচয়ের শক্তি নিহিত।

৪.

বনবিবির পূজার কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা বার-তিথি নেই। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের জন্য প্রবেশের আগে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে কেউ কেউ পূজা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। আবার কেউ কেউ বা বনের কাজ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে সেরে এসে বেশ ঘটা করে পূজা দিয়ে থাকেন—**বনবিবি যাত্রা পালার** ব্যবস্থা করেন। তবে চৈত্র-বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, পৌষ সংক্রান্তি অথবা মাঘ মাসে মা বনবিবির পূজার সমধিক প্রচলন দেখা যায়। এই দেবীর পূজার যখন মাসের কোনো ঠিক নেই, তখন নির্দিষ্ট তিথিও অনুসরণ করে বনবিবির পূজা হয় না। দিনে-রাতে—যখন সুযোগ বা অবসর হয়, তখনই এই দেবীর পূজা করা যেতে পারে। অনেকে আবার বনবিবির রাজ্যে প্রবেশের আগে মুরগি উৎসর্গ করে থাকেন। অথবা মনে মনে মানসিক করেন যাতে নিরাপদে কার্য উদ্ধার হয়। এবং বনের কাজ শেষ করে ফিরে এসে মানসিক অনুসারে 'থানে' একক বা সম্মিলিতভাবে বারোয়ারীর মতো করে পূজা দিয়ে মানস-প্রতিজ্ঞা থেকে উদ্ধার-লাভ করেন।

৫.

এতক্ষণ আমরা মা বনবিবির পরিচয়, তাঁর প্রচার-অঞ্চল, পূজা-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এই দেবীর পূজার অংশীদার হচ্ছেন এ-অঞ্চলের দু-শ্রেণীর মানুষ। প্রথম, মুসলিম এবং দ্বিতীয়, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁরা সুন্দরবনে প্রবেশ করেন মধু, গোলপাতা ও সুন্দরী সহ বিভিন্ন প্রকার কাঠ সংগ্রহ করতে এবং অসংখ্য খাল-নালায় মাছ ধরতে। এঁরা সাধারণ মউলে [যাঁরা প্রধানত মধু সংগ্রহ করেন], বাউলে বা বাওয়ালি ['যাঁরা গোলপাতা ও কাঠের ব্যবসায়ী'—খুলনা—দ্র 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'—বাঙলাদেশ। 'বাওয়ালী যিনি বাঘকে বশ করার মন্ত্র জানেন,'—'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'], মালো ইত্যাদি নামে পরিচিত। এইসব বৃত্তিজীবী মানুষদের মধ্যে মুসলিম ভাইরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন বাগ্‌দী, কাওরা, পোদ ইত্যাদি সমাজের নিচের থাকের মানুষজন। ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান [বর্তমান 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র] থেকে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা দলে দলে চলে এসে এখানে বাসা বেঁধে এবং স্থানীয় বাউলে-মউলে ও মালোদের সঙ্গে সুন্দরবনের

গভীরে জীবিকার সন্ধানে প্রবেশ করে থাকেন। এঁরা সবাই অরণ্যের বিভীষিকা থেকে আত্মরক্ষার মানসে মা-বনবিবির পূজা ও যাত্রাপালার আয়োজন করেন। পালা গাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে থেকেই অভিনেতা-অভিনেত্রী [পুরুষেই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেন] সংগ্রহ করে থাকেন। গান ও পালাশিক্ষকের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে থাকেন। প্রয়োজনে বাইরে থেকেও শিক্ষক ভাড়া করে আনা হয়। বর্তমানে কোনো কোনো গ্রামে স্থায়ী দল তৈরি হয়েছে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য গ্রামেও এঁরা পালা গেয়ে আসেন।

৫.১

বনবিবির পালার বিষয়বস্তু 'বোনবিবি জহুরানামা' নামক মুসলমানী কিস্‌সা-কাহিনী থেকে গৃহীত। দরিদ্র বিধবার দুখে নামক এক সন্তানকে মা বনবিবি, তাঁর ভাই শা-জঙ্গলীর সাহায্যে ভীষণ ও নরখাদক দক্ষিণ রায়ের গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনলেন, এবং শেষে তিনি ও দক্ষিণ রায় আঠারো ভাঁটি-অঞ্চল ভাগ করে শাসন করতে থাকলেন, তাই-ই এই পালায় যাত্রার আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। পূর্বে অতিপরিচিত এই বনবিবির কাহিনীর মধ্যে মধ্যে গান জুড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে [Extempore] অভিনয় করা হত। গানগুলি আগে থেকে মাস্টার দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়া হত। পরবর্তীকালে বা অধুনা একেবারে যাত্রাপালার মতো করে অঙ্ক-দৃশ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই পালার কোনো ছাপা বই পাওয়া যায়নি [জানি না কোনো সময় কোনো ছাপা বই প্রকাশিত হয়েছিল কিনা?]। তবে আমি ১৯৭১ সালে ডায়মন্ডহারবার থানার বারদ্রোণ গ্রাম থেকে বলগুরু সরকার [৪৫] মহাশয়ের কাছে রাখা, হাতে লেখা ৪ অঙ্ক ও মোট ১৬ দৃশ্য সম্বলিত একটি পালাগানের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করি। এখানে তার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি উদ্ধৃত করা হল।

বনবিবির পালা

এখানে সখিদের নৃত্য হবে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ধনার প্রবেশ

ধনা— দিনের পর দিন চলে যায়, সুখের দিন আসে, এসে আবার ফিরে যায় কেন, মন চায় আবার চায় না কেন, বলি বলি মনে হয়—

তাও বা বলি না কেন, ভাবতে ভাবতে দিন সব ফুরিয়ে যায়, যাই হোক ভাই মশাইকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করি। আমার এ কাজে তার মন আছে কিনা। আচ্ছা চম্পাকে দিয়ে ডাকতে পাঠাই—বলি চম্পা একবার এদিকে এস তো মা।

চম্পা— বাপজান-বাপজান, তুমি আমাকে কিসের জন্য ডাকলে বাপজান।

ধনা— তুমি কি করছিলে মা।

চম্পা— কেন বাপজান, আমি তো দালানে বসে খেলা করছিলাম।

ধনা— আচ্ছা তোমার চাচাজান কোথায় বলতে পার মা?

চম্পা— চাচা তো দালানে বসে আছে বাপজান।

ধনা— তোমার চাচাকে একবার ডেকে দাও তো মা।

চম্পা— আমি এখনই যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

ধনা— মনা কি আমার কথায় রাজি হবে? ভাই হয়ে ভাইয়ের কাজে অমত করবে? হয়তো রাজি না হতেও পারে। ঐ তো মনা আসছে।

মনাইয়ের প্রবেশ

মনাই— দাদা আমায় কিসের জন্য ডেকেছেন।

ধনা— ভাই মনা আমার মনে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে আমি একবার বনে মহল করতে যাব। আমি শুনেছি চৈত্র মাসে বনে প্রচুর মম-মধু পাওয়া যায়, অনেক দেশ-দেশান্তর হতে লোকজন মম-মধু সংগ্রহ করতে আসে, আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে ভাই আমি বনে মহল করতে যাব।

মনাই—বেশ দাদা, আমাদের কিসের অভাব? কিসের দুঃখে বনে মহল করতে যাব। আমি শুনেছি, সেই বনে বড় বাঘ-ভাল্লুকের ভয় আছে। যদি তুমি বাঘের পেটে যাও, তোমার দুঃখে আমরা মারা যাব। আমাদের এতো টাকা কড়ি, এতো ধন সম্পত্তি,—আমরা কিসের জন্য বনে মহল করতে যাব? তোমার রোজগার করতে হবে না। তোমার যত টাকাকড়ির প্রয়োজন আমি সবই তোমায় দেব। আমাদের বনে মহল করতে যাবার প্রয়োজন নাই দাদা।

ধনা— ভাই তুমি আমাদের ধন-সম্পত্তির কথা বলছো? এ আর ফুরাতে কতদিন, বসে খেলে রাজার রাজ ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। আমাদের সামান্য ধন সম্পত্তির কথা বলছো ও ফুরাতে কতদিন।

বিবেকের প্রবেশ

গীত

বিবেক—ও শুনবে না রে কারো কথা।
ওর মন হয়েছে যাবে বলে,
ঘুরে গেছে ওর মাথা ॥
ভাই হয়ে ভায়ের কাজে
দিচ্ছ কেন বাধা
তোরা দু-ভাই মিলে যাবি বলে।
মন তোদের নিয়ে যাচ্ছে সেথা।

[*প্রস্থান*]

মনাই— আমার আর কিছু বলবার নেই দাদা।

ধনা—হ্যাঁ, ভুণ্ডুলে এদিকে আসছে না।

খোঁড়া পায়ে ভুণ্ডুলের প্রবেশ

ভুণ্ডুলে — আমাকে কিসের জন্য ডেকেছো দাদাবাবু?

মনাই— দাদা ভুণ্ডুলের পা-খানা নাকি আর সারবে না?

ধনা— হাঁরে ভুণ্ডুলে তোর পায়ে সেই দাওয়াই খানা লাগাস।

ভুণ্ডুলে— না দাদাবাবু সে দাওয়াই খানা লাগানো হয় নি।

ধনা— কেন লাগাস নি শুনি?

ভুণ্ডুলে— এই ধরুন না কেন আমার বাপ-দাদা কখনও কেউ কানা খোঁড়া ছিল না। আমার ভাগ্যক্রমে সেই পা খানা খোঁড়া হয়ে গেছে। তাই যদি ওষুধ দিয়ে সারাই, তাহলে পরকালে জবাব দেব কি।

ধনা— ঠিক বলেছিস, ও সারালে তোর পাপ হবে। ও পা ঐ রকমই থাক।

ভুণ্ডুলে— তা থাকল কেন দাদাবাবু—আমি তো বেশ আছি।

ধনা— আচ্ছা থাক্, তুই এখন সেই যদু মিস্ত্রিকে ডেকে আনতো।

ভুণ্ডুলে— সে আমি পারবো না দাদাবাবু।

ধনা— কেন পারবি না?

ভুণ্ডুলে— বেশি পদ হাটিতে গেলে খোঁড়া পা খানি বড় আলিস্যি রাখে।

ধনা— তাহলে কে যাবে?

ভুণ্ডুলে— তা আমি কেমন করে বলব বলুন?

ধনা— তাহলে তুই কি বসে বসে খাবি?

ভুগুলে— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বসে বসে খাই বইকি। এই গ্রামের লোকজন সবাই জানে আমি শুধু এই পা খানা নিয়ে লড়াই করতে পারি না, আর সবকিছু পারি। আর ভুগুলে নাকি শুধু বসে বসে খায়। দেখেছেন বাবুরা আমাদের বাবুর কি রকম কথা।

ধনা— এই তুই যাবি নাকি বল।

ভুগুলে— আমি যেতে পারব না, তাতে ভাল বলুন আর মন্দ বলুন ভাই, আমি যেতে পারব না।

ধনা— কি আমার প্রথম কাজে বাধা—যা তুই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

[ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল]

গীত কণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ

বিবেক— ওরে ও ধনীর ভগবান, শুধু ভগবান তোদের তরে
আমার ধড়ে না থাক প্রাণ, ভাত তো পেটে জুটল নারে।।
কেন খেতে যাই দ্বারে দ্বারে, ধনীরা দেয় ফেলে
আমার কথায় না দেয় কান, খায় না যাহা পশু-পাখি।
আমার জন, তা জুটবে নাকি আমি বসে ভাবি দিবানিশি।
ক্ষুধার জ্বালায় যায় যে প্রাণ।।

[*প্রস্থান*]

ধনা— এই কোথায় যাস। এই শোন এদিকে আয়।

ভুগুলে— বসে থাকলে তো আর চলবে না, দেখি আর কারো বাড়ি ভর্তি হই গে।

ধনা— তোর কাছে যে টাকা পাবো তার উপায় কি।

ভুগুলে— সে আমি দিতে পারবো না।

ধনা— তবে কে দেবে?

ভুগুলে— যদি আমার কেউ থাকে তাহলে পথেঘাটে ধরে আদায় করে নিও।

ধনা— এই এদিকে আয়, আরে এই শোন।

ভুগুলে— ঐ তো কতো লোকজন বসে আছে ওদের বলুন না।

[*প্রস্থান*]

ধনা— মনা কি ভাবছো ভাই?

মনাই— না দাদা আমি কিছু ভাবিনি তবে আমাদের প্রথম কাজেই বাধা পড়ে গেল দাদা।

ধনা। ওর নাম কি বাধা বলে ভাই।

মনাই— ওর নাম তো বাধা বলে দাদা। এই ধরুন না কেন ঐ ভুণ্ডুলে কোন দিন কোন কাজে না বলে না, আর আজ একজন সামান্য লোককে ডাকতে বলতে সে কিনা বলে পারবো না। একে কি হলে বাধা বলে না দাদা।

ধনা— দেখ ভাই এসব কাজে বাজে কথা ধরতে গেলে কোন কাজ চলে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমি একাই সব ঠিক করে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান]

এই পালার অধিকারী হলেন স্বয়ং বলগুরু মশাই। মনে হয় তিনি নিজেই এর সঙ্গীত শিক্ষকও ছিলেন।

৫.২

বনবিবির পালা সাধারণ যাত্রাপালার মতো খোলা, গোলাকার মঞ্চে অভিনীত হয়। দর্শকেরা চারদিকে ঘিরে বসে। একপাশে বসেন বাদ্যকরেরা। তাঁদের মধ্যে মাস্টার সাধারণত হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন, — সঙ্গে থাকে মৃদঙ্গ বা ডুগিতবলা, করতাল। ফ্লুট বা কর্নেটও কোনো কোনো দলে দেখা যায়। অভিনেতাদের পোশাক অতিসাধারণ। তবে আজকাল কোলকাতা থেকে যাত্রার পোশাক ভাড়া করে আনতে দেখা যাচ্ছে। এবং যিনি দক্ষিণ রায়ের অভিনয় করেন তিনি অনেক সময় একটি বাঘের মুখোশ পরেন। নাট্য-প্রয়োগ বিষয়ে বা পরিচালনায় খুব উচ্চ মানের কোনো পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায় না। অভিনয়ও সাধারণ মানের। তবে এই অভিনয়কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মানত পূরণের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমবেতভাবে এই যে যাত্রাভিনয় এ যেন বনের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার একটি পদ্ধতি। এককথায় যাঁরা একে যাদুক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চাইবেন, তাঁদের অনভিজ্ঞতা এবং অতিসরলীকরণ তথ্যবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। এর পরেও কেউ কেউ একে আচারমূলক [ritualistic] অনুষ্ঠান বলতে চাইবেন। কিন্তু এই পালাভিনয় আচারমূলক কোনো কৃত্য নয়। বরঞ্চ একে প্রথাগত অনুষ্ঠান [functional] বলাই

শ্রেয়। কারণ এই কৃত্য আচারমূলক হলে প্রতিটি মহাল শেষেই গ্রামে ফিরে এসে মৌলে-বাউলেদের বনবিবির পালা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু তা হয় না। বহু ক্ষেত্রেই দু-চার বছর মহাল করবার পর আর্থিক সঙ্গতি হলে তবেই বনবিবির পালা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় [আবশ্যিক নয় কিন্তু]। অনেক সময় পালাভিনয়ের পরিবর্তে বনবিবির গান বা রায়মঙ্গল পাঁচালি গানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অতএব বনবিবির পালাভিনয়কে আনুষ্ঠানিক [functional] হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও আচারমূলক [ritualistic] অনুষ্ঠান হিসাবে কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না।



ক্রোড়পত্র

[ভেজিটেবল অয়েল থেকে তৈরি যে কোন ঘি ও যেমন 'ডালডা'—তা সে 'ইঞ্জিন' 'প্রতাপ' 'বেলুন' বা 'লসুই' যাই হোক না কেন, তেমনি 'আলকাপ' ও 'গম্ভীরা' মানেই যথাক্রমে ঝাকস্ ও 'মটরবাবু'; -- অর্থাৎ 'আলকাপ' ও 'ঝাঁকস্' এবং 'গম্ভীরা' ও মটরবাবু সমার্থক হয়ে আছেন। এখানে আমরা ঐ দুই প্রবাদপ্রতিম গ্রামীণ নাট্যব্যক্তিত্বের প্রাসঙ্গিক জীবন-তথ্য সংগ্রহ করে দিলাম। আশা এই তথ্য আমাদের গ্রামীণ নাটক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দেবে। সম্পাদক]

১

ধনঞ্জয় মণ্ডল [ঝাকস্] :

আলকাপওয়ালা 'ঝাকস্' মুর্শিদাবাদের একটি সুপরিচিত নাম। যদিও পোশাকি নাম ধনঞ্জয় মণ্ডল তাহলেও অনুরাগী শ্রোতৃমণ্ডলের অন্তরঙ্গ-কণ্ঠে ঝাকস্ নামটিই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। আজ বাঙলা ছাড়িয়ে বিহারেও ঝাকসুর আলকাপ শুনতে ভিড় জমে যায়।

বিশেষ প্রচারের অভাবে, নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এবং শিষ্য-প্রশিষ্যের দীর্ঘ প্রসারিত ধারার তেমন আনুকূল্য না থাকায় কবিগানের মতো আলকাপ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। তাছাড়া কবিগান যতটা শহুরে ও মার্জিত হয়ে উঠেছে আলকাপ ততটা নয়। তাই পরিশীলিত নাগরিক পরিবেশে আলকাপ গানের মজলিস কবিগানের মতো পরিবেশিত হয় না।

ঝাকসুর মুখেই আমরা আলকাপ গানের আদিকবির নাম শুনেছি। প্রায় একশ বছর আগে মালদহের মনাকষার ভবতারণ সরকার আলকাপের সূচনা করেন। তাঁরই শিষ্য ছিলেন মনাকষার বোনাকানা। এই বোনাকানার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন জঙ্গীপুরের সুতী থানার হাসিপুরের বসন্ত সরকার। বসন্ত সরকার সুবিখ্যাত কবিয়াল শেখ গোমানির সঙ্গে বহু কবির লড়াইয়ে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই বসন্ত সরকারের শিষ্য হচ্ছেন জঙ্গীপুরের ধনপত নগরের ধনঞ্জয় মণ্ডল ওরফে ঝাকসু। ঝাকসুর নিজস্ব শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁরা হলেন : গোপাল দাস, সুবলচন্দ্র দাস, সোলেমান মিঞা, সুধীরকুমার দাস, আব্দুল রেজ্জাক প্রমুখ।

১৩১৬ সালের ১৭ই আশ্বিন ধনঞ্জয় মণ্ডলের জন্ম। পিতা বাবুরাম মণ্ডল কৃষিকাজ করে সংসার নির্বাহ করতেন। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তান ঝাকসুকে তার বাবা ন-বৎসর বয়সে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু পড়াশুনোয় মোটে মন ছিল না ঝাকসুর, তার দুরন্তপনা আর প্রাণশক্তির অস্থির চাঞ্চল্যে সকলে তটস্থ ছিল। অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত সহপাঠীরা এই শিশু নায়কের অনুরক্ত হয়ে পড়ল। গুরুমশাইয়ের অনুপস্থিতিতে ক্লাশের ছেলেদের বাইরে নিয়ে গিয়ে সে যাত্রা করত, গান করত। ভবিষ্যতের আলকাপওয়ালা ঝাকসুর শিল্পচর্চার প্রথম অঙ্কুর এখানে। নিজের ভবিষ্যৎকে সে নিজেই উপলব্ধি করেছিল। নিজের আলো নিজেই জ্বেলেছিল। পনের বছর বয়সে ঝাকসুর বাবা মারা যান, দু-বৎসর পর লেখাপড়াও শেষ হল। ক্ষুদ্র পরিবারটির সংকটকালে দায়িত্বের প্রধান ভূমিকা নাবালক ঝাপসুকেই নিতে হল।

কিছুদিন পরে তিনি গায়ক কবি বসন্তলাল সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সর্বতোভাবে আন্তরিক সাহায্য পেয়েছিলেন ঝাকসু তাঁর গুরুর কাছ থেকে। পাঁচ বৎসর নানা স্থানে গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান তিনি। তারপর আকস্মিকভাবে বসন্তলালের মৃত্যু ঘটে। গুরুর তিরোধানে তাঁর অনুরক্ত শিষ্যটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, নিজেকে কেমন শূন্য আর আশ্রয়হীন মনে হয়। কিন্তু শিল্পীকে দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। ঝাকসু বেদনা অতিক্রম করে নিজেই ওস্তাদের ভূমিকা গ্রহণ করে আলকাপ গানের দল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে বাঙলাদেশের সর্বত্র এবং বিহার অঞ্চলেও আলকাপ গান করে বেড়িয়েছেন।

কবিগানের মতো আলকাপও বন্দনা দিয়ে শুরু। সাধারণত শিব কিংবা সরস্বতীর বন্দনা গাওয়া হয়। এখানেও অনেক ক্ষেত্রে দুই দলের পাল্লা হয়। বিজয়ী ও পরাজিতের জন্য আগে থেকে পুরস্কার উপস্থিত রাখা হয়। জিতলে কাপড় বা মিষ্টির হাঁড়ি, হারলে একছড়া কাঁচাকলা। আলকাপ নৃত্য এবং লৌকিক ভঙ্গিমা প্রধান। এর সঙ্গে গান যুক্ত রয়েছে। কথা এবং দোহারও আলকাপের অন্তর্ভুক্ত। করতাল, তবলা এবং হারমোনিয়াম আলকাপের বাদ্যযন্ত্র। মূল ওস্তাদকে 'কেপ্যা' বলা হয়। এই দলে বিভিন্ন নারী ভূমিকা যে গ্রহণ করে তাকে 'ছোকরা' বলে। ছোকরা যুগপৎ একই পালায় মা, বোন, বউ ইত্যাদির ভূমিকায় অংশ নেয়। পথে-ঘাটে আলকাপ দলের ছোকরাকে দেখলে চিনতে কষ্ট হয় না। অল্প বয়সের

ছেলে, মাথায় লম্বা চুল, নারী সুলভ ভাব, কখনো চোখ কাজল। একদলের ছোকরাকে অন্যদলে টেনে নেবার জন্য ছোকরা ভাঙাভাঙি হয়, উত্তেজনা দেখা যায়। আলকাপ গানের মধ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছড়া কাটা হয়; আলকাপের পরিভাষায় তাকে 'বোলকাটা' বলে। আধুনিক আলকাপ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। হিন্দী চলচ্চিত্রের গান এবং চটুলতা ক্রমশ আলকাপের মধ্যে প্রবেশ করছে। অবশ্য এই বিশিষ্ট ধরণের গানগুলি বহুপূর্ব থেকেই শ্লীলতার সাধারণ সীমা লঙ্ঘন করতে সঙ্কুচিত ছিল না। তাই গানগুলির মধ্যে অনেক সময় পল্লীর অমার্জিত অকপট অনুভূতির দুঃসাহসিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলকাপ গানে খুশি হয়ে অনুরাগী শ্রোতারা প্রায়ই বকশিস্ দিয়ে থাকে, যাকে 'ফেরি দেওয়া' বলে, পদক দেওয়ার রীতিও রয়েছে। আলকাপওয়ালা ঝাকস্ প্রায় একশত পঁচিশটি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভের সম্মান অর্জন করেছেন।

সাতাশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক রচিত হয়। জমিদার ও দরিদ্র চাষী এই দুই অসম পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের এক বিস্ময়কর কাহিনী এই কাব্যে প্রকাশিত ছিল। বইখানির নাম 'চাষার মেয়ে'। এছাড়া কর্মের পরিণাম, কলির মেয়ে, বিধবা মেয়ে, ভাই ভাই, নারীহত্যা ইত্যাদি নামে প্রায় কুড়ি বাইশখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন।

আলকাপ মুর্শিদাবাদের লোকায়ত শিল্প। এই শিল্পধারাটি সম্পর্কে তেমন কোন অনুসন্ধানী আলোচনা হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে বাঙলার লোকায়ত শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে যদি সামগ্রিক গবেষণা হয় তাহলে আলকাপওয়ালা ঝাকসুর নাম নিঃসন্দেহে উচ্চারিত হবে।

বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থ

বৈশাখ ১৩৭০, এপ্রিল ১৯৬৩।

১.১

আলকাপ ও ঝাঁকসু :

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতির—'স্রষ্টা ও সৃষ্টির'—প্রেক্ষাপটে জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ধনপতনগর গ্রামের ধনঞ্জয় মণ্ডল ওরফে আলকাপ্ সম্রাট ঝাঁকস্ একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। উনিশশো পাঁচ-ছয়-সাত—মোট তিন দশক ধরে ঝাঁকসু গ্রাম বাঙলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে আলকাপ

গানের মাধ্যমে মালদহ-মুর্শিদাবাদ-নদীয়া বর্ধমান বীরভূম তথা বিহারের [illegible] অঞ্চলে লোকগাথার যে অভূতপূর্ব শিহরণ তথা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। আলকাপের সৃষ্টি সুদূর অতীতে। সহজ সরল গ্রাম্য রঙ্গরস সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য গ্রাম্য ভাঁড়ামি, শিবের পোষাক পরিচ্ছদ, সঙ্গীসাথীর মধ্যে প্রকট। শোনা যায় আলকাপকে সর্বপ্রথম আধুনিক ধাঁচে প্রচলন করেন অধুনা রাজসাহীর মনাকষা গ্রামের বোনাকানা।

আলকাপের ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি যুগ—আদি, মধ্য ও আধুনিক ভাগ করে নেওয়া যায়। আদিযুগে আলকাপ ছিল সম্পূর্ণ বৈঠকী গান। গৃহস্থ মোড়লের বড় বৈঠকখানায় গ্রামের মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য। মনে রাখতে হবে উনিশশো তিরিশ ও চল্লিশের দশকে গ্রাম বাঙলায় সিনেমার বহুল প্রচলন হয় নি। বর্তমানের কলকাতার যাত্রা-থিয়েটারও গ্রাম-গঞ্জের অলিতে গলিতে তখন ভীড় করেনি। কিন্তু গ্রাম্য জীবন তো আর সেজন্য আনন্দ-বিনোদন থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলকাপের সৃষ্টি ও প্রসার।

আমার বাবার বয়েস পঁচাত্তর বছর। তিনি তাঁর সতের বছরের কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে ধনঞ্জয়ের বৈঠকি আলকাপের দলে ছোকরা নেচেছেন। সেটা ১৯১১ সালের কথা। তখন অবশ্য ধনঞ্জয়ের গান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তারপরে ধনঞ্জয়ের সখের বৈঠকি গান ক্রমশ ব্যবসায়-কেন্দ্রিক মোড় নেয়। এই সময় তাঁর দলের 'প্রথম কদম ফুল' হয়ে আসে ধনপতনগরের কাঞ্চনিবালা মণ্ডল। যার সম্পর্কে 'দেশ' সাপ্তাহিক [২২শে জুন, ১৯৮৫ সংখ্যা] দেবাশিস দাসগুপ্তের লেখায় আলোকপাত হয়। ধনঞ্জয় কাঞ্চনিকে দুই বিঘা জমি কিনে দেন। এই সময় গ্রাম্য রেষারেষিকে কেন্দ্র করে ধনপতনগরে দুই মোড়লের ঝগড়া বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠে। ব্রজলালের সদ্য লাগানো বাগানের লিচু-আম-কাঁঠালের গাছ নষ্ট করা হয়। চাঁইদের 'জাতিসভা' [Caste council] বসে। বিচারে আলকাপের দলকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। গানের দলের সব শিল্পীর চুল-দাড়ি কেটে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ায় শাস্তি নেমে আসে। এ শাস্তি হতে স্বয়ং ঝাঁকসুও বাদ পড়েনি। এই শাস্তিতে ঝাঁকসুর প্রতিভা দমে গেল না—বরং দ্বিগুণ উদ্যমে আরও বেশি হয়ে প্রকাশ পেল। আমার পিসেমশায় পাঁচু মণ্ডল 'জাতিসভা'র রায় মেনে

নিতে পারলেন না। তাই তাকে সাত বছর ধরে ধনপতনগরে 'একঘরে' হয়ে বাস করতে হয়। উনিশশো চল্লিশ দশকে ধনপতনগরের ইতিবৃত্তে এ-এক চাঞ্চল্যকর পরিবেশ। এই পরিবেশ হতে ঝাঁকসুর শিল্পীচেতনা রস আহরণ করে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে—আলকাপের দল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময়ে ধনঞ্জয়ের দলে এসে ভেড়েন বর্তমানের প্রখ্যাত সাহিত্যিক--সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। একদিন দুইদিন নয়—উনিশশো পঞ্চাশের দশকের সাত-সাতটা বছর তিনি ঝাঁকসুর দলে কাটিয়েছেন। উল্কার মত গ্রামবাঙলার প্রান্তর হতে প্রান্তরে লোকসংস্কৃতির মঞ্চে আলকাপের মাধ্যমে লোকগাথার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। সিরাজ সাহেবের প্রখ্যাত উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ' যাকে ঝাঁকসুর জীবনের দলিল বলা যেতে পারে।

ঝাঁকসু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিবোধ জাগাতে ছড়া বাঁধলেন---'হিন্দুমুসলমান, একই মায়ের দুই সন্তান'। আলকাপ সমগ্র মুর্শিদাবাদ তথা মালদহের গ্রাম্য মানুষের আনন্দ বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঝাঁকসু পারিবারিক সম্পর্কে হন আমার পিসেমশায়। তাঁর জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তাছাড়া আলকাপের দলটা ছিল একটা মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র।

জঙ্গীপুরের রবিদাস, মিঠিপুরের পোকড়া [পাখি শিকারী যাযাবর গোষ্ঠী] লালখাঁর খিয়াড়ের আব্দাল-মুসলমান, সাগরদিঘীর বাগদি কুনাই সম্প্রদায়, ধনপতনগরের চাঁই, সোনাটিকুরীর ঘোষ ইত্যাদি সমাজের মানুষদের নিয়ে তাঁর দল। ঝাঁকসু নিজে চাঁই সমাজের মানুষ। সামাজিক স্তরে চাঁইরা ভীষণ গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু ঝাঁকসুর গানের দলে এগুলি অবান্তর। দলের সবাই রাঁধুনি। সবাই পরিবেশক। জিয়াগঞ্জের গণেশপুরে চাঁইদের জাতিসভা [Caste Council] বসেছে। এর উদ্দেশ্য জাতিগত সংস্কার ও শুচিতারক্ষার প্রশ্নে সামাজিক বিচার। এর নাম 'বাইশী'। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁকসু সেই 'বাইশী'তে উপস্থিত। প্রথম দিনের বিচারে একব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। বহু লোকের বহু অপরাধ জড়ো হলো সামাজিক বিচারের মঞ্চে। আর ততোধিক প্রহসন অনুষ্ঠিত হতে লাগলো বিচারের নামে। সব দেখে শুনে ঝাঁকসু বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এইসব গ্রামের গরীবগুর্বো অভাজন ব্যক্তিদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে

লম্বা একটা ছড়া কেটে দিলেন। সেই বিচারের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। ফলে বাইশা পণ্ড হয়ে গেল। আমার মনে হয় চাঁইজাতীয় সেটাই শেষ 'বাইশা'। ঝাকস্ কুসংস্কার মুক্ত ছিলেন।

তুলসীচরণ মণ্ডল

'গণকণ্ঠ' ।। বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬ ।।

২.

মটরবাবু

মালদহের গ্রামীণ নাটক গম্ভীরার সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হয়ে আছে, সেই নামটি হল যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী। আপামর গম্ভীরা অনুরাগী মালদহবাসীরা অবশ্য তাঁকে চেনেন 'মটরবাবু' বলে।

মালদহ জেলার কালিন্দ্রী এবং মহানন্দা নদীর মধ্যে অবস্থিত ইটাখোলা গ্রামে আনুমানিক ১৯১২ সালের মার্চ মাসে মটরবাবুর জন্ম। তাঁর পিতামহ বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এবং পিতা গণেশ চৌধুরী ছিলেন মৎস্যজীবী মহলদার |মালো| সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে মটরবাবু নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি পাকুড়তলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পরে অক্রুরমণি করোনেশান স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিলেন। ১৯২৭ সালে পিতৃবিয়োগের পর মটরবাবু অমরনাথ দত্তের গম্ভীরা দলে 'লাব্বাড়' রূপে যোগদান করেন। এই দলে তিনি মূলত দলপতির লেখা গান পরিবেশণ করতেন। এরপর ১৯৩২ সালে মটরবাবু গোবিন্দলাল শেঠের দলে যোগ দেন। এই সময় থেকেই অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁর অভিনয়-পালার তীব্র শ্লেষ ব্রিটিশ শাসকদের বিড়ম্বিত করে তোলে। এই ধরণের ব্রিটিশ বিরোধী শ্লেষাত্মক গান পরিবষণের সময় ১৯৪৫ সালে মটরবাবু ও তাঁর দলপতি বিদেশী শাসককর্তৃক বন্দী হন।

১৯৬৬ সালে মটরবাবু নিজস্ব গম্ভীরার দল তৈরি করেন, তাঁর দলে গান লিখে দিতেন দেবনাথ রায়, তারাপদ সরকার এবং দোকড়ি চৌধুরী। এই দোকড়ি চৌধুরীর রচিত গান পরিবেশণ করে মটরবাবু বহু পুরস্কার লাভ করেছেন, আবার অনেক নির্যাতনও ভোগ করেছেন। ১৯৭৪ সালে বিখ্যাত 'চার ইয়ারী', 'বাহান্নপতির তিন টেক্কা' গাওয়ার জন্য তাঁর আসর আক্রান্ত হয়। গানের মধ্যে তিন নেতার আন্দোলনের জবাবে মটরবাবু

গেয়েছিলেন :

সাম্য শান্তির খামতি করা
এই কি গণতন্ত্র হে।
দুর্নীতির আর শোষণ নীতির
আত্মঘাতী যন্ত্র হে।
প্ল্যানের পাখায় ঝাঁকায় ঝাঁকায়
গৌরী সেনের টাকা ওড়ায়
শাসক সেবক সমান তালে তারা
খোঁজে বখরা দাবির আখড়া।
তোদের ফুটা হাঁড়ির দোকানদারি
বেশিদিন আর টিকবে না,
বাঙলার মানুষকে বোকা ভাবিস না॥

মটরবাবুর গাওয়া এই গান শুনে তৎকালীন শাসকদলের গুণ্ডা বাহিনী আসরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বুড়া কালীতলার গম্ভীরার আসর ভেঙে দেয়। কিন্তু অসম সাহসী মটরবাবু এরপরেও শহরের ঊনত্রিশটি আসরে এই গান পরিবেষণ করেছিলেন।

মটরবাবু খুব সুপুরুষ অভিনেতা ছিলেন না, নিজে গানও বাঁধতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর সমস্ত ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেত অভিনয় নৈপুণ্যে ও সরসতায়। এইসব সরস কথাবার্তা পরিবেষিত হত আঞ্চলিক লোকভাষায়, কারণ জনসংযোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক লোকভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন একটি গানে 'চশমা'র স্থানে মটরবাবু বলেছেন 'সৎমা'। এর কারণস্বরূপ তিনি পরে জানিয়েছেন বিমাতার মতই আসল চোখের সামনে দু-নম্বর চোখ হিসাবে কাজ করে বলেই এর নাম 'সৎমা'। এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই ছিল মটরবাবুর অভিনয়ের প্রধান গুণ। এর সঙ্গে তিনি মিশিয়ে নিতেন সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাবলী। মালদহে একবার রেল ধর্মঘটের সময় স্থানীয় স্টেশন চত্বর ছিল একেবারে ট্রেনশূন্য ফাঁকা। আসরে একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে বিনি সিঁদুরে আবিষ্কার করে মটরবাবু বলে ওঠেন : 'প্ল্যাটফর্মে সিঁদুর নেই কেন?'

এসব ছাড়াও মটরবাবুর অভিনয় ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। একই আসরে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা থেকে দেশনেতা, যে কোন ভূমিকাতেই স্বচ্ছন্দ অভিনয় করতে পারতেন। এই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল

অসমসাহস এবং গম্ভীরা-আলকাপ ও খ্যামটার মিশ্রণে এক কৌতুককর মনোহারী নাচ। এই অভিনয় ও নাচ নিয়েই মটরবাবু দুর্নীতি-অন্যায় দেখলেই অভিনয়ে গানে-ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে ও সমালোচনায় প্রতিপক্ষের প্রকৃত স্বরূপটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরতেন।

মটরবাবু তাঁর শিল্পী জীবনে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন। আকাশবাণীতে তিনি অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯৭৩ সালে মালদহ লোকসংস্কৃতি পরিষদ এবং ১৯৭৭ সালে 'গোলাপট্টি কিশোর সংঘ' তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৮১ সাল মানিকচকে লোকসংস্কৃতি পর্ষদ আয়োজিত জেলা উৎসবেও মটরবাবু সম্বর্ধিত হন।

১৯৮৫ সালে মঙ্গলবাড়ির একটি গম্ভীরার আসরে অভিনয় চলাকালীন মটরবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই গম্ভীরা শিল্পী জীবনের নাট্যমঞ্চ থেকে চিরবিদায় নেন।

সুরেন মুখোপাধ্যায়



ক্ষেত্রসমীক্ষণ

□ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্ররা তাদের পাঠক্রম অনুসারে যে-পাঠ শ্রেণীর চার দেওয়ালের মধ্যে বসে গ্রহণ করেছিলো, তারই অনুপ্রেরণা ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং শিক্ষকগণের নির্দেশ পাথেয় করে নিজেরাই এক ক্ষেত্রানুসন্ধান চালায়। তা অসম্পূর্ণ হলেও তার মূল্য অপরিসীম এবং তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যা বই-এর পাতা থেকে আহরণ করেছি তাকে নিজেরাই ফলিত বিদ্যায় রূপান্তরিত করে দেখতে চাই—বলে বেরিয়ে পড়ে তারা যে তথ্য আহরণ করে এনেছিলো তাতে তাদের সামাজিক স্বাবলম্বিতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে তাকেই কিছুটা সম্পাদিত করে লোকসংস্কৃতি গবেষণার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

এই ক্ষেত্রানুসন্ধানটি কিছু পুরানো। তা সত্ত্বেও এর প্রায়োগিক মূল্য কিছু কমেছে বলে মনে করি না। এবং ভবিষ্যতে তাদের এ-কাজ আমাদের সামনে একটা পথরেখা হতে পারে মনে করে এটির পুনর্মুদ্রণ।

সম্পাদক

বিষয় : বোলান গান।
স্থান : গ্রাম : কেতুগ্রাম / অঞ্চল : কেতুগ্রাম : থানা : ঐ।
ব্লক : কেতুগ্রাম [২] : মহকুমা : কাটোয়া
পরগণা : মনোহর শাহী : জেলা : বর্দ্ধমান
তারিখ : ১১ই এপ্রিল ১৯৮৭ [২৭শে চৈত্র ১৩৯৩] শনিবার
প্রধান উত্তরদাতা : রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
বয়স : ৬২ বছর।
পেশা : শিক্ষকতা।
নিবাস : ঐ।

১. প্রশ্ন : কেতুগ্রাম-এর নামকরণের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : আগে কেতুগ্রাম-এর নাম ছিলো গঙ্গাডাঙ্গা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী এখানকার বসতির নাম বহুলা। এটি সতীর একান্নপীঠের একটি। অজয় নদীর উত্তরাংশে পাল রাজাদের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ রাজত্ব করতো। সেন বংশের রাজত্বকালে নিরাপত্তার কারণে এঁরা নিজেদের কেতুরাজ [যেমন : চন্দ্রকেতু, বৃষকেতু, মকরকেতু প্রমুখ] নামে পরিচয় দিতে থাকেন। ফলে, কেতুরাজের নামানুসারে তাঁদের রাজধানীর নাম হলো কেতুগড়। নবাব আলিবর্দীর শাসনকাল পর্যন্ত এই কেতুরাজাদের আধিপত্য বজায় ছিলো—পরে ধীরে ধীরে বিশেষ করে বর্গী আক্রমণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ কেতুগড়ের নামটি থেকে যায় ও তার থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয়েছে কেতুগ্রাম [ড. সুকুমার সেন অবশ্য বলেন : কেতঙ্গ পল্লী কেতঙ্গগ্রাম কেতুগ্রাম [অনুমান]।। সংগ্রাহকগণ]।

২. প্র : আমরা শুনে এসেছি যে এই অঞ্চলে চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে 'বোলান গান'-এর খুব ধুম পড়ে যায়—এটা কি সত্যি?

উ : হ্যাঁ, সত্যি।

৩. প্র : এই 'বোলান গানে'র উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

উ : কেতু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাবা মূলত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। সেন আমলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে এঁদের ব্রাহ্মণ ধর্মের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতেই হয়। এই মিশ্রণের ফলে ধর্মরাম বা ধর্মঠাকুর নামে এক দেবতার উদ্ভব হয়। এঁকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। উক্ত শিবের পূজা উপলক্ষ্যে যে গান করা হতো, তা হতো পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে। এই কথোপকথনকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'বোল'। ঐ 'বোল' থেকেই 'বোলান' কথাটির উৎপত্তি।

৪. প্র : বোলান-এর উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কি?

উ : জীবনের অসারতা প্রদর্শনই হচ্ছে বোলানের মূল উদ্দেশ্য। যেমন একটা গানে বলা হচ্ছে :

'কাল বাছা খেয়েছিলো কাঠা ভরা মুড়ি।
আজকে তার মুণ্ডু কেন ধূলায় গড়াগড়ি ।।'

৫. প্র : বোলান কয় প্রকার ও কি কি?

উ : বোলান গান সাধারণত চার প্রকার। যেমন : **ক.** পড়ি বা পোড়ো বোলান। **খ.** ডাক বা পালাবন্দী বোলান। **গ.** সাঁওতালী বোলান। এবং **ঘ.** ছল বোলান।

৬. প্র : ঐ প্রত্যেক প্রকার বোলান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবেন কি?

উ : হ্যাঁ নিশ্চয় করবো।

প্রথমে যে পড়ি বা পোড়ো বোলানের কথা বলবো, তা হলো এই রকম : বোলানের আচার পালনকারী ভক্ত্যারা চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন গভীর রাত্রে শ্মশান থেকে মড়ার মাথা কেটে নিয়ে আসেন। পরের দিন ঐ মড়ার মুণ্ডু নিয়ে ভক্ত্যারা মুখে চুণকালি মেখে ভূত-প্রেত সেজে বোলান গান করে থাকেন। নিজেদের মহাদেবের অনুচর রূপে কল্পনা করার জন্যই তাঁরা ঐ রকম রূপসজ্জা করে থাকেন। অনেক সময় সদ্য মৃতের মুণ্ডুও সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়। পড়ি বোলানে যে গান করা হয় তাতে জীবন যে অনিত্য ও অসার তাই-ই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ডাক বা পালাবন্দী বোলান : বোলান ভক্ত্যারা নিজেরা নিজেদের পছন্দমতো সাজ-সজ্জা [make-up] করে পালাবন্দী বোলান গান

করে থাকেন। পার্থিব সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি এই ধারার গানগুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই গানে বোলান ভক্ত্যারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পালা-বন্দীভাবে গান করে থাকেন। প্রথম দল কলি গান ধরলে দ্বিতীয় দল তার উত্তর দিয়ে তাকে পূর্ণরূপ দেন। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়ের এবং সমসাময়িক ঘটনা এই সব গানের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত করা হয়ে থাকে। যেমন : 'দাদা গো এবার দেশে খরা হয়েছে, / হায় হায় চাষী লোকের সব গিয়েছে। / এবারে যেভাবে খরা, চাষীরা পড়লো মারা / গরীবের নেতা যারা মজা মেরেছে / হায় হায় চাষী লোকের সব গিয়েছে।'

তৃতীয়ত, সাঁওতালী বোলান : কোন কোন বোলান ভক্ত্যা দলবদ্ধভাবে কালো গেঞ্জি, কালো হাফ প্যান্ট পরে গায়ে কালো রঙ মেখে গলায় হাতে হাড়ের বা পুঁতির মালা পরে মাথায় লাল ফিতের সঙ্গে পালক বেঁধে, সাঁওতালদের মতো সেজে নাচ ও গান করে। মাদল, আড়বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান গেয়ে থাকে। যেমন : 'যতেক নাগরী রাখিয়া গাগরি, / বুলাইয়া পাগরি, ঝাঁপাইয়া যমুনাতে / মনের আবেশে স্বর্গীয় সুবাসে / ভাসাইল অবনী।

চতুর্থত, ছল বোলান : ছোট ছেলেরা নানা ভাবে সেজে যে পালাবন্দী গান করে থাকে, তাই-ই ছল বোলান নামে পরিচিত। সাধারণ ১০-১২ জনের অল্প বয়স্ক বালকের দল একসঙ্গে এই গান ও নাচ করে থাকে। সঙ্গে বাজতে থাকে ঢাক, কাঁসি। এই সব গানের মাধ্যমেও সামাজিক চিত্র আঁকার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেমন : 'সরল মনে যত্ন করে লো সই / খোঁপা বাঁধবো নির্জনে। / বহুদিনের পরে গো বঁধূ হে / আসবে বারোটার ট্রেনে। / ওই খোঁপার মাঝে ফুল চিরুণী / গুঁজবো গোলাপ ফুল। / ওহে গুঁজবো গোলাপ ফুল।। / আজ দুপুর বেলা বঁধূ এলে / প্রাণ হবে আকুল। / ভিজে গামছায় মুখ মুছিব / টিপ পরবো কপালে। / ওগো টিপ পরবো কপালে ।।
—ইত্যাদি।

বোলান গানে সাধারণ মনোহরশাহী কীর্তনের সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে রেডিও, সিনেমা, টিভি-র দাপটে অনেক চটুল সুর এতে মিশে যাচ্ছে।

৭. প্র : বোলান কখন হয় ও এর আচার প্রসঙ্গে কিছু বলবেন কি?

উ : আগেই বলেছি বোলানের দুটো দিক। একটি [ritual] দিক, অন্যটি

অনুষ্ঠানের [functional] দিক। **প্রথমে** আচারের দিকটি নিয়েই বলা হবে। বোলান সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন [মতান্তরে ছয় দিন] হয়ে থাকে। বোলান যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাই বোলানে কিছু আচার পালন করা হয়। আচার পালন যাঁরা করেন তাঁদের 'ভক্ত্যা' বলা হয়। তাঁরা ছড়ি ধারণ করেন। সারাদিন উপবাস করে রাত্রে ফলাহারই বিধেয়। 'ভক্ত্যা' থাকার কয় দিন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনীয়। চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিনের প্রথম দিনকে বলা হয় শিব উঠা বা শিবের উৎযাপনের দিন এর আগে আচার পালনকারী ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্ম করে অর্থাৎ নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উত্তরীয় গ্রহণ করে ছড়ি ধারণ করেন। শিব ওঠার দিন পাটি ভক্ত্যা অর্থাৎ প্রধান ভক্ত্যা অন্যান্য ভক্ত্যাদের সঙ্গে গণকের বাড়ি থেকে শিবকে অনুষ্ঠানের মন্দিরে নিয়ে আসেন। আসার সময় ভক্ত্যারা পর পর শুয়ে থাকেন, তাদের উপর দিয়ে গণক শিবকে নিয়ে আসেন ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিন ঐ মন্দিরে শিবের অনুপস্থিতিতে 'বাণেশ্বর' [লোহার বা কাঠের দণ্ড] শিবের প্রতিনিধি হিসেবে পূজিত হতেন।

দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় খাজুর ভাঙ্গা। এদিন বাণেশ্বরকে স্নান করানো হয়। পরে বাণেশ্বরকে নিয়ে ছড়িধারী ভক্ত্যারা গ্রাম থেকে খেজুর ভেঙে নিয়ে আসেন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে চলতে থাকে গান আর বাজতে থাকে ঢাক। এই গানই হলো বোলান গান। এই গানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়ে থাকে :

> 'খাট পালঙ্কে লাঠি বন্ধন।
> ডাইনে ডগর বন্ধন, বাঁয়ে বীর হনুমান।
> গণেশের চরণে শত কোটি প্রণাম।

বন্দনার পরে ছড়িধারী ভক্ত্যারা মন্দিরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রত্যেক বারে মন্দিরের সামনে রাখা পাত্র থেকে ফুল নিয়ে শিবের দিকে ছুঁড়তে থাকেন। এই অনুষ্ঠান হয়ে গেলে ভক্ত্যারা হবিষ্যান্ন [২/১ মুঠো চাল, ১টা কলা, দুধ, মিষ্টি, একটি হাঁড়িতে দিয়ে ২/১ নুড়ো জ্বাল দিয়ে এই অন্ন করা তৈরি হয়] গ্রহণ করে থাকেন।

তৃতীয় দিনের নাম জল সন্ন্যাস। ছড়িধারী ভক্ত্যা ও অন্যান্য মানতকারীরা শিবকে গঙ্গায়, অভাবে কোন বড় পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনেন। এর সঙ্গে ঢাকের বাদ্য এবং নাচ-গান সমানে চলতে থাকে।

চতুর্থ দিনকে বলা হয় হোম। শিবের সামনে ঘি পুড়িয়ে হোম করা হয়।

পঞ্চম দিনের নাম নীল সন্ন্যাস। এই দিন চৈত্র-সংক্রান্তি ও চড়কের দিন। পাট ভক্তা এবং অন্যান্য ভক্তা মানতকারীদের সঙ্গে নিয়ে শিবকে প্রসিদ্ধ শিব মন্দিরে বা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় গিয়ে পূজা নিবেদন করেন। এই ক্রিয়া শেষে শিবকে আবার গণকের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ভক্তারা স্নান করে, উত্তরীয় ও ছড়ি ত্যাগ করে, এদের বাৎসরিক আচার পূর্ণ করেন।

উক্ত ছড়িধারী আচারনিষ্ঠ ভক্তারা ছাড়াও আরো অনেকেই ভক্তা হন যারা আচারের দিকটি পালন না করলেও অনুষ্ঠানের দিকটি অর্থাৎ নাচ ও গানে রীতিমতো অংশগ্রহণ করে থাকেন। আমরা তো প্রথমেই ঐ নাচ ও গানের বিষয় আলোচনা করে এসেছি।

মন্তব্য : এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে কেড়গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম পাড়ার আচার পালনকারী ছড়িধারী ভক্তা : পরমেশ্বর মাঝি, স্বপন মাঝি, দুলাল রুদ্র প্রমুখ এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভক্তা : মুক্তিপদ দে, বৃন্দাবন দে, সুকুমার দত্ত, কাজল দে প্রমুখের কাছ থেকে। এইসব গ্রামবাসীর পক্ষে শিক্ষক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তথ্য সংগ্রহে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে ঐ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটির গান উদ্ধৃত করা হলো :

১ বন্দনা :

ক. কোথায় মা সরস্বতী এসো মাগো এই আসরে--
ওগো মা বাগ্‌বাদিনী বলাও বাণী মধুর স্বরে।
শুনেছি মা কানে তোমার দয়া যদি হয়---
বানরে গান গাইতে পারে, বোবায় কথা কয়।
মাগো তোমার দয়া হলে জয়ী হবো বিশ্ব পরে ॥

খ ভোলা বাবায় প্রণাম করি, দাও গো তোমার পদধূলি--
শ্মশানবাসী পাগলা কবি, দাও গো তোমার পদধূলি---
দেবাদিদেব তুমি বাবা, ভুলে যেও না—
অধম ছেলে আমরা তোমার ফেলে যেও না।
আকন্দ ফুলের মালা নিয়ে আমরা তোমার আশায় বসে আছি ॥

গ. বন্দি গণপতি, অগতির গতি, তোমায় ছাড়া সিদ্ধ হবে না।
শুনগো দেব-দেবীরা হই না চরণ ছাড়া, মনরে হরি বল না ॥

২. রাধার মানভঞ্জন :

ক. ও লো সই সাজাও ফুলের বিছানা।
যত গোপের বালিকা, গাঁথ ফুলের মালিকা,

দুপুর রাতে আসরে আজি কালিয়া সোনা।
ও ফুল দিয়ে বিছানা সাজায়, ফুলেরই বালিশ,
ফুলের মধু খেয়ে বঁধু ছাড়বে যে আলিশ।
ওই আসে ওই আসে বঁধু দেরি হবে না,
মনের আশা না মিটিয়ে ফিরে যাবে না॥

৩. আঞ্চলিক গান :
ওগো কেতুগ্রাম বাড়ি, এ দলের সবার ই
উত্তর পাড়ায় দল করি।
আহা সারা বৎসর পরে, এই চৈত্র মাসে
বুড়ো শিবের চরণ ধরেছি।
পলাশ বাবু দলপতি, বোলানে তার অতিভক্তি
উজ্জ্বল হয় ম্যানেজার এই দলে।
সিপাই বাজায় ঢোল, মহাদেবের দল এই বলে দিলে
ফুলের মালা যেন দেন তার গলে।
সাঙ্গ হলো গানের পালা গো,
ওগো ডাকুন হরি বলে॥

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রী :

১. মহং জসিমুদ্দিন। ২. বিজনকুমার মণ্ডল।
৩. শঙ্করনাথ রায়। ৪. দিবাকর মান্না।
৫. নেপাল নাগ। ৬ প্রদীপচন্দ্র সাহা।
৭. অমিত শাসমল। ৮. বলরাম কুণ্ডু।
৯. অমিতা চৌধুরী। ১০ মানু সেনগুপ্ত।
১১. পলি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র-ছাত্রী : বাঙলা-বিভাগ
| লোকসাহিত্য বিশেষ পত্র |
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৮৬–৮৮ শিক্ষাবর্ষ

□

লেখক পরিচিতি

□ **অজিতকুমার ঘোষ** : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যসমালোচক। বঙ্গসাহিত্য সরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক। এঁর লেখা 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' কয়েক দশক ধরে বাঙালির নাট্যচিন্তা ও নাট্যবোধকে ঋজু রাখতে সাহায্য করেছে। স্বনামখ্যাত প্রবীণ অধ্যাপক ড. ঘোষের অধিক পরিচয় প্রদান বাহুল্যমাত্র।

□ **অবিনয় ব্রহ্ম** : একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ। ইনি লেখেন অত্যন্ত কম। দেখেন দু-চোখ ভরে। ভাবনা আধুনিক। আমরা চেষ্টা করবো এঁকে ধরে মাঝে মাঝে লিখিয়ে নিতে।

□ **আশুতোষ ভট্টাচার্য** : 'উত্তর বাঙলার গ্রামীণ লোকনাট্য' এই প্রবন্ধটি প্রায় কুড়ি বছর আগে লেখা। পুরাতন সাময়িক পত্র থেকে এটি সংগ্রহ করা হলো বর্তমান সংখ্যার প্রাসঙ্গিক ভূমিকা হিসাবে। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার ব্যাপারে গ্রন্থ-সম্পাদক প্রবন্ধকারের পুত্র ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্য স্বীকার করে। ইনি আমাদের পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা।

□ **আয়ুব হোসেন, মহম্মদ** : প্রবন্ধকার গ্রামবাঙলার সংস্কৃতির সন্ধান, সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় নিবেদিতপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। ইনি পায়ে হেঁটে বাঙলার গ্রামীণ সাংস্কৃতিক সম্পদ সুধীমণ্ডলীকে উপহার দিচ্ছেন অবিরত। সেই অনুসন্ধানের ফসল হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা লোককথা' নামক বৃহৎ গ্রন্থ। আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। আয়ুব সাহেব কলকাতার 'একাডেমী অব ফোকলোরে'র ফেলো এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতি পর্যদে'র সদস্য। বর্ধমানের মাটি ও সংস্কৃতিকে আয়ুব সাহেবের মতো এ-কালে ভালো করে আর কে চেনেন!

□ **দিগ্বিজয় দে সরকার** : ইনি কোচবিহার শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার। কোচবিহারের ভূমিপুত্র হওয়ার সুবাদে ইনি এখানকার জন-জাতি-মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ। তাই এঁর লোকসংস্কৃতি-চর্চা স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়ারই অঙ্গ। 'লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ' এঁর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

□ **নুরুল ইসলাম, মহঃ** : ড. ইসলাম বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ—তাই জন্মসূত্রে আলকাপের আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। এঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'আলকাপ একটি জনপ্রিয়

লোকনাট্যের ধারা'। বর্তমানে ইনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বেশ কিছু উচ্চমানের প্রবন্ধের লেখক।

□ **পবিত্র গুপ্ত** : ড. গুপ্ত একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানেও এঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত। নিজে উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং দীর্ঘকাল অধ্যাপনা সূত্রে উত্তরবঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। এঁর টোটোদের ওপর লেখা গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

□ **পুষ্পজিৎ রায়** : অধ্যাপক রায় মালদা কলেজের বাঙলা বিভাগের রীডার। এখানকার স্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে এই জায়গার জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে ধৃত।

□ **প্রদ্যোত ঘোষ** : ড. ঘোষ মালদহ কলেজের বাঙলা বিভাগের রীডার, বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। মালদহের গম্ভীরা নৃত্যকে বৃহত্তর বঙ্গে ও ভারতের অন্যত্র পরিচিত করিয়েছেন। গম্ভীরার ওপর দুটি, কালীঘাটের পটের ওপর ইংরাজিতে একটি এবং মালদহের স্থাপত্যের ওপর বাঙলায় এঁর একটি বই আছে। ড. ঘোষ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের একজন প্রবীণ সদস্য।

□ **বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়** : প্রবন্ধকার শ্রীচট্টোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গার একজন সাংবাদিক-চলচ্চিত্রকার ও 'ভগীরথ' নামে একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদক।

□ **ব্রজগোপাল বৈষ্ণব** . উত্তর দিনাজপুরের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী। বেতারে গান গেয়ে থাকেন।

□ **লীনা চাকী** : কর্মসূত্রে একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বাউলদের জীবনাচরণ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রগবেষণা করেছেন। বিশেষ করে মহিলা বাউল সম্পর্কে এঁর অনুসন্ধান বিদগ্ধ-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ-বিষয় লেখা তাঁর প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে।

□ **শ্যামল বেরা** : ইনি পেশায় শিক্ষক। কাব্যচর্চা ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান এঁর নেশা। চারটি কাব্যগ্রন্থ আছে, কিছু নিবন্ধও। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে এঁর অনুসন্ধানক্ষেত্র হলো মেদিনীপুর।

□ **সুরেন মুখোপাধ্যায়** : বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী। উচ্চতর সরকারী পদে আসীন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা ও আলোচনায় ইনি বিশিষ্ট। একটি বাঙলা দৈনিকের সঙ্গেও ইনি যুক্ত আছেন।

□